সূচনা

'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। কবির জীবনস্মৃতি নানা বিরোধ ও বক্রতা, সংঘাত ও সম্মিলনের ইঙ্গিত দিয়ে থেকে গেল 'কড়ি ও কোমল'-এ, 'খাসমহলের দরজা'য়। এ-গ্রন্থের মূল আলোচনার সূত্রপাত সেই খাসমহলের দরজা থেকে—মানসী, সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যত্রয়ীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ-গ্রন্থের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনার এমন দিন ছিল যখন মুদ্রাক্ষরে পড়তে হয়েছে, 'কবির কাব্য পাঠ করিয়া অন্তরে যে কী হাঁচোড়-পাঁচোড় করে তাহা বুঝাইতে পারিব না।' কাব্যসমালোচনা এ-অকপট, একান্ত আন্তরিক প্রকাশের স্তর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। আজ তা বহু ও বিস্তীর্ণ; অনেকাংশে পরিণত, উন্নত। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে নূতন গ্রন্থের অবতারণা, বিশেষ করে রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচারের দুঃসাহস নিয়ে গ্রন্থের অবতারণা, হয়তো কৈফিয়ৎ দাবি করবে।

প্রথম, বোধ করি প্রধান, কৈফিয়ৎটা রয়েছে আমাদের অকপটচিত্ত পূর্ব-সমালোচকের সরল উক্তিতে—অর্থাৎ দুঃসাহস হয়েছে কারণ রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে অন্তরে একদিন অনেকটা ঐ-জাতীয় প্রতিক্রিয়াই জেগে উঠেছিল। প্রভেদ এই—তা বোঝাবার প্রয়াস করা হয়েছে। সে-প্রয়াসের মূল্য যাই হোক, সেখানে কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই; চিন্তার প্রকাশ-স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলতম অধিকার। বার্নড্‌শয়ের ভাষায়, 'Every man has the right to speak out his opinion and every other man has the right to knock him down for it,'

অন্য প্রতি ব্যক্তির সে 'অধিকার' নিশ্চয়ই রইল।

কিন্তু পুনর্বিচারের আরও একটি কৈফিয়ৎ রয়েছে। সেটি সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কীয়। কথাটিকে উপমা দিয়েই বলা যাক।

মাটির অন্ধকারে প্রাণের প্রবাহ একদিন গাছে ফুল ফুটিয়ে তোলে। সে-ফুলের অনিন্দ্য শোভা। কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ফুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞানী খোঁজে ভূমিগর্ভ থেকে বৃন্তমূল পর্যন্ত সেই প্রাণপ্রবাহের

ক্রিয়া যার পরিণামে একদিন ফুল দেখা দেয়। বিজ্ঞানী খোঁজে মাটির অন্ধকারে সে-ইতিবৃত্ত।

বিজ্ঞানীর এ-দৃষ্টি সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য। সে-দৃষ্টি কাব্যপুষ্পের সৌন্দর্যেই আবিষ্ট হয় না; তা নেমে চলে পুষ্প থেকে বৃন্তে, বৃন্ত থেকে কাণ্ডে; প্রবেশ করে মাটির গভীরে যেখানে প্রাণের গোপন উৎস। সে-দৃষ্টি কাব্যের অন্তরে কবির সচল মনের ক্রিয়াকে, অবচেতনে নানা প্রতিক্রিয়াকে সন্ধান ক'রে চলে; তারপর আবার ফিরে আসে ফুলের শোভাতেই। ফুলের সৌন্দর্য তখন নূতন উদ্ভাসে দেখা দেয়। কাব্য সমগ্র কবিমানসের সৃষ্টি; সেখানে কবিতা থেকে কবিতান্তরে কবির এগিয়ে-চলা মনের বহু রেখাপাত ঘটতে থাকে। তারা কোথাও সুস্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট; কোথাও ক্ষীণ, কোথাও গভীর। সে-রেখাসমূহের সমন্বিত ইতিহাসই কবিমানসের সমগ্র ইতিহাস, অন্তরতম ইতিহাস।

সুতরাং কাব্যসমালোচনায় তিনটি দৃষ্টিধারার সমাবেশ প্রয়োজন—ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী এবং নান্দনিক। এই ত্রিধারার সঙ্গম রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় সার্থকভাবে ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই; এ-আলোচনায় ঘটেছে কিনা তাও জানা নেই। তবু সে প্রয়াসই এ-গ্রন্থের প্রধানতম লক্ষ্য।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কিছু সমালোচনায় মানসীকাব্য বিষয়ানুযায়ী বিভক্ত—প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্যকল্পনা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি; কিছু সমালোচনায় কাব্যের মূল সুরের প্রতীকরূপে কয়েকটি কবিতা আলোচিত। এ জাতীয় সমালোচনা আপাতদৃষ্ট। তা কবির ও কাব্যের নিভৃত অন্তরাখ্যানের যথার্থ চিত্র হতে পারে না; কাব্যের মধ্য দিয়ে কবির পথযাত্রার নানা গভীর রেখা সেখানে চিহ্নিত হতে পারে না। সমালোচকের ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রথমেই দাবি করবে কাব্যের সমস্ত রচনার কালানুক্রম, তাদের মানসিক পরিবেশ, তাদের অন্তরালে কবিমানসের পূর্ব-ইতিহাস। মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টি দাবি করবে কবিজীবনের অন্তরঙ্গ তথ্য ও ঘটনা; কাব্যে প্রতিস্থত তাদের নানা রেখা। নান্দনিক দৃষ্টি দাবি করবে কবিতার কাব্যিক বিচার, কবিতার অর্থ ও ব্যঞ্জনা। দৃষ্টির এই ত্রিধারা সম্মিলিত হয়ে প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবিমানসের পদচিহ্ন অনুসরণ করবে; প্রায় কোন কবিতাই উপেক্ষণীয় হবে না, কারণ প্রতি কবিতায় সে-মানসের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ছায়া। সে-সমন্বিত দৃষ্টি লক্ষ্য করবে পথের বহু বক্রতা, কল্পনা ও

ও অনুভূতির ক্রমোত্তিন্ন বহু কুটিল রেখা ; পরিশেষে গড়ে তুলবে কবি-মানসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তার অন্তরতম কাহিনী। কাব্য সৃষ্ট হয় বিষয়ানু-যায়ী বিভাগ করে নয় ; কাব্য সৃষ্ট অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি ও কল্পনার অভিঘাতে। তাদের অন্তরালে রয়েছে ক্রমবিবর্তিত একটি কবিমানস।

সুতরাং আমাদের আলোচনার মুখ্যতম বিষয় কাব্য নয় কবি—বহু অনুভূতিসঞ্চালিত, বহু উপলব্ধি-অনুপ্রাণিত, ক্রমবিবর্তিত কবিমানস। আমাদের বিষয়ান্তর কাব্য, যেখানে কবিচিত্তের অন্তরাখ্যান স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রেখায় প্রতিবিম্বিত, যেখানে নানা বন্ধুর, বঙ্কিম পথে সে-চিত্তের নানা পদ-রেখা। ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী-দৃষ্টিতে সমগ্র কাব্য নূতন উদ্ভাসে ও ব্যঞ্জনায় অর্থময় হয়ে ওঠে ; কাব্যের অন্তরাখ্যান নূতন আলোকে সমুজ্জ্বল হয়। তখন কাব্যের পুনর্বিচারের দুঃসাহসও লোভনীয়।

পুনর্বিচারের আরও একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য কাব্যত্রয়ীর অন্তর্গূঢ় কাহিনী কবিমানসে বিরুদ্ধ ও প্রবল দু'টি শক্তির সংঘাত : একদিকে কবির সহজাত, স্বপ্নময়, অনন্তসৌন্দর্যকামনা, অন্যদিকে, কবির ভাষায়, 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা'। কবি নিজেই এ-সংঘাতের ইঙ্গিত দিয়েছেন সুস্পষ্ট ভাষায়, সুতরাং এ-তথ্য নূতন নয়। কিন্তু এ-কথা বিস্ময়কর যে, এ-তথ্য রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় যে-গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, তা পায়নি। এবং যতদূর জানি, কোন সমালোচনাই এ-বিরোধকে প্রথম যুগের কাব্যের মূলতম আখ্যান বলে মেনে নিয়ে, সে বিরোধমূলে বিপরীত দুই শক্তির উৎসারণের, সম্প্র-সারের, ক্রমবিকাশের এবং পরিণতির পুঙ্খ, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়নি। সে-ইতিহাস রচিত না হলে রবীন্দ্রকাব্যের অন্তরাখ্যান অসম্পূর্ণ থাকবে। এ-গ্রন্থ সে ইতিহাস রচনার সামান্য প্রয়াস মাত্র। সে প্রয়াসে অনেক ত্রুটি রইল। লেখক সেজন্য লজ্জিত। আরও লজ্জিত গ্রন্থে বহু মুদ্রণ ভ্রান্তির জন্য। পাঠকের ঔদার্যে ভরসা রাখা ছাড়া গ্রন্থকারের উপায় নেই।

পরিশেষে দু'টি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আলোচিত কাব্যত্রয়ীর মূলপাঠ রবীন্দ্ররচনাবলী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। এ-গ্রন্থ যখন রচিত হয় তখন 'ছিন্নপত্রাবলী' প্রকাশিত হয়নি।

এলাহাবাদ
বৈশাখ, ১৩৬৯

শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশ ডাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবল মাত্র ছবির মতো হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙ্গাগড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।… অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

—'জীবনস্মৃতি', অন্তিম অনুচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

আলোচ্য কাব্যত্রয়ীর পটভূমি

শ্রেষ্ঠকাব্য অগ্রস্থত কবিমানসের নানা পদচিহ্ন নিভৃতে বহন করে। বহু অনুভূতি- ও অভিজ্ঞতা-বিক্ষুব্ধ জীবনবোধের রেখা পড়ে সে- কাব্যে। সে-পদরেখা যেখানে ক্ষীণ ও অস্পষ্ট কবিমানসের নিবিড় পরিচয় সেখানে মেলে না। কিন্তু যে-কাব্যে কবিমানসের গভীরতম স্বাক্ষর, সে-কাব্য কবির অন্তরিতিহাসে গুরু মূল্য পাবে। রবীন্দ্রমানস প্রথম যৌবনে এমন একটি পথসন্ধিতে পৌঁছেছিল যেখানে তার পদাঙ্করেখা সুনিবিড়; যেখানে নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে, নানা বিরোধ ও বক্রতা উত্তীর্ণ হয়ে, কবিমানস পরিণত রূপ নিয়েছে, আত্মানুসন্ধানের সার্থক পথ খুঁজে পেয়েছে। সেখানে স্পষ্টাক্ষরে কাব্যললাটে অনুলিখিত 'বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী'। সে-তীর্থপথের কাব্য 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'। তাই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টিতে এই তিনটি কাব্যের একটি বিশিষ্ট ও অখণ্ড স্থান আছে।

বস্তুত, কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই কাব্যত্রয়ীর গুরুত্ব বোধ হয় সর্বাধিক! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মানসী, তাঁর প্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা। কথাটি লঘু, কবির স্বাভাবিক অবোক্তি। 'মানসী'ই তাঁর প্রথম কাব্য যেখানে কবিমানস 'যৌবনের আত্মবিস্মৃত বে-আইনী প্রমত্ততা' অতিক্রম করে গভীরতর আকৃতির স্বাক্ষর রেখেছে, যেখানে তাঁর জীবনব্যাপী ধ্যানসাধনা, তাঁর সৌন্দর্য-কল্পনা, প্রথম মূর্ত হয়েছে। 'মানসী'ই তাঁর প্রথম কাব্য যেখানে মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা প্রবলকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে; যেখানে তারই সঙ্গে বেদনার বেগে জেগে উঠেছে অসীমের ধ্যান, অনন্তের দিব্যকল্পনা। তার পর 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে এ-ধ্যানকল্পনা বহির্বিশ্ব ও বৃহত্তর জীবনের অভিঘাতে বিচিত্র পথ নিয়েছে, বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, যার প্রবল আলোড়নে সংশয়মথিত কবিচিত্তে একে একে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের প্রধানতম তিনটি প্রতীককল্পনা—'সৌন্দর্য-লক্ষ্মী', 'কাব্যলক্ষ্মী', 'জীবনদেবতা'। কবির বিপুল কাব্যপ্রবাহে কোন কাব্যত্রয়ীর অন্তরিতিহাস এত চিত্তাকর্ষক কি না সন্দেহ,

কবিমানসের ভাঙাগড়ার এমন নিবিড় সাক্ষ্য বহন করে কিনা সন্দেহ। কাব্যধারার ভৌগোলিক সংস্থানে এই তিনটি কাব্য গঙ্গোত্রীর মর্যাদা পাবে। 'প্রভাত-সঙ্গীত'এর গোমুখী থেকে নিঃসৃত ধারা এইখানেই পেল তার প্রথম অবতরণভূমি।

শেষবয়সে কবির উক্তি আছে 'জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে'। এ আত্মসন্ধানের যাত্রাপথ প্রথম সার্থকভাবে প্রসারিত হল 'মানসী'-কাব্যে। সে যাত্রাপথের প্রথম তোরণ রচিত হল অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের বিপুল তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে 'মানসী'তেই। তার পর সেই তৃষ্ণার মরীচিকাই কবিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নানা দুর্গম পথে। সংশয় ও নৈরাশ্যের বিক্ষোভ এনেছে আত্মবিরোধ, এনেছে বিরাট জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পথ বাঁক নিয়েছে—পৌঁছেছে দ্বিতীয় তোরণে যেখানে সংঘাত ঘটেছে কল্পলোকের ধ্যানসাধনায় ও মানবলোকের বাস্তবসাধনায়। কল্পনা ও বাস্তবের এ-সংঘর্ষ আত্মানুসন্ধানের এক অনিবার্য পর্যায়; তার মর্মান্তিক ইতিহাস মেলে পশ্চিমের বহু শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যজীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে—তার গভীর স্বাক্ষর রয়েছে এই তিনটি কাব্যের মাঝে।

উনিশ শতকের পশ্চিমের বহুকবির কাব্যসাধনায় কল্পনা ও বাস্তবের এই বিরোধই একদিন দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। রূসো-কাণ্ট-হেগেল-অনুপ্রাণিত য়ুরোপীয় রোম্যান্টিকতার বহু-উৎকাঙ্ক্ষাসজ্জিত তরণী মাঝপথে ডুবেছিল প্রধানত এই সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায়। য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক কাব্যে এ-সংঘাত যতই প্রবল হয়েছে, কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান ততই দুরতিক্রম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ-ব্যবধান বহু রোম্যান্টিক কবির অন্তরে এনেছে বিক্ষোভ ও নৈরাশ্য; বহু কবিকে করেছে পলাতক, জীবনবিচ্ছিন্ন কল্পবিলাসী। রূসোর "pays des chimères" রোম্যান্টিক কবির 'Arcadia' ও 'Ivory tower' আজও রোম্যান্টিকতা-বিরোধী পশ্চিমী সমালোচকের পরিহাসে কণ্টকিত।

কল্পনাকে দিব্যরূপিণী মেনে নিয়ে রোম্যান্টিকতার অভিযান শুরু করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে ওয়র্ডস্বর্থ ও কোলরিজ। মুক্তপক্ষ সে-কল্পনার দুঃসাহসিক বিহার ছিল কল্পলোকে, প্রকৃতিলোকে এবং বাস্তবলোকে। নীলাকাশ ও শ্যামলধরণী একত্রে গ্রথিত হয়েছিল সে কল্পনার মায়ামন্ত্রে। তার পর মাত্র দশ বছরের মধ্যে সে দিব্যকল্পনা হারিয়েছিলেন

তাঁরা ; ওয়র্ডস্বর্থের 'Intimations of Immortality', কোলরিজের 'Dejection' কবিতা তার মর্মান্তিক সাক্ষ্য বহন করে।

পাশ্চাত্ত্য রোম্যান্টিক কাব্যের এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' বিশেষ কৌতূহল জাগায়। সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-পরিণত রোম্যান্টিক কল্পনার প্রথম অভিসার শুরু হল। অচিরেই বাধল বিরোধ কল্পনা ও বাস্তবে। কিন্তু সে-বিরোধ একদিকে কল্পলোককে করেছে গভীর ও সুদূর-প্রসারী ; অন্যদিকে জীবনের আকৃতিকে করেছে নিবিড়। সে-বিরোধ উৎসৃষ্ট হয়েছে বৃহৎ জীবনবোধকে জাগ্রত করার প্রয়াসে, মানুষ ও ধরণীকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াসে, কল্পনা ও বাস্তবকে সমন্বিত করার প্রয়াসে। এ-প্রয়াসসমূহ আলোচ্য কাব্যত্রয়ীর অন্তরতম ইতিহাস ; তা যেমন ঔৎসুক্যকর, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ সে-ইতিহাসে সুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক কল্পনার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। বলে রাখা প্রয়োজন, এ-ইতিহাসের পূর্ণ পরিণতি রয়েছে উত্তর-কাব্যে ; বস্তুত, এ-ইতিহাস সমগ্র কবিমানসের ইতিহাস। তথাপি তার প্রথম ও প্রধান অধ্যায় রচিত হল এই তিনটি কাব্যে।

কবির 'জীবনস্মৃতি' থেমে গেল 'কড়ি ও কোমল'-এ এসে। অন্তিম অনুচ্ছেদে কবি বলেছেন—

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবল মাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। **এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়-পরাজয়,** কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বোঝানোই হইবে। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকের কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।" (জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫১-৫২)

এ উক্তি 'খাসমহালের দরজায়'—মানসী-কাব্যের তোরণে দাঁড়িয়ে। এই 'ভাঙাগড়া' 'জয়-পরাজয়' 'সংঘাত ও সম্মিলন'—'মানসী,' 'সোনার তরী,' 'চিত্রা'র অন্তরতম ইতিহাস। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যের ক্রমোন্নত প্রকাশ আমাদের আলোচনার লক্ষ্য।

॥ ২ ॥

বৈচিত্র্য সত্ত্বেও 'মানসী' কাব্যের মূলতম সুর অসীম সৌন্দর্য-আকূতি ও কল্পনা। বিরাট রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের একদিকের তটের কাহিনী এই সৌন্দর্যকল্পনা। তাঁর কাব্য-তরঙ্গিণীর এক তীর প্রবাহিত লোকালয়ের মধ্য দিয়ে, জীবন ও মানুষকে বেষ্টন করে; অন্য তীর জনহীন, নিঃসীম, নিস্তব্ধ। তার প্রান্তে প্রান্তে নিঃশব্দে প্রসারিত পাণ্ডুবর্ণ বালুচর আর দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ। এই স্তম্ভিত নির্জনতার মাঝে কবির আবাল্য সাধনা চলেছে সেই মহীয়সী নারীর জন্য, যে স্নান করে উঠেছিল 'মহাসমুদ্রের অতল থেকে'; যে তাঁকে শৈশবে হাতছানিতে ডেকেছিল আপন রঙ্গভূমিতে'; কৈশোরে 'চোখে বিছিয়েছিল বিহ্বলতা,' যৌবনে 'রক্তে দিয়েছিল দোল, চিত্ত ভরেছিল নেশায়'; যে এসেছিল 'অপরিসীম ধ্যানরূপে সর্ব দেহে-মনে'; যার অতন্দ্রসাধনা করেছেন 'বুকের শিরা ছিন্ন করে ভীষণ পূজা'য়; যাকে দেখেছেন 'চরাচর ব্যাপ্ত করে অসীম শ্রীলোকে'; যে 'নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন'। কবিকল্পনায় উত্তরকাব্যে সে-নারী হবে 'আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, দেবতার দূতী'; তাকে দেখবেন বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত প্রাণস্পন্দের উৎস রূপে; সে-দিব্যরূপিণীর আহ্বানে 'বিপুল-চাঞ্চল্য জাগে, মাটির গভীর অন্ধকারে, রোমাঞ্চিত তৃণে'; তার নিগূঢ় প্রাণপ্রবাহে—

…গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে,
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে;

সে-নারীর দিব্যস্পর্শে 'এ ভূলোক মধুময়, মধুময় ধরণীর ধূলি'; অমরাবতীর বাতায়ন হতে তার প্রসারিত দুটি বাহু মর্তবাসীর জন্য তুলে ধরেছে সেই অমৃত

ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে।

গহন অন্তরে সেই দিব্যরূপিণীকেই কবি উপলব্ধি করেছেন সমস্ত সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে, মূর্তিমতী দিব্যকল্পনারূপে—

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।

বর্তমানে শুধু ইঙ্গিতে উত্থাপিত করা যাক এই গভীর তথ্যটিকে : রবীন্দ্রকাব্যে কল্পলোক ও বাস্তবলোকের দুস্তর অন্তরালকে সুদৃঢ় সেতুতে বাঁধবে, রোম্যান্টিকতার অতলে প্রোথিত নানা পাহাড়ের সংঘাত থেকে কাব্য-তরণীকে বাঁচাবে, প্রধানত কবির এই আবাল্য-সাধিত, আমৃত্যু-অনুসৃত বিরাট সৌন্দর্যকল্পনা। সে সৌন্দর্যকল্পনা প্রথম উৎসারিত হল 'মানসী' কাব্যে।

॥ ৩ ॥

সকালের আলোয় যে কুঁড়ি হাওয়ায় নেচে ওঠে, অন্ধকারে মাটির গভীরে তার প্রাণের লীলা চলে অনেক পূর্ব থেকে। সৌন্দর্যকল্পনার বীজ মগ্ন-চৈতন্যে সক্রিয় দেখি কবির বাল্যকাল থেকেই। ভৃত্যশাসিত ঘরের জানলার গরাদের ভিতর থেকে যে শিশুটি 'ঘাট-বাঁধানো পুকুর' আর 'প্রকাণ্ড চিনে বটে'র দিকে অবাক বিস্ময়ে চোখ মেলে বসে থাকত; পেনেটির বাগানে যে ছেলেটি আকুল হয়ে বাইরে ছুটে যেত বিশ্বজগতের বিচিত্র শোভা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করতে—সেই ছেলেটিই অবচেতনে প্রথম শুনেছিল অনাগত কালের ডাক; অস্পষ্ট চেতনায় প্রথম অনুভব করেছিল 'একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গ'। পরবর্তী কালের একটি চিঠিতে তার উল্লেখ দেখি—"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে; কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভালো করে ধরতে পারি নে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবী চারিদিকে রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়িতে

একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তাম, মনে করতাম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে।...পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত।"

'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন—"বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল...সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত।" (জীবনস্মৃতি, ১৩৬৩, পৃ ৮)

কবির শেষবয়সের কাব্যেও এই নিঃসঙ্গ, আত্মভোলা বালকের কথা বারবার দেখা দিয়েছে; বারবার তার স্বপ্ন-ছোঁওয়া মনের পরিচয় কাব্যরূপ পেয়েছে। 'পরিশেষ'-কাব্যে 'বিচিত্রা' ও 'বালক' কবিতায় সেই বালকের কথা আছে—

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ,
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা,
তেপান্তরী মাঠে।

—বিচিত্রা

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুই পহরে

....

একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন না করেছি খেলা।

....

সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি পেরিয়ে যাওয়া দূর,
বাজাতো কোন্ ঘর ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালোলাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইকো গোড়াআগা।
সাথাহীনের সাথী
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।

—বালক

প্রথম চিঠির 'সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী'র 'নানা মূর্তিতে সঙ্গদান'; 'জীবনস্মৃতি'র চকিত ছোঁওয়া, নানা ইশারায় খেলা; 'বিচিত্রা' কবিতার বাঁশির 'মায়াসুরে' জাগানো নানা রূপের 'স্বপ্নছবি'; 'বালক' কবিতার 'আকাশ-পাওয়া উদাসী মনে'র 'কিসের পরিচয়ের লাগি' উৎকণ্ঠা, এবং দিগন্তে 'সাথীহীনের সাথী'র 'নীল আসনে'র আভাস,—এরা প্রমাণ করে এই কথাটাই যে বালকের অস্পষ্ট চেতনায় ছিল একটি বিরাট সত্তার অনুভূতি। সে অনুভূতির অন্তরালে ছিল সমগ্র বিশ্বের প্রেরণা; চেতন ও অচেতন, প্রকৃতি ও মানুষ সেখানে অবাধে মিলেছিল।

বাল্যের এ-চেতনা কৈশোরে দীপ্ত হয়ে দেখা দিল "প্রভাতসঙ্গীত" রচনার পূর্বে। প্রত্যুষের আঁধার কাটিল একদিন সকালে জোড়াসাঁকোর বারান্দায় সূর্যোদয় দেখে; জীবনে ও কাব্যে ঘটল প্রভাত-সূর্যের প্রথম কিরণ-সম্পাত; বিশ্ব হঠাৎ আলোকিত হল অপরূপের স্পর্শে। 'বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী', 'চকিত ছোঁওয়া', 'ইশারা' যেন হঠাৎ কালো যবনিকা ভেদ করে সুস্পষ্ট রূপ

নিয়ে দাঁড়াল আলোকিত প্রাঙ্গণে। কবির এ-উপলব্ধিবর্ণনা আজ অতি-পরিচিত, তবুও তা আজও স্মরণীয়—

"চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা একনিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।" (জীবনস্মৃতি, পৃ ১২০-২১)

কবির চোখে অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হয়েছিল বিশ্বের 'আনন্দরূপ', 'নিখিল সমুদ্রে মহাসৌন্দর্যের তরঙ্গলীলা'। কিন্তু এ-উপলব্ধি সত্যই আকস্মিক নয়। অবচেতনে ছিল বালকের অসীম বিস্ময়বোধ; ছিল এক গূঢ় সত্তার স্পর্শে; আজ তা উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিল; আঁধারে নিমীলিত কোরক আলোকে উন্মীলিত শতদল হয়ে বিকশিত হল।

শৈশবের সহজ ও নিবিড় চেতনার সঙ্গে কৈশোরের এ-উপলব্ধির যে একটা গূঢ় যোগসূত্র ছিল সে-কথা কবি নিজেই ব্যক্ত করেছেন প্রভাত-সঙ্গীতের 'পুনর্মিলন' কবিতায় এবং পরবর্তীকালে—জীবনস্মৃতিতে। জীবনস্মৃতিতে প্রভাত-সঙ্গীত আলোচনার শেষে কবি বলেছেন,

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল।······সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। ······এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যা-

সঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন, যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম।…"(জীবনস্মৃতি, ১৩৬৩, পৃ ১২৬)

প্রভাতসঙ্গীতের এই চৈতন্যময় দৃষ্টিকে কবি উত্তরজীবনে একাধিকবার বর্ণনা করেছেন; বারবার এ-উপলব্ধিকে পরিস্ফুট করার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রসমালোচনায় তারা আজ সুপরিচিত।[১] এখানে শুধু এই কথাটির সুস্পষ্ট উদ্‌ব্যক্তি প্রয়োজন যে সেদিন রাতে প্রাত্যহিকতার তুচ্ছ অন্তরাল অপসারিত করে কবিমানস সত্যের ও ভূমার জ্যোতিঃস্পর্শলাভ করেছিল, তা মূলতঃ সৌন্দর্য চেতনা ও দৃষ্টি—জীবনস্মৃতির ভাষায় 'একটি মহাসৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস'—যে আভাস বাল্যে সুপ্ত ছিল মগ্নচৈতন্যে; কৈশোরে লুপ্ত হল অবরুদ্ধ 'হৃদয়-অরণ্যে'; যে-আভাস এবার যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমগ্র চেতনাকে উদ্ভাসিত করে সৌন্দর্যের দিব্যানুভূতি রূপে দেখা দিল।[২]

কবির এ-অভিজ্ঞতার কৌতুকাবহ সাদৃশ্য দেখি পশ্চিমের দুই সাহিত্য-রথীর অন্তর্জীবনে।

প্রথম জীবনের কোন দুর্লভমুহূর্তে এই ধরণের অপরূপ চেতনার আবির্ভাব ঘটেছিল কবি ওয়র্ডস্বর্থ ও মনীষী কারলাইল-এর অন্তরে।

১। দ্রষ্টব্য—মানুষের ধর্ম— মানবসত্য—পৃ ১০৫ ও পরে Religion of Man.

২। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং উত্তর-সমালোচকের মধ্যে কয়েকজন প্রভাতসঙ্গীত পর্বের এ অনুভূতিকে কবির 'বিশ্ববোধ' বা 'সর্বানুভূতি'র প্রাথমিক স্তর বলে দেখেছেন। অজিতকুমার সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন—"সমস্ত জলস্থলআকাশকে সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই 'সর্বানুভূতি'।" অজিতকুমারের উক্তি নিঃসংশয়ে সত্য। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এই সাধারণিক সংজ্ঞাকে বিশেষের মধ্যে দেখা; এই সর্বানুভূতির প্রাথমিক স্তরের স্বরূপটাকে দেখা। আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রকাব্যে এই বিশ্ববোধ এসেছিল বিশিষ্ট পথে—সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়ে, এক 'মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাসে'। বাল্যের চেতনা ও কৈশোরের অনুভূতি মূলত সৌন্দর্যসত্তারই অপরিস্ফুট অনুভূতি।

ওয়র্ডস্বর্থের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের এ-উপলব্ধির তীব্রতায় ও প্রসারতায় সমতুল্য নয়; তথাপি, তা ছিল চৈতন্যউদ্ভাসী এবং ঘটেছিল সূর্যোদয়কালে। প্রমোদভবনে নৃত্যে গীতে সারারাত কাটিয়ে পরিশ্রান্ত কবি যখন গৃহে ফিরছেন তখন অকস্মাৎ দেখলেন সামনে দিগন্ত আলোকিত করে নবীন সূর্যের প্রকাশ। কবির বর্ণাঢ্য উক্তি রয়েছে তাঁর The Preludeএ—

Magnificent.
The morning rose, in memorable pomp,
Glorious as ere I had beheld; in front,
The sea lay laughing at a distance; near,
The solid mountains shone, bright as the clouds,
Grain-tinctured, drenched in empyrean light;

...

...to the brim
My heart was full; I made no vows, but vows
Were then made for me; bond unknown to me
Was given, that I should be; else sinning greatly,
A dedicated Spirit. On I walked
In thankful blessednes, which yet survives.

—The Prelude, Book II

কারলাইলের প্রথম জীবনের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম রবীন্দ্রানুভূতির মতোই আকস্মিক ও অতীন্দ্রিয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির মতোই কারলাইলও ছিলেন প্রথম যৌবনে নীরন্ধ্র নৈরাশ্যে নিমগ্ন। এমন সময় তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে এল এক অনির্বচনীয় উপলব্ধি। তাঁর জীবনীকার Julian Symons লিখেছেন—

Some six months after, Carlyle had a curious experience of a kind that can only be called mystical. Like other mystical experiences; it can appear little more than merely bewildering or platitudinous when put down in plain print; but to Carlyle his passage from what he called 'The Everlasting No' through the 'Centre of Indifference' to the 'Everlasting Yea' seemed afterwards both the prelude to

manhood and some kind of spiritual conversion.......Painted with the dull colours of fact, this was what happened to Carlyle. He was walking down Leith Walk one day, on his way to the sea, when he asked himself suddenly what were the reasons for the obscure and pusillanimous apprehensions that he continually felt, what was he afraid of? What was the worse that could happen? Death. He must, then, meet death and the idea of hell and defy them. "And as I so thought, there rushed like a stream of fire over my whole soul; and I shook base Fear away from me for ever."

ওয়র্ডস্বর্থ, কারলাইল ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কৌতূহল জাগায়। সমগোত্রীয় হলেও তারা বিভিন্ন। ওয়র্ডস্বর্থ পেয়েছিলেন মূলত, কাব্যসাধনা-সম্পর্কীয় নৈতিক প্রেরণা যা এসেছিল কিছুটা বিবেকের অনুশাসন নিয়ে। কারলাইল পেয়েছিলেন সত্যের আলোকময় প্রসাদ যা মুহূর্তে উন্মুক্ত করেছিল জীবনের নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সত্যের অমৃতময় প্রকাশ যা উন্মীলিত করেছিল নিখিলসমুদ্রের সৌন্দর্যতরঙ্গভঙ্গ। সত্যকে ওয়র্ডস্বর্থ দেখেছিলুম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে; কারলাইল দেখেছিলেন ভয়মুক্ত অনন্ত অস্তিবাদে; রবীন্দ্রনাথ সত্যকে দেখলেন 'মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাসে'। রবীন্দ্রমানসে সত্য ও ভূমার চেতনা এনেছিল এই নৃত্যের আভাস উত্তরকাব্যে যে-আভাসে দেখা দেবে 'মানসী', দেখা দেবে 'মানসসুন্দরী' ও 'জীবনদেবতা'।

প্রভাতসঙ্গীত পর্বের এ-অনুভূতি যে মূলত সৌন্দর্যেরই অনুভূতি তার ইঙ্গিত রয়েছে এ কাব্যের 'প্রতিধ্বনি' কবিতায় এবং বিশেষ করে সে সম্পর্কে কবির উক্তিতে। সে উক্তি যেমন সরল তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ—

"প্রভাতসঙ্গীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।···আসল কথা, হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোন নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি।···

ওয়র্ডস্বর্থের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের এ-উপলব্ধির তীব্রতায় ও প্রসারতায় সমতুল্য নয়; তথাপি, তা ছিল চৈতন্যউদ্ভাসী এবং ঘটেছিল সূর্যোদয়কালে। প্রমোদভবনে নৃত্যে গীতে সারারাত কাটিয়ে পরিশ্রান্ত কবি যখন গৃহে ফিরছেন তখন অকস্মাৎ দেখলেন সামনে দিগন্ত আলোকিত করে নবীন সূর্যের প্রকাশ। কবির বর্ণাঢ্য উক্তি রয়েছে তাঁর The Prelude-এ—

Magnificent.
The morning rose, in memorable pomp,
Glorious as ere I had beheld ; in front,
The sea lay laughing at a distance ; near,
The solid mountains shone, bright as the clouds,
Grain-tinctured, drenched in empyrean light ;

...

...to the brim
My heart was full ; I made no vows, but vows
Were then made for me ; bond unknown to me
Was given, that I should be ; else sinning greatly,
A dedicated Spirit. On I walked
In thankful blessednes, which yet survives.

—The Prelude, Book II

কারলাইলের প্রথম জীবনের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম রবীন্দ্রানুভূতির মতোই আকস্মিক ও অতীন্দ্রিয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির মতোই কারলাইলও ছিলেন প্রথম যৌবনে নীরন্ধ্র নৈরাশ্যে নিমগ্ন। এমন সময় তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে এল এক অনির্বচনীয় উপলব্ধি। তাঁর জীবনীকার Julian Symons লিখেছেন—

Some six months after, Carlyle had a curious experience of a kind that can only be called mystical. Like other mystical experiences ; it can appear little more than merely bewildering or platitudinous when put down in plain print ; but to Carlyle his passage from what he called 'The Everlasting No' through the 'Centre of Indifference' to the 'Everlasting Yea' seemed afterwards both the prelude to

manhood and some kind of spiritual conversion.......Painted with the dull colours of fact, this was what happened to Carlyle. He was walking down Leith Walk one day, on his way to the sea, when he asked himself suddenly what were the reasons for the obscure and pusillanimous apprehensions that he continually felt, what was he afraid of? What was the worse that could happen? Death. He must, then, meet death and the idea of hell and defy them. "And as I so thought, there rushed like a stream of fire over my whole soul; and I shook base Fear away from me for ever."

ওয়র্ডস্বর্থ, কারলাইল ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কৌতূহল জাগায়। সমগোত্রীয় হলেও তারা বিভিন্ন। ওয়র্ডস্বর্থ পেয়েছিলেন মূলত, কাব্যসাধনা-সম্পর্কীয় নৈতিক প্রেরণা যা এসেছিল কিছুটা বিবেকের অনুশাসন নিয়ে। কারলাইল পেয়েছিলেন সত্যের আলোকময় প্রসাদ যা মুহূর্তে উন্মুক্ত করেছিল জীবনের নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সত্যের অমৃতময় প্রকাশ যা উন্মীলিত করেছিল নিখিলসমুদ্রের সৌন্দর্যতরঙ্গভঙ্গ। সত্যকে ওয়র্ডস্বর্থ দেখেছিলুম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে; কারলাইল দেখেছিলেন ভয়মুক্ত অনন্ত অস্তিবাদে; রবীন্দ্রনাথ সত্যকে দেখলেন 'মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাসে'। রবীন্দ্রমানসে সত্য ও ভূমার চেতনা এনেছিল এই নৃত্যের আভাস উত্তরকাব্যে যে-আভাসে দেখা দেবে 'মানসী', দেখা দেবে 'মানসসুন্দরী' ও 'জীবনদেবতা'।

প্রভাতসঙ্গীত পর্বের এ-অনুভূতি যে মূলত সৌন্দর্যেরই অনুভূতি তার ইঙ্গিত রয়েছে এ কাব্যের 'প্রতিধ্বনি' কবিতায় এবং বিশেষ করে সে সম্পর্কে কবির উক্তিতে। সে উক্তি যেমন সরল তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ—

"প্রভাতসঙ্গীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।···আসল কথা, হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোন নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি।···

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ-কাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। **সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।**…

সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেইদিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। **সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য।** যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল…; **তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ।**" (জীবনস্মৃতি, পৃ ১২৪-২৫।)

শেষবয়সে রচনাবলীর সূচনায় এ কবিতা সম্পর্কে কবি বলেছেন—

"'প্রতিধ্বনি' কবিতা লিখেছিলাম যখন প্রথম গিয়েছিলাম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রেখেছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে।" (রচনাবলী—১ম খণ্ড, সূচনা, প্রভাতসঙ্গীত।)

এ দুটি উদ্ধৃতি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অবিস্মরণীয় উপলব্ধির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিল কবির এই দুটি উক্তিতে। সুস্পষ্ট হয়ে ব্যক্ত হল এই তথ্যটি যে জোড়াসাঁকোর বারান্দায় যে দিব্যচেতনা কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা অন্তরে

জাগিয়েছিল মহাসৌন্দর্যব্যাকুলতা। 'প্রতিধ্বনি' কবিতার ব্যাখ্যায় স্তরে স্তরে বর্ণিত হল তার উৎস-মুখ, তার উৎসারণ-রেখা, ভঙ্গি, পথ।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে অনাদিকালের অনাহত ধ্বনি। সমস্ত খণ্ডসৌন্দর্য সে মূলতম ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি, 'যা নিঝর্রিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে'। সে প্রতিধ্বনি চলেছে সীমা হতে অসীমের দিকে, এবং সেই অসীমের দিকের প্রতিধ্বনিই মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। ফ্রী স্কুলের বাগানের দিকে সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে কবি যখন আবরণমুক্ত চক্ষে দেখেছিলেন বিশ্বসংসারের অপরূপ মহিমা তখন বোধ করি কানে শুনেছিলেন সেই অনাদি কালের অনাহত ধ্বনি। সে গান থেমে গেল; কিন্তু তা অন্তরে যে-ব্যাকুলতা জাগাল তারই কথা দেখি 'প্রতিধ্বনি' কবিতায়। রবীন্দ্রমানসে পরিস্ফুট রেখায় প্রথম দেখা দিল সৌন্দর্য-আকুতি।

এ প্রসঙ্গে মানসীর ভূমিকা স্বরূপ 'উপহার' কবিতাটি যেমন কৌতুকাবহ তেমনি গুরুত্বময়। 'উপহার'এ কবির সৌন্দর্যকামনার ক্রমবিকাশ অঙ্কিত রয়েছে সুস্পষ্ট স্তরবিন্যস্ত রেখায়। তা সম্পূর্ণ ও অবিকল কবির প্রতিধ্বনি কবিতার ব্যাখ্যারই কাব্যরূপ। সেখানেও দেখব বহির্বিশ্বের নানা সঙ্গীহারা সৌন্দর্য কবিকে আকুল করেছে; বিচিত্র দুরাশা জাগিয়েছে, বিরহী ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই বিরহী ভাবনা থেকেই জন্ম নেবে সৌন্দর্যকল্পনার মূর্ত প্রতীক 'মানসী'। উপহার কবিতার আলোচনা হবে যথাস্থানে, উপস্থিত এ তথ্যটি প্রোচ্চারিত হোক যে 'প্রতিধ্বনি'র ব্যাখ্যায় যে-উপলব্ধি বর্ণিত তা কবির সমগ্র জীবনের নিবিড়তম উপলব্ধির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির প্রথম অরুণোদয় সেখানে।

সুতরাং আমরা দেখলাম শৈশবের আবছা মনের আড়ালে যে অস্পষ্ট চেতনা ছিল অর্ধসুপ্ত, প্রথম যৌবনে এক পুণ্যপ্রভাতে তা আলোকে ফুটে উঠল। সে-প্রভাত সমুদ্ভাসিত করেছিল বিশ্বের অনির্বচনীয় মহিমা, সত্যের জ্যোতির্ময় স্বরূপ। বিহ্বল কবিচক্ষে উন্মুক্ত হল মহাসৌন্দর্যের তরঙ্গলীলা; বিস্ময়াবিষ্ট কবিচিত্তে উদ্বোধিত হল সৌন্দর্যব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী সৌন্দর্য-কল্পনার উৎস এইখানে।

॥ ৪ ॥

প্রভাতসঙ্গীতের আর একটি দিক বিশেষ কৌতূহল জাগায় এবং তা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এ কাব্যের শেষভাগে দেখি বিশ্বের প্রাণতরঙ্গ উন্মুক্ত হবার পরেই বিশ্বের রূপতরঙ্গ দুচোখ ভরে দেখার অসীম তৃষ্ণা জেগেছে কবির মনে। শুধু চোখ মেলে চেয়ে থাকার নেশা পেয়ে বসেছে কবিকে। যেন বাল্যকালের অর্ধস্ফুট সৌন্দর্যচেতনা পূর্ণ বিকশিত রূপে ফিরে পাবার পরই শিশুকবির আর একটি দৃষ্টি তিনি ফিরে পেলেন— তার উন্মুখ বাস্তবদৃষ্টি। সন্দেহ নেই সে-দৃষ্টি স্বপ্নমাখা চোখের, তবু সে-দৃষ্টি প্রসারিত বহির্জগতে। 'চেয়ে থাকা' কবিতায় সে-দৃষ্টি—

মনেতে সাধ যেদিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব,
দেখিব শুধু দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।
......
সুধীর স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায় ভাসিয়া যায়
কত না নরনারী;
......
কত কি আশা গড়িছে বসে
তাদের মনখানি,
কত কী সুখ, কত কী দুখ
কিছুই নাহি জানি।
......
পথের ধারে ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে
ছোট ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কী গান গেয়ে।

তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে,
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি
হৃদয় যায় গলে।

—চেয়ে থাকা

প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে ঘিরে কাব্যে এই প্রথম উৎসারিত হল কবির রোম্যান্টিক বাস্তব দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে কল্পলোকের নানা রং মিলেছে তবু তা বাস্তবাভিমুখী। বিশ্বের লোকাতীত সৌন্দর্যের সঙ্গে মাটির কাছের মানুষও কবিকে উৎসুক করেছে।

এই দৃষ্টিই সম্প্রসারিত 'ছবি ও গান'-এ। 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত।…

নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই 'ছবি ও গান' এ আরম্ভ হইয়াছে। (জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩৪)

কবির এই আত্মসমীক্ষা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে রচনাবলীর সূচনায়। কবি বলেছেন, "এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না।…কবি সংসারের ভিতর তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়।" (রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সূচনা, ছবি ও গান)

তবু সব থেকে বড় কথা এই যে এ-রূপান্বেষী, বহির্মুখী দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে এত পূর্বে দেখা দিয়েছিল, এবং তাঁর রোম্যান্টিক মানস আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে বহির্বিশ্বে চোখ মেলেছিল; সব থেকে বড় কথা এই যে "মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে।" (রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সূচনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ।)

'ছবি ও গান' একান্ত অপরিণত রচনা; 'তার কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রং'। তথাপি 'ছবি ও গান' রবীন্দ্রকাব্যে একটি বৃহৎ সম্ভাবনার সূচনা এনেছিল যা রোম্যান্টিক কাব্যের দুঃসাধ্য আকাঙ্ক্ষা—আত্মমুখী কল্পনার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ বহির্মুখী দৃষ্টির সহজ সমন্বয়, গানের সঙ্গে ছবির সঙ্গতি। 'ছবি ও গানে' 'যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত', সুখস্বপ্নাবেশে মন সমাচ্ছন্ন। শরীরে মনে 'নবযৌবন যেন বন্যার মতো এসে পড়েছিল'। তথাপি ছবি ও গান বাস্তবদৃষ্টির নানা রেখায় সমৃদ্ধ। সে-দৃষ্টি পরিকীর্ণ মানবলোকে আপাততুচ্ছ দৃশ্য ও ঘটনায়—'একাকিনী', 'গ্রামে', 'খেলা', 'পোড়োবাড়ি' প্রভৃতি কবিতায়, সে-দৃষ্টি পরিকীর্ণ প্রকৃতিলোকে নানা সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতির মাঝে—'দোলা', 'আদরিণী', 'বিদায়', 'আর্তস্বর', 'যোগী', 'নিশীথ জগৎ', ও 'নিশীথ চেতনা' কবিতায়!

ছবি ও গানের এ প্রতিশ্রুতির আভাস প্রবল হয়ে দেখা গেল 'কড়ি ও কোমলে'। মানুষের মাঝে, 'হাসি-অশ্রুময় চিরতরঙ্গিত ধরার প্রাণের মেলার মাঝে' বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম ধ্বনিত হল এ কাব্যে। কিন্তু এ-আকাঙ্ক্ষাশিখা রবীন্দ্রকাব্যে মধ্যপথে হঠাৎ নির্বাপিত হবে আর এক ঝড়ের বেগে। বাইরে-মেলা চোখ হঠাৎ হারাবে তার বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা; হঠাৎ আবিষ্কার করবে বিশ্বের অন্তরে প্রবাহিত সৌন্দর্যের প্রস্রবণধারা; উৎকণ্ঠ আকুতি জাগাবে অন্তরে সেই নিরন্তরমুখরিত ধারামূলে আসীনা 'ত্রিলোকনন্দন-মূর্তি' সৌন্দর্যলক্ষ্মী। 'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রমানস দাঁড়িয়েছিল পথসন্ধিতে। একদিকে উন্মুক্ত ছিল জীবনের সিংহতোরণ, যেখানে 'মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার'।

অন্যদিকে অবারিত হল জীবনবিচ্ছিন্ন জনহীন পথরেখা যার দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে অলোকসুন্দর মানসী-মূর্তি। রবীন্দ্রকাব্য সমুখের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল 'কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু'; শুনেছিল দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হতে শুধু 'সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান'। অবারিত প্রবেশ ঘটল না দীর্ঘকাল; কবির ব্যাকুল পদরেখা চলে গেল অন্যপথে, 'মানসী'র উৎকণ্ঠ অভিসারে।

'ছবি ও গানে'ই দেখি সে পদরেখার প্রথম অস্পষ্ট আভাস। প্রথমেই 'কে?' কবিতাটি কৌতূহল জাগায়। কার উদ্দেশে রচিত এই স্তবক দুটি?—কে সে?

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো,
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।
সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুমবনেতে।

একটি কথার সুস্পষ্ট আলোচনা এখানে একান্ত প্রয়োজন। প্রশ্ন ওঠে—এবং সে-প্রশ্ন 'মানসী'-কাব্য আলোচনায় বারবার উঠবে—এ-কবিতার উদ্দিষ্ট নারী মানবী না কোন অমূর্ত সত্তা? সুচিন্তিত গবেষণায় আজ এ-তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে কবির প্রথম বয়সের বহু কবিতার প্রেরণা-দাত্রী, কবিমানসীর মূর্তপ্রতিমা,—কবির 'নোতুন বৌঠান', কাদম্বরী দেবী।* সন্দেহ নেই যে এ-গবেষণা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য। তথাপি এ কথাও সমান সত্য এবং তা সংক্ষেপে উদ্‌ব্যক্ত করাই যথেষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৌন্দর্য-কল্পনার উন্মেষে কাদম্বরী দেবী বিপুল প্রবর্তনা এনেছেন; সে-কল্পনার বিবর্তনে তিনি অপরিহার্য সেতু-স্বরূপ। কিন্তু মানবীর ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রকাব্যে শীঘ্রই সমুজ্জ্বল হয়েছে অমর্তলোকের আভাস, অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটেছে দিব্য-রূপিণী সৌন্দর্যমূর্তির। সে আভাস পেয়েছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শৈশবে; সে-মূর্তির অস্পষ্ট প্রকাশ দেখেছিলেন 'প্রভাতসঙ্গীত'-চেতনা-উদ্‌বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে, 'ছবি ও গানে'। সেই অস্পষ্ট প্রকাশ-রেখাই প্রথম দেখা দিল 'কে?' কবিতায়।

তৃতীয় কবিতা 'জাগ্রত স্বপ্ন-'এ গতানুগতিক কল্পনার অন্তরালে কবিচিত্তের সৌন্দর্যকল্পনাপ্রবণতা আবার ধরা পড়েছে। বসন্তসমাগমে প্রাকৃতিক শোভা সে-কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছে—

* দ্রষ্টব্য: 'কবিমানসী'—জগদীশ ভট্টাচার্য: 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ—মাঘ ১৩৬৪

বসন্তবাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদু বাস।
যেন সুদূর নন্দন-কানন-বাসিনী
সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।

যে-কল্পনার রেখামাত্র ফুটে উঠেছে 'সুদূর নন্দন-কানন-বাসিনী'র মাঝে, তারই প্রকাশ দেখি 'আচ্ছন্ন' কবিতায় উষাময়ীর আবাহনে। স্পষ্টই মনে হয় সদ্য-প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য-অনুভূতি রূপ খুঁজে ফিরছে প্রকৃতির মাঝে; কখনও তার অভিসার সুদূর নন্দনকাননে, কখনও তা উৎসৃষ্ট 'উষাময়ী'র মূর্তিরচনায়—

কে তুমি গো উষাময়ী আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি একবার চেয়ে দেখি
স্বর্ণজ্যোতি কমল-আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে ওঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।

প্রকৃতির অন্তরে এই মূর্তিসন্ধানী দৃষ্টি ও কল্পনা বারবার দেখা দিয়েছে 'ছবি ও গানে'।

কিন্তু 'ছবি ও গানে'র বৈশিষ্ট্য হল—এ-দৃষ্টি ও কল্পনার আপাতবিরুদ্ধ বৈচিত্র্য। একদিকে 'জাগ্রতস্বপ্ন', 'আচ্ছন্ন', 'স্নেহময়ী' প্রভৃতি কবিতায় দেখি চিরাচরিত ভাবতান্ত্রিক কল্পনা: প্রভাতকিরণে আপন মহিমায় দাঁড়িয়েছেন 'করুণাময়ী', 'শান্তিময়ী' প্রকৃতিদেবী; হাস্যোজ্জ্বল সে-মূর্তি। তাঁর দৃষ্টিসুধায় প্লাবিত চরাচরভূমি। অন্যদিকে রয়েছে তিনটি কবিতা—'আর্তস্বর', 'নিশীথ-জগৎ,' ও 'নিশীথ-চেতনা'। প্রকৃতির শান্তি ও করুণাকে ছিন্ন করে

'আর্তস্বরে' জেগে উঠেছে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রে নিশীথিনীর উন্মাদিনী-রূপ, তার আর্তসন্ধান, তার তীব্র ক্রন্দনরোল। 'নিশীথ জগৎ'-এ সৃষ্ট হয়েছে তিমিরাবৃত বিশালজগৎ; নির্মম, ভয়সঙ্কুল, রহস্যনিবিড়, যেখানে পদে পদে দুঃখ ও বেদনা, ক্রন্দন ও হাহাকার; যেখানে—

অন্ধকার ভাগ করি, আঁধারের রাজ্য লয়ে
চলিছে বিবাদ,
সখারে বধিছে সখা সন্তানে হানিছে পিতা,
ঘোর পরমাদ।
মৃত দেহ পড়ে থাকে, শকুনি বিবাদ করে
কাছে ঘুরে ঘুরে,
মাংস লয়ে টানাটানি করিতেছে হানাহানি
শৃগালে কুকুরে।
অন্ধকার ভেদ করি অহরহ শুনা যায়
আকুল বিলাপ,
আহতের আর্তস্বর, হিংসার উল্লাসধ্বনি
ঘোর অভিশাপ।

এ তীব্র, বলিষ্ঠ বাস্তবদৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দিয়েছে এতপূর্বে—এ তথ্য আজও বোধ হয় সাধারণ্যে অজ্ঞাত।

আমাদের আলোচনার মূল সূত্রে ফিরে আসি। সুধাময়ী, স্নেহময়ী প্রকৃতির মধ্যেই হোক, বা ভয়-ভীষণা উন্মাদিনী নিশীথিনীর মধ্যেই হোক, 'ছবি ও গানে' কবির উক্তি এবার স্মরণ করা যাক—'**কামনা** কেবল সুর খুঁজছে না' **রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে**'। এ উক্তির গভীর অর্থ এবার হয়তো সুস্পষ্ট হবে। কবির কামনা ছিল দু'চোখ মেলে বিশ্বকে দেখা। সেই রূপসন্ধানী দৃষ্টিই প্রকৃতির অন্তরে খুঁজে ফিরছে সদ্য-উন্মেষিত সৌন্দর্যকামনার নানা প্রতিরূপ। 'কে' কবিতায় সে দৃষ্টি রূপের আভাস পেয়েছে তার মাঝে, যে 'প্রাণের পরে বসন্তের বাতাসটুকুর মতো ছুঁয়ে গেল'; পেয়েছে 'জাগ্রত স্বপ্নে' নন্দন-কানন-বাসিনীর মধুর হাস্যে; পেয়েছে 'আর্তস্বরে' উন্মাদিনী নিশীথিনীর করাল-মূর্তিতে। 'ছবি ও গান'-এ কবির অন্তরতম কামনা রূপকে খুজছে নানাভাবে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, 'আলো আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে

কিছু পায় না'। 'ছবি ও গান' সেই আভাসকেই বহন করেছে; স্পষ্ট করে কিছু পায় নি।

॥ ৫ ॥

আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেগ নিয়ে দেখা দিল 'কড়ি ও কোমল'। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি বলেছেন, "আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয়, তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে।" (জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫১)। সে ব্যগ্র হাতের আভাস দেখেছি 'ছবি ও গানে'; 'কড়ি ও কোমলে' তা পূর্ণ প্রসারিত হল। 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার', সুখদুঃখের নিত্যতরঙ্গিত কলধ্বনি কান পেতে শোনবার 'ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' পূর্বে কোন কাব্যেই এমন একান্ত হয়ে দেখা দেয় নি।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রমানস তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল। 'কড়ি ও কোমল' থেকেই উৎসারিত কবিমানসের দুটি বিরুদ্ধ ধারা—মানুষের মুক্ত জীবনপ্রবাহে অবগাহনের বিপুল বাসনা এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের নিরুদ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা। এই দুই বিপরীত ধারা জীবনে ও কাব্যে যে সংঘাত ও বিরোধ আনবে তার বীজ মানসভূমিতে সঞ্চারিত হল 'কড়ি ও কোমল'-এই।

এ-কাব্যে ভাবধারার ক্রমপরিণতি চিত্তাকর্ষক। তাকে মূলত পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, 'প্রাণ' থেকে 'খেলা' পর্যন্ত সতেরোটি কবিতায় দেখি 'হাসিঅশ্রুময়' বিরাট জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এদের মূল সুর শুধু মানুষের মাঝে বাঁচবার ইচ্ছাই নয়; এদের অন্তরতম কামনা হল—

ধরার প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত
বিরহ-মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়—

এ-কামনার সঙ্গে মিলেছে কবির বাস্তবতন্ত্রী দৃষ্টি ; সে-দৃষ্টির লক্ষ্যপ্রবণতা মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য, ব্যর্থতা ও হতাশা। প্রথম পর্যায়ের এই কবিতা-গুলি পড়তে পড়তে বার বার মনে হয় কবির এই বাস্তবচেতনার সঙ্গে যদি বিষয়াশ্রিত বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনার সার্থক সংযোগ ঘটত, যদি সাধারণিক আভাস ও উল্লেখের বদলে মিলত নিরাসক্ত নাটকীয় ভঙ্গি, তাহলে পেতাম, হয়তো স্বল্প ইঙ্গিতে, 'পলাতকা'র কবিকে, 'পুনশ্চে'র কবিকে। সে-সম্ভাবনার ক্ষীণ প্রতিশ্রুতি কড়ি ও কোমলে রয়েছে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক মৈব্যক্তিক দৃষ্টি সুদূর-পরাহত বলেই 'মঙ্গলগীত' কবিতায় পাই শুধু এই সাধারণিক বাস্তবচেতনা—

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি
মানবের পাষাণ পরান।
শানিত ছবির মতো বিঁধাইয়া বাণী,
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

এ-বাস্তবচেতনা মিলিয়ে গেল 'খেলা' কবিতায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি, দৃষ্টি আত্মমুখী, কল্পলোকগামী। 'বসন্ত-অবসান' কবিতায় গানের আকুতি জাগাল পূর্ব-স্মৃতির অনুরাগ। 'বসন্ত-অবসান'-এ মধ্যপথে দেখা দিল কাব্যের ঋতু-বদল—

ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।

কবির মন ছিল বহির্লোকে উন্মীলিত, বিশ্বের হাসি-খেলার মাঝে ; জাগ্রত প্রাণ এবার নয়ন মেলে চাইল অন্তর্লোকে। চেয়ে দেখল—

কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান॥

দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্য ফিরে এল আত্মলোকে। এখান থেকে কবিমানসের পদচিহ্ন একান্ত ঔৎসুক্য জাগায়। বিচিত্র পথে 'বসন্ত-অবসান' থেকে 'গীতোচ্ছ্বাস' পর্যন্ত ১৩টি কবিতায় * কবির প্রেম-ও সৌন্দর্য-অনুভূতি আবার দেখা দিল। 'ছবি ও গান'-এর অস্ফুট কোরক স্ফুটতর হল এ-কাব্যের এই কবিতাগুচ্ছে। আমাদের মূল আলোচনার ক্ষেত্রে এরা গুরুত্ব বহন করবে।

'ছবি ও গান'এর 'কে' কবিতার অস্পষ্ট সত্তাকে ফিরে পেলাম 'বসন্ত-অবসান'-এর পর 'বাঁশি' ও 'বিরহ' কবিতায়। 'বসন্ত-অবসান'এ যে-নারীর নয়ন অভিমানে 'ছলছল', 'বাঁশি' ও 'বিরহ' কবিতায় তারই ইঙ্গিতময় আভাস রয়েছে—

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মধুর গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥" —বাঁশি

'বিরহ' কবিতার ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট, আকূতি আরও গভীর—

আমি তার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে॥
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।

'ছবি ও গানের' 'কে', 'জাগ্রত স্বপ্ন', 'আচ্ছন্ন' প্রভৃতি কবিতার মূর্তিসন্ধানী দৃষ্টি 'কড়ি ও কোমলে'র এই কবিতাগুচ্ছে স্পষ্টতর; বেদনা ও আকুলতা তীব্রতর। অপরিণত কবির বাষ্পময় ভাবালুতা ছত্রে ছত্রে পরিকীর্ণ, তথাপি

*। 'কড়ি ও কোমল'এর কবিতার রচনাকাল আমাদের জানা নেই। তথাপি দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলির অনুক্রম মনে রাখা প্রয়োজন—বসন্ত-অবসান, বাঁশি, বিরহ, বিলাপ, সারাবেলা, আকাঙ্ক্ষা, তুমি, গান, ছোট ফুল, যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, গীতোচ্ছ্বাস।

তারই মধ্যে সৌন্দর্যকামনা যেন বাষ্পদেহ থেকে ধীরে ধারে 'মূর্তি গ্রহণ করছে।

এখানে একটা কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। পূর্বে বলা হয়েছে মৃত্যুর শোকচ্ছায়ায় 'কড়ি ও কোমল' রচিত; প্রথম পর্যায়ের কবিতায় তার রেখাপাত ঘটেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি সে-মৃত্যুস্মৃতির বেদনাই ধীরে ধীরে জাগ্রত করল দিব্যচেতনা, সৌন্দর্যসত্তার আভাস। দৃষ্টান্ত রয়েছে 'বিলাপ' কবিতায়। কবিতাটিতে মৃত্যুস্মৃতির অভ্রান্ত স্পর্শ রয়েছে; তথাপি তারই মাঝে কবির প্রেম ও সৌন্দর্য-কামনার ছায়া পড়েছে। মৃত্যুশোকের প্রবলতাই সে কামনাকে জাগ্রত করেছে। প্রত্যক্ষ মানসে রয়েছে বিগত আত্মীয়ার স্মৃতি; অগোচরে ফুটে উঠেছে নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যকামনা। বস্তুত 'বিরহ' থেকে 'আকাঙ্ক্ষা' পর্যন্ত পাঁচটি কবিতায় বাঞ্ছিত নারীর স্মৃতি পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তার অন্তরালে আভাসে ধরা দিয়েছে সৌন্দর্যসত্তা। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় এই দ্বৈতসুর কৌতূহল জাগায়। প্রথম স্তবকে পরিস্ফুট অনির্দিষ্ট এই 'আকাঙ্ক্ষা'—

আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়,
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়॥

দ্বিতীয় স্তবকে মূর্ত হয়ে উঠেছে বিগতার বিরহস্মৃতি—

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারি দিকে চায় মন কেঁদে গায়
এ নহে, এ নহে, নয় গো।
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়,

আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়।

প্রশ্ন জাগে, এ বিলাপ কি শুধু মানবীর জন্য? প্রত্যক্ষ মানসে যদি থাকে মানবীর বিরহ, অপ্রত্যক্ষ অন্তরালে দেখা দিয়েছে কবির সৌন্দর্যকামনা। 'ছায়াময়ী অমরায়' এলোকেশী নারী যদি মানবীয় মূর্তিরই প্রতীক হয় তবে সে প্রতীকের অন্তস্তলে অলক্ষ্যে ছায়া পড়েছে অমূর্ত কল্পনার। মানবীয় বিরহে এসে মিশেছে কবির সৌন্দর্য-আকুতি। স্পষ্টই মনে হয় মৃত্যুর পট-ভূমিতে মানবীয় শোক-বিরহ আর সৌন্দর্যের অস্পষ্ট কামনা একাত্ম হল। সন্দেহ থাকে না, রবীন্দ্রনাথের সদ্য-উন্মেষিত সৌন্দর্য-অনুভূতি মৃত্যুর অভিঘাতে, বিরহের নিবিড়তায় সঞ্জীবিত হল।

'তুমি' কবিতার প্রথম সম্ভাষণ লক্ষণীয়—

তুমি কোন্ কাননের ফুল
তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা।
কবে তুমি গেয়েছিলে
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে
ঐ নয়নের তারা।

মৃত্যুস্মৃতি এবার ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে। কবির মানসপটে জেগে উঠেছে অনন্তবিরহ। সদ্য-বিকশিত সৌন্দর্যকল্পনা মৃত্যুস্নাত হয়ে কাব্যে আবার দেখা দিল।

দুটি কবিতার পর 'যৌবনস্বপ্নে' উন্মুক্ত হল 'কড়ি ও কোমলে'র বিশিষ্ট সৌন্দর্য-চেতনা—আবেশ-বিহ্বল, ইন্দ্রিয়ানুগ। যৌবনস্বপ্নে দেখি সে চেতনার মূলতম সুর—তার স্পর্শশিহরণ, তার পুলকসঞ্চার,—তার অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা। কবিতার ছত্রে ছত্রে এ সুর অনুরণিত—

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুহুঝুহু বলে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুল
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

কবির কাব্যধারায় 'যৌবনস্বপ্ন' কবিতাটি বিশিষ্ট মূল্য পাবে। 'প্রভাত-সঙ্গীত' থেকে উৎসারিত রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি একটি বিশেষ স্তরে এসে পৌঁছল এ কবিতায়। সে-স্তর মূলত ইন্দ্রিয়ানুগ। কবির সমগ্র অনুভূতি এই ইন্দ্রিয়ানুগ অনুভূতিরই সাক্ষ্য বহন করে। বস্তুত, নিবিড় ইন্দ্রিয়চর্যা সৌন্দর্য-উন্মুখ বহু কবির একান্ত কাম্য পথ। এ কল্পনার অভিসার-পথে বহু কবিই ক্ষণিক আতিথ্য নিয়েছেন এই অনুভূতিকুঞ্জে। এই পথেরই পথিক কবি কীটস্ তাঁর প্রথম যৌবনে এ-কুঞ্জের রমণীয়তাকে কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু উর্ধ্বে প্রসারিত সৌন্দর্যসত্তার দুর্গমপথের আভাস তিনি শুধু অন্তরেই পেয়েছিলেন; সে দুঃসাধ্য পদব্রজ্যার অবকাশ জীবন তাকে দেয় নি।

সে-অবকাশ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম জীবনেই। ছেলেবেলায় ঘটেছিল যে সত্তার নানা মূর্তিতে সঙ্গদান, প্রথম যৌবনে যার ক্ষণিক প্রসাদ-লাভ করেছিলেন দুর্লভ মুহূর্তে, 'কড়ি ও কোমল'এ যৌবনমোহাবিষ্ট কবি সেই সত্তাকেই আবিষ্কার করলেন ইন্দ্রিয়পথে।

'যৌবনস্বপ্নে' কবির সৌন্দর্যানুভূতি কাব্যে ফিরে এল। পরের দুটি কবিতাও—'ক্ষণিক মিলন' ও 'গীতোচ্ছ্বাস'—ইঙ্গিতপূর্ণ। বিশেষ করে 'ক্ষণিক মিলন' গভীর ঐতিহাসিক মূল্য পাবে। কবিতাটির গূঢ় অর্থ কৌতূহল জাগায়—

আকাশের দুইদিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ কে জানে এসেছে কোথা হতে।
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।

'যৌবনস্বপ্নের' ঠিক পরেই কী অর্থ এ কবিতার? সৌন্দর্যকল্পনার আলোকেই এ কবিতার অর্থ পরিস্ফুট হবে। মহাকালের আকাশে দুটি

মেঘের মতো ভেসে এল কবির চিত্ত আর সৌন্দর্যসত্তা। কবি বলছেন এই দুই অচেনার চেনাশোনা বহুকালের—

ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়াদ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে
কোন্ সন্ধ্যাসাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই তিনটি লাইনের গুরুত্ব অনেকখানি। সেখানে দেখি কবির সৌন্দর্যকল্পনার একটি বিশিষ্ট ভাবধারার প্রথম উন্মেষ। অদূরে 'মানসী' কাব্যে দেখা যাবে সৌন্দর্যকল্পনার এই বিশেষ ভাবধারা—এই জন্ম-পূর্ব-অনুরাগ-স্মৃতি। তার প্রথম আভাস রয়েছে 'ক্ষণিক মিলন'এ। এ কল্পনারই পরিণত প্রকাশ দেখব 'মানসী'র 'পূর্বকাল' ও 'অনন্ত প্রেম'-এ, 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী'তে। ঐতিহাসিক দৃষ্টি তাই এ-কবিতাকে গভীর মূল্য দেবে।

'গীতোচ্ছ্বাস' কবিতাটিরও ব্যঞ্জনা গভীর। 'নীরব বাঁশরি'* আবার বেজে উঠেছে। এই বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে জাগাল নানা বিস্মৃত বাসনা। তার পর কবির ঘোষণাটি সুপষ্ট—

তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো।
জগৎকমলবনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।

রবীন্দ্রকাব্য কখনো কখনো একান্ত যুক্তি-নির্ভর হয়ে দেখা দেয় এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধটা স্পষ্ট রূপ নেয়। এ কবিতায় 'তাই' শব্দটি তার প্রমাণ। বাঁশি আনল প্রিয়ার বারতা, তার পর চারটি 'তাই' শব্দে সূচিত হল কারণ-সম্বন্ধ। পরিশেষে উদ্ব্যক্ত হল—

জগৎকমলবনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।

* দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম থেকেই, অর্থাৎ 'বসন্ত-অবসান' থেকেই এই বাঁশির রূপকটি বারবার দেখতে পাই; এ পর্যায়ের দ্বিতীয় কবিতা 'বাঁশি'; তার পর 'বিরহ', 'বিলাপ', 'সারাবেলা' ও 'গান'—প্রায় সমস্ত কবিতায় এই বাঁশির উল্লেখ ঘটেছে। সৌন্দর্যকল্পনার পুনর্জাগরণের সঙ্গে বাঁশির বাদক ও বাঁশির ধ্বনি একান্ত সংশ্লিষ্ট।

বলা বাহুল্য, 'কমল-আসনা' কবির আবাল্য-সাধিত সৌন্দর্যকল্পনারই প্রতিমূর্তি।

কিন্তু কবিতাটির চরম তাৎপর্য রয়েছে অন্তিম ভাগে; কবি বলছেন—

সে এল না, এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?

শেষের এই চার লাইনে কবির ইন্দ্রিয়ানুগ কল্পনাই নূতন বাঁক নিল। কবি আভাসে পেলেন তাঁর মানস-প্রিয়ার স্পর্শ, কিন্তু তার আবির্ভাব ঘটল না—

সে এল না, এল তার মধুর মিলন।

কবিকে উতলা করেছে তার স্বর, তার দৃষ্টি, তার চুম্বন। দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তিম কবিতায় সূচিত হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের মাঝে কমল-আসনার সৌন্দর্যরূপ আবিষ্কারের অভিযান, 'দেহের সায়রে' লুকানো হৃদয়ের সন্ধান।

কড়ি ও কোমল-এর তৃতীয় পর্যায় এই অভিযানেরই ইতিহাস। 'স্তন' থেকে 'পবিত্র প্রেম' পর্যন্ত ২২টি সনেটে সে-ইতিহাস স্তরে স্তরে দ্রুত পরিণতি লাভ করেছে। প্রথম ভাগে দেখি কবি অসীম সৌন্দর্যের তৃষ্ণা নিয়ে দেহের রহস্যে নিমগ্ন। নয়নে দেখেছেন তাঁর সদ্য-উদ্ভাসিত প্রিয়ার 'নূতন আকাশ'; দেখেছেন—

তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার।

কিন্তু সে 'চকিত-অঞ্চলা'র 'তনুখানি'ই পরম রমণীয় হল; কামনার নিশ্বাস সে-তনুতে—

দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা।

তাই কবির আকুল কামনা সর্বাঙ্গে তাকে উপলব্ধি করা—

তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।

তার পর 'পূর্ণ মিলন' আনল 'শ্রান্তি'; 'দেহের সায়রে' 'বন্দী' কবিকে শেষে বলতে হল—

দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান,
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।*

অন্তিম কবিতা ‘পবিত্র প্রেম’-এ কবির ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যের আবিষ্কার-অভিযান চরম পরিণতি লাভ করল। ‘শ্রান্তি’ ও ‘মোহ’-ভঙ্গের পর পেলাম কবির দৃঢ় নির্দেশ—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া,
ম্লান করিও না আর মলিন পরশে,
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।

তৃতীয় পর্যায়ের বাইশটি কবিতার দ্রুত-বিকশিত উপলব্ধি কবিকে এই সত্যই জানিয়ে গেল যে সৌন্দর্যের অনন্ততৃষ্ণা নারীদেহের অতুল সৌন্দর্যেও মিটবে না। দেহের উপকূলে হৃদয়ের রহস্যসন্ধান একান্ত ব্যর্থ। প্রেমে ও সৌন্দর্যে আছে অমরাবতীর প্রসাদ; আছে ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস। তা বাসনার, কামনার ধন নয়।

কড়ি ও কোমলের চতুর্থ পর্যায়ে—‘পবিত্র জীবন’ থেকে ‘চিরদিন’ পর্যন্ত—কাব্য আবার ফিরে এল মানুষের মাঝে আত্মমুখী সৌন্দর্যকামনার নিষ্ফলতাকে উপলব্ধি করে। মানুষের সুখ-দুঃখের নিমন্ত্রণ কবির চিত্তকে আবার ব্যাকুল করে তুলেছে। ‘মরীচিকা’ কবিতায় এ নিষ্ফলতা এবং ব্যাকুলতা, দুটি সুরই ধ্বনিত—

কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুম-বনে স্বপন চয়ন।
দেখো ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,

* ‘পূর্ণ মিলন,’ ‘শ্রান্তি’, ‘বন্দী’, ‘মোহ’—কড়ি ও কোমলের পর পর চারটি সনেট।

হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

এ পর্যায়ের একাধিক সনেটে তীব্র ধিক্কারে ফুটে উঠেছে আত্ম-নিষ্ক্রিয়তায় অতৃপ্তি ; জীবন-বিমুখ কল্পলোকবিহারের গ্লানি ও ব্যর্থতা ; প্রকাণ্ড জীবনের মাঝে জেগে উঠবার দুর্বার বাসনা।

পরিশেষে, পঞ্চম ও শেষ পর্যায়ে দেখি কবি আত্মসংগ্রাম ও ধিক্কার কাটিয়ে উঠে, 'বঙ্গভূমি'র ও 'বঙ্গবাসী'র দুঃখ ও দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করছেন। বৃহৎ জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই জাগাল স্বদেশ-চেতনা। 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতায় সে-চেতনা নিরাশাচ্ছন্ন, কিছুটা ভাবালুতাময়—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুঃখ গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।

কিন্তু এ নৈরাশ্য এবং ভাবালুতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত পরের কবিতা 'আহ্বান-গীত'-এ। দৃপ্ত, বলিষ্ঠ সুরে উচ্চারিত হল কবির দেশবাসীর প্রতি আশা ও আলোকের বাণী—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কই রে বাঙালি কই।

এই দৃপ্ত বাণীই শুনব কবির উত্তরজীবনে বহু কবিতায় ও গানে। বস্তুত 'আহ্বানগীতে'রই উত্তরাধিকারসূত্রে পাব, 'মানসী'র 'দুরন্ত আশা' প্রভৃতি কবিতা ; 'চিত্রা'র 'নগরসঙ্গীত' ও 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা। 'আহ্বানগীত'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা যেখানে দেশের কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল, যেখানে দেশের দুঃখবেদনা প্রবল আবেগে কাব্যে উদ্ঘাটিত হল। স্বদেশের কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত জন্ম 'আহ্বানগীত'-এ।

কবিতাটিকে 'কড়ি ও কোমলে'র মূলতম প্রবর্তনার চরম প্রকাশ বলা যেতে পারে। মানুষের মুক্ত জীবনপ্রবাহে অবগাহন করাই এ-কাব্যের অন্তরতম আবেগ; 'প্রাণ' থেকে 'খেলা' পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে এই কামনাই স্তরে স্তরে নানা বাস্তবদৃষ্টির মাঝে বিকাশ লাভ করেছে, সেকথা পূর্বে আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্য মানসলোকে ফিরে গেল; ফিরে এল কবির সৌন্দর্য-তৃষ্ণা শোকচ্ছায়ার মধ্য দিয়ে। বাহিরে প্রসারিত বাস্তবদৃষ্টি মুছে গিয়ে কাব্যে পেলাম 'কমলাসনা'র মূর্তি; কবিকে ব্যাকুল করল তার রূপমাধুরী। তৃতীয় পর্যায়ে কবির সন্ধান শুরু হল অন্যপথে—দেহরূপের মাঝে খুঁজে ফিরলেন সৌন্দর্যের রহস্যকে। অচিরেই এল শ্রান্তি ও ব্যর্থতা। চতুর্থ পর্যায়ে আবার ফিরে এল মানুষের ডাক ও জাবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষারই পূর্ণ পরিণাম 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্নাট্যের অন্তিম পরিণতি 'আহ্বানগীত'।

'আহ্বানগীতে'র ঐতিহাসিক মূল্য গভীর। শুধু স্বদেশের-কবি রবীন্দ্রনাথই প্রথম জন্ম নিলেন না এ-কবিতায়। 'কড়ি ও কোমলে' যদি জন্ম নিয়ে থাকেন বাস্তবদৃষ্টিসমৃদ্ধ, জীবনধর্মী রবীন্দ্রনাথ, তবে 'আহ্বানগীতে' প্রথম দেখা গেল তাঁর নিঃশঙ্ক প্রকাশ। আরও গভীরে দেখলে বলতে হবে এ কবিতায় রবীন্দ্রমানসে প্রথম উপ্ত হল বিরোধ ও সংগ্রামের বীজ—যার বিচিত্র ক্রমোদ্ভিন্ন বিকাশ 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র অন্তর্মূলের ইতিহাস। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক; 'আহ্বান-গীতে'র বাসনা ও সঙ্কল্প হল—

মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস
শোনো শোনো সৈন্যগণ।

অথবা—

মানবের স্রোতে চলো গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী।
চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জন-কোলাহলে
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে,
অসীম আকাশতলে।

অথবা—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।

এই বাসনা ও সঙ্কল্পই প্রবলতর বেদনায় বারবার দেখা দেবে 'মানসী'তে, 'সোনার তরী'তে, 'চিত্রা'তে।

কবির বাল্যে, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মগ্ন-চৈতন্য থেকে ক্রমবিকশিত সৌন্দর্যচেতনার ইতিবৃত্ত আমরা দেখলাম। 'মানসী'-কাব্যে আসার পূর্বে তার সুস্পষ্ট পরিলেখ সামনে রাখা প্রয়োজন।

বাল্যে অসীম বিস্ময়বোধের সঙ্গে সহজ চেতনায় কবি অনুভব করেছিলেন 'বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর নানা মূর্তিতে সঙ্গদান'। বাল্যের সে চেতনা কৈশোরে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিল 'প্রভাতসঙ্গীত'-রচনাকালে। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার পর্দাগুলি সরে গিয়ে কবির চোখে ধরা দিল নিখিলের আনন্দময় সৌন্দর্যতরঙ্গ। জীবনের প্রত্যুষে যে-সৌন্দর্যচেতনার বীজ ছিল অবচেতনে, প্রভাতে তা আলোয় অঙ্কুরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল বিশ্বের রূপ-তরঙ্গ দুচোখ ভরে দেখার তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণা কাব্যে আনল বাস্তবাভিমুখী দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টি বিস্তীর্ণ হল 'ছবি ও গানে', মানবলোকে ও প্রকৃতিলোকে। কিন্তু অন্যদিকে 'ছবি ও গানে' দেখি, এক অনির্দিষ্ট সৌন্দর্যপুলক কবিকে আচ্ছন্ন করেছে। 'কামনা রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে' উষাময়ীর কল্পনায়, 'সুদূর-নন্দন-কানন-বাসিনী'র 'মধুর-হাসিনী' মূর্তিতে।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রকাব্য মানুষের হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াল; বিপুল জীবনস্রোতে নিমগ্ন হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল এ-কাব্যে। কিন্তু মধ্যপথে কাব্য ফিরে গেল মানসলোকে; বিরহ জাগল 'কার পথ চাহি'। সৌন্দর্যের স্বপ্নাবিষ্ট অনুভূতি অনবচ্ছিন্ন রইল 'বসন্ত-অবসান' থেকে 'গীতোচ্ছ্বাস' পর্যন্ত। তার পর 'কড়ি ও কোমলে'র তৃতীয় স্তরে কবির নূতন অভিযান শুরু হল—নারীর দেহলাবণ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের অন্তরমহিমা আবিষ্কার। শীঘ্রই কবির মোহভঙ্গ হল; 'পূর্ণমিলন' হল 'শ্রান্তি'কর। 'পবিত্র প্রেমে'র স্পর্শ নিয়ে কবি ফিরলেন মানবলোকে; আবার বাসনা

জাগল জীবনের কান্নাহাসির মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার। সে বাসনার পরিণাম আহ্বানগীত কবিতা।

সৌন্দর্যকল্পনার উৎসসন্ধানে মানসী-পূর্ব কাব্যপরিক্রমা সমাপ্ত হল। পরিশেষে 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ আলোচনা সাঙ্গ করে এ অধ্যায়ের যবনিকা টানা যাক।

নানা কারণে 'কড়ি ও কোমল' স্মরণ করায় কবি কীটস্‌কে। তাঁর প্রথম কাব্য Sleep and Poetryর কয়েকটি স্তবকে ও পরে তাঁর বন্ধু Reynoldsকে লেখা একটি চিঠিতে কবিমানসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র কবির গভীর সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া, কীট্‌সের চিন্তাধারাটাও রবীন্দ্রকাব্যে অনেকখানি প্রতিফলিত বলে সাদৃশ্যটা বিশেষ কৌতূহল জাগায়। Sleep and Poetry-কাব্যের মধ্যভাগে এক জায়গায় কীটস্‌ নিজের কাব্যের ক্রমোত্তীর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে অভিলাষ জানিয়েছেন—

First the realm I'll pass
Of Flora and old Pan : Sleep in the grass,
Feed upon apples red and strawberries,
And choose each pleasure that my fancy sees.

এবং পরে কুড়িটি লাইনে কবি বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির বহুবিচিত্র সৌন্দর্যকে (Flora and Old Pan) কী ভাবে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করবেন। কিন্তু কবি মনে জানেন সে-সব সৌন্দর্য তাঁর জীবন-বোধের সেতু মাত্র ; তাদের অতিক্রম করে তাঁকে আসতে হবে মানুষের হৃদয়লোকে, তার দুঃখক্লেশ ও সংগ্রামের মাঝে।

And can I ever bid these joys farewell ?
Yes, I must pass them for a nobler life,
Where I may find the agonies, the strife
Of human hearts.

কাব্যের কথাটি কীটস্‌ গদ্যে বলেছিলেন একটি চিঠিতে—

"Well, I compare human life to a Large Mansion of many Apartments, two of which I can only describe, the doors of the rest being as yet shut upon me. The first we step into we call the infant or thoughtless chamber, in which we remain as long as we do not think···At length

imperceptibly impelled by the awakening of the thinking principle within us—we no sooner get into the second chamber, which I shall call the chamber of Maiden-Thought, then we become intoxicated with the light and atmosphere, we see nothing but pleasant wonders, and think of delaying there for ever in delight. However, among the effects this breathing is father of is that tremendous one of sharpening one's vision into the heart and nature of Man—of convincing one's nerves that the world is full of Misery and Heartbreak, Pain, Sickness and Oppression whereby this chamber of Maiden-Thought becomes gradually darken'd…"

কবি কীট্‌সের এই স্তরনির্দেশের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসবিকাশ আশ্চর্য সাদৃশ্য বহন করে। 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'ছবি ও গানে'র কবি ছিলেন অনেকটা এই "realm of Flora"-তে অথবা কীটসের চিঠির 'দ্বিতীয় রম্যকক্ষে'—"Chamber of Maiden-Thought"-এ। এ-কক্ষে বহির্বিশ্বের রূপ-রস-স্পর্শ কবিকে আকুল করেছিল। কবির নিজেরই তো উক্তি রয়েছে—"আমার ছবি ও গান আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুন……। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম।……আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল।" কীট্‌সের উক্তি, "intoxicated with the light and atmosphere, we see nothing but pleasant wonders" 'ছবি ও গান' সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সদ্য-বিকশিত দৃষ্টি বিশ্বকে মাতাল হয়ে দেখেছে 'ছবি ও গানে'। কিন্তু তার পরেই কড়ি ও কোমলে দেখি তার প্রবল পরিণাম—

"That tremendous effect of sharpening one's vision into the heart and nature of Man.

কড়ি ও কোমলের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে এই 'sharpening of vision" গভীর স্বাক্ষর রেখেছে ; এই প্রবল প্রত্যয়ই জেগে উঠেছে, "The world is full of Misery and Heartbreak, Pain, Sickness and Oppression" বস্তুত, এই দুঃখ বেদনা ও ক্লেশের চেতনা কখনো বলিষ্ঠ রেখায় কখনো বা ভাবোচ্ছ্বাসে বার বার দেখা দিয়েছে সারা কাব্যে।

কিন্তু কীটসের সঙ্গে এক জায়গায় গভীর পার্থক্যও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। যদিও পরবর্তী কাব্য 'Endymion'-এ আদর্শ-প্রেম ও সৌন্দর্যমূর্তির স্বপ্নই হবে কাব্যের আখ্যান, তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতি প্রত্যুষকালেই যে-সৌন্দর্যতৃষ্ণা জেগেছে, কবি কীটসের জীবনে বা কাব্যে তার তুলনা মেলে না; কীটসের উদ্ধৃত চিঠি সে-অনন্ততৃষ্ণার জন্ত কোথাও কক্ষ রচনা করে নি।

এ তৃষ্ণার পূর্ণ-পরিণত রূপ এবার দেখব 'মানসী' কাব্যে। একদিকে তা উৎসৃষ্ট হবে মানসী-মূর্তি কল্পনায়; অন্যদিকে তা উদ্দীপিত করবে দুঃখ-বিপদসঙ্কুল বিরাট জীবনের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রকাব্য বিক্ষুব্ধ হবে কল্পলোকগামী এবং বাস্তবাভিমুখী দুই বিপুল প্রবর্তনার বিরোধে। সে ইতিহাস সামনে প্রসারিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসী

"He dreamed a veilèd maid
Sate near him, talking in low solemn tones.
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought ; its music long,
Like woven sounds of streams and breezes, held
His inmost sense suspended in its web
Of many colourid woof and shifting hues.

... ...

......................He eagerly pursues
Beyond the realms of dream that fleeting shade ;
He overleaps the bounds. Alas ! Alas !
Were limbs and breath and being intertwined
Thus treacherously ? Lost, lost, for ever lost
In the wide pathless desert of dim Sleep
That beautiful shape !"

Shelley : 'Alastor'.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসী

প্রদোষালোকে উদ্ভিন্নকোরকের মতো 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রথম উদ্‌ভাসিত রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপান্বেষণ তার প্রথম অধ্যায় রচনা করল এ-কাব্যে। সেখানে মানবলোকে মুক্তজীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মধ্যপথে স্তিমিত করে এ-ঘোষণাটি স্পষ্ট যে প্রেম ও সৌন্দর্যের রূপরহস্য রয়েছে দেহকে অতিক্রম করে; তার পরমপ্রসাদ ইন্দ্রিয়ের মোহাবেশ উত্তীর্ণ হয়ে। তাই 'দেহের সায়রে' প্রেমের ও সৌন্দর্যের ব্যর্থসন্ধান কবিকে কাব্যের শেষে আবার নিয়ে এল মানুষের জীবনপ্রবাহের সম্মুখে।

কিন্তু বৃহৎ জীবনের জন্য 'ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' 'কড়ি ও কোমলে'র পরেই অকস্মাৎ বিলুপ্ত হল। সে মহৎ প্রতিশ্রুতি অসম্পূর্ণ রেখে রবীন্দ্রকাব্য ফিরে গেল মানসলোকে, অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে। 'মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে বেদনায় প্রসারিত হাত এবার মানসসত্তার রহস্য উন্মোচনে উন্মুখ হল। 'মানসী' কাব্যে রচিত হল প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিন্তু 'মানসী' কাব্যে কবিচিত্তের অভিযান অন্য পথে—অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যকে মানবীয় প্রেমের মধ্যে, তার বহু-বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সন্ধানের পথে। 'কড়ি ও কোমল'-এ এ-সন্ধান ছিল মূলত ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে সীমিত। 'মানসী' কাব্যে তা আরও গভীর ও ব্যাপক হল; প্রবেশ করল গহন হৃদয়রাজ্যে; খুঁজে ফিরল 'আত্মার রহস্য-শিখা'। বাল্যে যে-'অর্ধপরিচিত প্রাণী' কবিকে নানা মূর্তিতে সঙ্গদান করল; প্রভাতসঙ্গীত-পর্বে যে চেতনা উদ্‌ভাসিত হল 'মহাসৌন্দর্যের তরঙ্গনৃত্যে'; কড়ি ও কোমলে যে-স্মৃতি জেগে উঠল অস্পষ্ট অনুভবে অজ্ঞাত 'আকাঙ্ক্ষা' হয়ে,—'মানসী' কাব্যে সে-চেতনা ও অনুভূতি ধীরে ধীরে কল্পনায় পরিস্ফুট হবে। 'মানসী' কাব্যের ইতিহাস হল—কী আর্তনন্দনের প্রেরণায়, কী নৈরাশ্য-বেদনার বন্ধুর পথে, কী দুঃখদাহনার পাবকবহ্নির

"He dreamed a veilèd maid
Sate near him, talking in low solemn tones.
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought ; its music long,
Like woven sounds of streams and breezes, held
His inmost sense suspended in its web
Of many colourid woof and shifting hues.

... ...

.....................He eagerly pursues
Beyond the realms of dream that fleeting shade ;
He overleaps the bounds. Alas ! Alas !
Were limbs and breath and being intertwined
Thus treacherously ? Lost, lost, for ever lost
In the wide pathless desert of dim Sleep
That beautiful shape !"

Shelley : 'Alastor'.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসী

প্রদোষালোকে উদ্ভিন্নকোরকের মতো 'কড়ি ও কোমল'-এ প্রথম উদ্‌ভাসিত রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপান্বেষণ তার প্রথম অধ্যায় রচনা করল এ-কাব্যে। সেখানে মানবলোকে মুক্তজীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মধ্যপথে স্তিমিত করে এ-ঘোষণাটি স্পষ্ট যে প্রেম ও সৌন্দর্যের রূপরহস্য রয়েছে দেহকে অতিক্রম করে; তার পরমপ্রসাদ ইন্দ্রিয়ের মোহাবেশ উত্তীর্ণ হয়ে। তাই 'দেহের সায়রে' প্রেমের ও সৌন্দর্যের ব্যর্থসন্ধান কবিকে কাব্যের শেষে আবার নিয়ে এল মানুষের জীবনপ্রবাহের সম্মুখে।

কিন্তু বৃহৎ জীবনের জন্য 'ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' 'কড়ি ও কোমলে'র পরেই অকস্মাৎ বিলুপ্ত হল। সে মহৎ প্রতিশ্রুতি অসম্পূর্ণ রেখে রবীন্দ্রকাব্য ফিরে গেল মানসলোকে, অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে। 'মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে বেদনায় প্রসারিত হাত এবার মানসসত্তার রহস্য উন্মোচনে উন্মুখ হল। 'মানসী' কাব্যে রচিত হল প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিন্তু 'মানসী' কাব্যে কবিচিত্তের অভিযান অন্য পথে—অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যকে মানবীয় প্রেমের মধ্যে, তার বহু-বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সন্ধানের পথে। 'কড়ি ও কোমল'-এ এ-সন্ধান ছিল মূলত ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে সীমিত। 'মানসী' কাব্যে তা আরও গভীর ও ব্যাপক হল; প্রবেশ করল গহন হৃদয়রাজ্যে; খুঁজে ফিরল 'আত্মার রহস্য-শিখা'। বাল্যে যে-'অর্ধপরিচিত প্রাণী' কবিকে নানা মূর্তিতে সঙ্গদান করল; প্রভাতসঙ্গীত-পর্বে যে চেতনা উদ্‌ভাসিত হল 'মহাসৌন্দর্যের তরঙ্গনৃত্যে'; কড়ি ও কোমলে যে-স্মৃতি জেগে উঠল অস্পষ্ট অনুভবে অজ্ঞাত 'আকাঙ্ক্ষা' হয়ে,—'মানসী' কাব্যে সে-চেতনা ও অনুভূতি ধীরে ধীরে কল্পনায় পরিস্ফুট হবে। 'মানসী' কাব্যের ইতিহাস হল—কী আর্তসন্ধানের প্রেরণায়, কী নৈরাশ্য-বেদনার বন্ধুর পথে, কী দুঃখসাধনায় পারকল্পিত

মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা 'মানসী'র রূপ নেবে। বহু-অভিজ্ঞতা-বিক্ষুব্ধ নানান্তরবিন্যস্ত, 'মর্মের কামনার বিমূর্ত কল্পনা' এ-কাব্যের অন্তরতম ইতিহাস। সে-ইতিহাসের বহুধা-প্রসারিত পথরেখা রয়েছে সমগ্র 'মানসী' কাব্যে।

সে-পথরেখা স্থানে স্থানে কুটিল ও দুর্বোধ্য। যে দুর্গম পথে পদচিহ্ন রেখে কবিমানস এগিয়ে গেছে এ কাব্যে তার পূর্ণ অনুস্মৃতি সহজ নয়। সে পদরেখা কখনো গেছে অভাবনীয় পথে, কখনো বাঁক নিয়েছে অচিন্তনীয়ভাবে। বস্তুত 'মানসী'র কয়েকটি কবিতার প্রকৃত অর্থ ও ইঙ্গিত আজও ঠিক বুঝেছি কিনা জানি না। বোঝা সহজ নয়। কারণ যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে মানসীর কিছু প্রেমের কবিতার অন্তরালে, তাদের উৎস আজও, যতদূর জানি, অনাবিষ্কৃত। 'মানসী'র উদ্দিষ্ট নারী কে বা কারা, এ প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর আজও রবীন্দ্রকাব্যপাঠক পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

এ-প্রশ্নরহস্যের ত্রিবিধ উত্তর হতে পারে। প্রথম, উদ্দিষ্ট নারী ব্যক্তি-বিশেষ কেউই নয়, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সুতরাং যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন এ-সব কবিতায় তারা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। দ্বিতীয়, উদ্দিষ্ট নারী কবির বাল্যসহচরী, তাঁর কাব্য-জীবনের প্রেরণাদাত্রী, পরমারাধ্যা 'নতুন বৌঠান', কাদম্বরী দেবী। এ-অনুমানের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে' দেখেছি এই মহীয়সী নারীর মৃত্যুর সুগভীর রেখাপাত ঘটেছে ; দেখেছি কী ভাবে তাঁর শোকবিরহের মধ্য দিয়ে কাব্যে জেগেছে সৌন্দর্যচেতনা। 'মানসী'র প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় তাঁর বিরহস্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। তৃতীয়, অভীষ্ট নারী কবির আবাল্য-অনুস্যূত সত্তা, তাঁর সমস্ত কামনা ও সাধনার ধন, 'মানসী'। যৌবনের স্বপ্নসিন্ধু-উন্মথিত কল্পনায় জেগেছে সৌন্দর্যের ধ্যানমূর্তি ; সে-মূর্তি এ-কাব্যে সুস্পষ্ট নয়, তবু তার রূপ-কল্পনায় কবিমানস আবিষ্ট হবে। মানসীকাব্যে মূলতম প্রয়াস হবে বাস্তব প্রেমে ও মানবী প্রিয়ার মাঝে সে কল্পমূর্তির আর্ত-অন্বেষণ ; তার ব্যর্থতায় বেদনা ও নৈরাশ্য, সংশয় ও শ্রান্তি।

সন্দেহ নেই যে তৃতীয় উত্তর সর্বাধিক গ্রাহ্য। তথাপি সত্য রয়েছে এই তিনটি উত্তরের সম্মিলনে। সৌন্দর্য-মূর্তির সন্ধানের পথে কখনো এসেছে কাল্পনিক প্রিয়া, কখনো মিশেছে ব্যক্তিজীবনের প্রেমানুভূতি—সে-নারী যে-ই

হোক না কেন। শান্তিনিকেতনে 'মানসী' অধ্যাপনাকালে কথিত কবির 'মানসীকাব্যপাঠের ভূমিকা' আমাদের মূল প্রশ্নের উপর কোন আলোকপাত করে না। কিন্তু কবির একটি উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "কবি তাঁর কাব্যে রচনায় জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডির থেকে পার করে নিয়ে চিরন্তনের সুরে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।" ('মানসীকাব্য-পাঠের ভূমিকা', 'প্রবাসী', ১৩৪৭ আশ্বিন।) 'মানসীকাব্যের বহু কবিতায় এই চিরন্তনের সুরই বেদনায় নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'মানসী'কাব্যের অন্তরতম চিত্রটি পেতে হলে ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টিতে কাব্যের কালানুক্রমিক পাঠ একান্ত প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে 'মানসী'তেই প্রথম রচনাকালের নির্দেশ পাই; তা এ-কাব্যের পুনর্বিচারে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। কেন জানি না, 'মানসী'র কবিতা 'রচনাবলী'তেও অবিন্যস্ত; তার ফলে 'মানসী'র পূর্ণ ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত, তার মর্মোদ্ঘাটন আজও অসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রচনার তারিখ লক্ষ্য করে কবিমানসের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে এ-কাব্যের অন্তররহস্য-পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। পূর্বে বলা হয়েছে, শ্রেষ্ঠ কাব্য অগ্রস্থত কবিমানসের নানা পদচিহ্ন নিভৃতে বহন করে। সমালোচকের অন্যতম কর্তব্য সেই বহু-বিচিত্র পদাঙ্করেখা সযত্নে অনুসরণ করে কবিমানসের ক্রমবিবর্তিত অন্তরাখ্যানকে আলোকে ফুটিয়া তোলা। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট, গভীর ও সুস্পষ্ট, সরল ও বক্র—নানা পদরেখার অনুধাবন রহস্যসন্ধানীকে নিয়ে যায় কবির অন্তরতম মানসে। সেখানে ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টি অপরিহার্য।

॥ ১ ॥

মানসীকাব্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে কালানুক্রমে পাই পনেরোটি কবিতা—'ভুলে' (বৈশাখ ১৮৮৭), 'ভুলভাঙা' (বৈশাখ ১৮৮৭), 'বিরহানন্দ' (জ্যৈষ্ঠ), 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' (আষাঢ়), 'সিন্ধুতরঙ্গ' (আষাঢ়), 'শ্রাবণের পত্র' (শ্রাবণ), 'নিষ্ফল কামনা'

(১৩ অগ্রহায়ণ), 'বিচ্ছেদের শান্তি' (১৪ অগ্রহায়ণ), 'সংশয়ের আবেগ' (১৫ অগ্রহায়ণ), 'তবু' (১৫ অগ্রহায়ণ), 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন', 'নিভৃত আশ্রম' (১৮ অগ্রহায়ণ), 'নারীর উক্তি' (২১ অগ্রহায়ণ), 'পুরুষের উক্তি' (২৩ অগ্রহায়ণ)।

প্রথম পর্বের এই কবিতাগুচ্ছের অন্তরের কথাটি হল মানবীয় প্রেমের অসম্পূর্ণতা, তার রিক্ততা, তৃপ্তিহীনতা। অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা নিয়ে কবি কল্পলোকের আদর্শকে খুঁজছেন বাস্তব প্রেমের মধ্যে। এ-সন্ধানের ম্লান ক্ষুধাতুর রূপটি ফুটে উঠেছে প্রথম তিনটি কবিতায়। প্রেমের ক্ষণিকতা, তার স্বপ্নাবেশের ক্ষণভঙ্গুরতা সুস্পষ্ট হয়েছে দ্বিতীয় কবিতা 'ভুল-ভাঙা'য়—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

এ-প্রসঙ্গে কীট্‌স্‌ ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সূত্রটা আবার উত্থাপিত করা যেতে পারে। নানাদিক থেকে দুই কবির মননসাদৃশ্য কৌতূহল জাগায়। পূর্বে দেখেছি, প্রথম যৌবনে কীট্‌সের মতো রবীন্দ্রনাথেরও বাসনা ছিল—

"...............for a nobler life
Where I may find the agonies, the strife of human hearts."

কিন্তু দুই কবিই লক্ষচ্যুত হয়ে অন্যপথ অনুসরণ করলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতির রূপমাধুর্য কীট্‌সের মনে প্রশ্ন জাগাল সৌন্দর্যের শাশ্বত রূপ রয়েছে কোন অমৃতলোকে। কীট্‌সের অনুভূতির সঙ্গে তাই এ-পর্বের কবিতার সন্ধান ও উপলব্ধির সাদৃশ্য গভীর। 'ভুল-ভাঙা' কবিতার অনুভূতিই সংহত রূপ নিয়েছে কীট্‌সের 'Ode to Nightingale'এ—

"Where beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow."

এবং তাঁর 'Grecian Urn' কবিতায়—

"All breathing human possions far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd,
A burning forehead and a parching tongue."

যে অনুভূতি কীট্‌সের কাব্যে অসামান্য সংহত রূপ পেয়েছে, 'মানসী'র প্রথম কয়েকটি কবিতায় সেই অনুভূতির কিছুটা তরল প্রকাশ। উভয় কবিরই অনুসন্ধান ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের মৃত্যুহীন, শাশ্বত রূপ। কীট্‌স্ তা খুঁজেছিলেন—এবং পেয়েছিলেন—কল্পলোকে এবং শিল্পলোকে। রবীন্দ্রনাথ তা খুঁজে ফিরছেন মানবীয় প্রেমের মধ্যে। সে-সন্ধানের পরিণামের ইতিহাসই মানসীকাব্যের ইতিহাস।

'ভুল-ভাঙা'য় যেমন প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের রিক্ততা, 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য় (আষাঢ় ১৮৮৭) তেমনি ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে কল্পনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপ। তাদের দিব্য অনুভূতি কবিতাটির স্তবকে স্তবকে প্রচ্ছন্ন। বাস্তব প্রেমের দৈন্য ও তৃপ্তিহীনতা যেমন মর্মান্তিক সত্য, তেমনি সত্য অন্য দিকের এ-অনুভূতি—

আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা ?

'মানসী'তে এই প্রথম পেলাম 'মর্মের কামনা'র আভাস। তার বর্ণাভা দিব্যলোকের, কিন্তু তার মূর্তিরূপ এখনো অপরিস্ফুট। তবু লক্ষণীয়, কবিকল্পনায় তাঁর অন্তরতম কামনা কী ধ্যান-ধারণার মধ্যে রূপ নিচ্ছে, কী আকুতি জাগিয়েছে। পুনরুক্তি করা প্রয়োজন, 'মানসী'র বেদনামর প্রয়াস হবে এ-ধ্যানকল্পনার উপলব্ধি।

চার মাস পরে দার্জিলিং থেকে ফিরে কবি লিখলেন 'নিষ্ফল কামনা'— পূর্ব কবিতার বিষণ্ণ, নৈরাশ্যময় প্রত্যুত্তর—

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

কবির অনুভূতি এ-কবিতায় ক্ষণিক পরিণতি লাভ করছে। কবির 'দুরন্ত বাসনা' প্রিয়ার আত্মার রহস্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা চরিতার্থ করা। সে-তৃষ্ণার অমৃত লুকিয়ে আছে মানবীর আত্মার রহস্য-শিখার মাঝে; কবির ক্ষুধার্ত নয়ন কল্পলোকের মূর্তিকে খুঁজে ফিরছে সে-রহস্যের অন্তরে। অনুভূতির তীব্রতায়, আবেগের সৌকুমার্যে রচিত হল মানসীকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি স্তবক—

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির-তলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

আত্মার রহস্য 'স্বর্গের আলোকময় অসীম রহস্যে'র ইঙ্গিত এনেছে কবির অন্তরে; কবি জেনেছেন অনন্ত প্রেমের ও সৌন্দর্যের রহস্য সেখানে সুপ্ত। কিন্তু তা সুদুর্লভ, অনধিগম্য। তাই,

বৃথা এ ক্রন্দন,
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।

প্রেমে ও প্রিয়ার অন্তরে 'মানসী'কে খুঁজে পাবার বাসনা ব্যর্থ হল।

'নিষ্ফল বাসনা'র পর দুইদিনের মধ্যে পেলাম তিনটি কবিতা 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'সংশয়ের আবেদন' এবং 'তবু' (১৪ ও ১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭)।

প্রেমের ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা বিচ্ছেদশান্তির সঙ্কল্প আনল। কিন্তু সংশয়ক্লিষ্ট কবি প্রেমকে বিদায় দিতে বেদনাবোধ করছেন। প্রথম কবিতায় প্রেমের স্বপ্নজাল ছিন্ন করে 'নূতন আশ্রয়-ঠাঁই' খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল; যেমন প্রবল পরের দুটি কবিতায় প্রেমের মায়ামন্ত্র। বোধে রয়েছে বিচ্ছেদের পর শান্তির আশা,

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,
নূতন আশ্রয়ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই,
সেই ভালো তবে তুমি যাও। (বিচ্ছেদের শান্তি)

কিন্তু গহন অন্তরে বেদনায় জেগে রয়েছে 'তবু'—

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তার পর তিনদিন পরে রচিত হল একই দিনে (১৮ অগ্রহায়ণ), তিনটি সনেট—'নিষ্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়েব ধন', 'নিভৃত আশ্রম'। প্রেমজাল হতে মুক্তির কামনা এবার দৃঢ়-উচ্চারিত হল এই তিনটি সনেটে। বিশেষ লক্ষণীয়, কি-ভাবে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার আবেগক্ষুব্ধ উপলব্ধি 'নিষ্ফল প্রয়াস'এর সংহত, অনুভূতিতে পৌঁছেছে। সঙ্কল্পকে যেন সনেটের বাঁধনে দৃঢ়সম্বদ্ধ করে তুলছেন কবি। কবির উক্তি তাই সংযত, সংক্ষিপ্ত—

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

'হৃদয়ের ধন' ক।বতায় দেখি এই সাময়িক দ্বন্দ্বাবসানের নিঃশঙ্ক প্রকাশ—

নাই, নাই,—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।

অনুভূতির শঙ্কাহীন প্রকাশ সত্ত্বেও এ-দুটি কবিতায় বেদনার ছায়া প্রচ্ছন্ন; কিন্তু 'নিভৃত আশ্রম'-এ সে-বেদনার ছায়াটুকুও সরে গেছে; আবেগ-সংশয় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। এক অচঞ্চল বাসনা কবির অন্তরে জেগে উঠেছে, যেন পরিশ্রান্ত কবি এবার একটি অন্তরতম উপলব্ধিকে প্রশান্তমনে হৃদয়ে গ্রহণ করার প্রয়াস করেছেন। কামনা-শ্বাসতপ্ত মানবীপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে কবি

সন্ধান করেছেন 'নিভৃত আশ্রয়'; 'হৃদয়-আসনে' স্থাপনা করেছেন 'অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী মুরতি'—

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে,
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী মুরতি
স্থাপন করিব যত্নে হৃদয়-আসনে
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।

'নিভৃত আশ্রমে' প্রথম পর্বের সন্ধান একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল; কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। শীঘ্রই দেখব, প্রবলতর ঝঞ্ঝা চিত্তদিগন্ত আচ্ছন্ন করে কালিমা আঁকবে, 'প্রেমের প্রদীপ' নিভাবে, 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি' কল্পনাকে নিষ্প্রভ করবে। তার ইতিবৃত্ত রয়েছে 'মানসী'র দ্বিতীয় পর্বে।

তবু এ-পর্বে দ্বন্দ্ববিরোধের ক্ষণিক সমাপ্তি ঘটল। তার পরোক্ষ প্রমাণ বহন করছে পরের দুটি কবিতা—'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি'। 'ভুলে' কবিতা থেকে 'নিভৃত আশ্রম' পর্যন্ত মানসীকাব্য ছিল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক, সংশয়াকুল বেদনায় রঙীন। 'নিভৃত আশ্রমে' বিফল প্রয়াসের সাময়িক অবসান হল; নিরুদ্ধ অন্তর্জগৎ থেকে দৃষ্টি হল অবমুক্ত; রচিত হল 'মানসী'র প্রথম দুটি নৈর্ব্যক্তিক কবিতা—'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি'। কল্পনার বিষয় হল ব্যর্থপ্রেম নারী, যে-নারী একদিন প্রেমের মাল্যভূষণে ধন্য হয়েছিল; যে আজ প্রেমের দলিত, শুষ্ক ফুলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে। কল্পনার বিষয় হল ভ্রান্তপ্রেম পুরুষ—যে-পুরুষ প্রথম যৌবনে প্রেমের অমরাবতীকে দুটি হাতে পেয়েছিল; যে আজ নিষ্ফল বাসনায় ভ্রান্ত প্রেমের সমাধি দেখেছে—

নিরখি কোলের কাছে, হৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

সন্দেহ নেই যে এ-দুটি কবিতাও এ-পর্বের মূল সুর ও সন্ধানের অনুধর্মী; মানবীয় প্রেমের রিক্ততা, শূন্যতা, তৃপ্তিহীনতা এ-দুটি কবিতারও বিষয়বস্তু। কাব্যের ভাবনা অপরিবর্তিত, কিন্তু কাব্যের আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত,—লিরিকের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বহিঃকেন্দ্রিক নাটকীয় ভঙ্গিতে। এ-পরিবর্তনের মূলে আছে 'নিভৃত আশ্রম' কবিতার সংশয়মুক্ত অনুভূতি।

'পুরুষের উক্তি' কবিতাটি আরও একটি গভীর কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে কবিতাটির গুরুত্বও অসামান্য। এ-কবিতায়—এ-পর্বের

শেষ কবিতায়—কাল্পনিক পুরুষের মুখে শুনি কবির অন্তরতম মানস ইতিহাস, শুনি তাঁর প্রথম যৌবনে প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনার আবির্ভাব-কাহিনী ; শুনি, তার অলোকসুন্দর মানসপ্রতিমা সৃষ্টি ; শুনি মানবীয় প্রেম ও প্রিয়ার মাঝে সে-মানসপ্রতিমা অন্বেষণের শ্রান্ত, ব্যর্থ প্রয়াস। 'কড়ি ও কোমল' থেকে কবির নিভৃত মানসের ইতিহাস স্তবকে স্তবকে ধরা পড়েছে 'পুরুষের উক্তি' কবিতায়। কাব্যে, নাটকীয় ভঙ্গিতে, কবির এই প্রথম আত্মজীবনী ; প্রথমেই পাই প্রেম ও সৌন্দর্যের দিব্যকল্পনা—

চন্দ্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর।
সুগভীর কলধ্বনিময়
এ-বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

তার পর উপমার ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হল কবির ব্যাকুল অন্বেষণের ইতিহাস—

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায় ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ।
তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

অতৃপ্ত বাসনা ক্রমে আনল শ্রান্তি ;-মনে হল 'সব ফাঁকি'। এ-ব্যর্থ সন্ধানের রূঢ় সত্যকে কবি উপলব্ধি করলেন—'নিষ্ফল কামনা' ও 'নিষ্ফল প্রয়াস'-এর রূঢ় উপলব্ধি। কবি বুঝলেন অমর্তসত্তাকে প্রেমকায়ায় ধরা যাবে না ; প্রেমে নয়, প্রেমিকার হৃদয়েও নয়—

"স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে

এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।'

মানসীর প্রথম পর্যায়ের যে মানসবৃত্তান্ত আমরা দেখেছি, শেষের এই স্তবকে তারই সংহত, সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে।

পুরুষের উক্তির শেষভাগে 'নিভৃত আশ্রম'-এর প্রশান্ত কামনাই পুনরুক্ত হল। মানস-মূর্তি ও বাস্তব প্রেমের মধ্যে ব্যবধান যখন দুস্তর হয়ে দেখা দিল তখন 'হৃদয়-আসনে' জেগে রইল শুধু মানসীর কল্পমূর্তি—

সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দ-মুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি কবিতার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ প্রয়োজন। 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রথম পর্বের পঞ্চম কবিতা, রচনাকাল আষাঢ় ১৮৮৭, —'পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে' রচিত। 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রথম পর্যায়ের আত্মমুখ কবিতাগুলির ভাবোচ্ছ্বাস থেকে প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন ; তার ভাবকল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি, দুঃখ ও পাপের চেতনা 'ছবি ও গান' থেকে কাব্যে একাধিকবার দেখা দিয়েছে ; কিন্তু এত প্রখর জীবনবিরুদ্ধ দৃষ্টি এর পূর্বে পাই নি। 'ছবি ও গানে'র 'আর্তস্বর' ও 'নিশীথজগৎ'-এ অন্ধ, নির্মম প্রকৃতির রহস্যময় রূপ দেখেছি ; 'সিন্ধুতরঙ্গ'-এ সে-রূপের নির্মমতর প্রকাশ ঘটল ; উন্মত্ত, নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতির প্রতীক হয়ে দেখা দিল 'অট্টরোলে, অট্টহাসে, উন্মাদ গর্জনে' বিরাট সিন্ধু। প্রকৃতির হিংস্র, পৈশাচিকতা বলিষ্ঠ কল্পনায় কাব্যে ফুটে উঠল—

নাই সুর নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ ?

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
'দাও, দাও, দাও !'
সিন্ধু ফেনোচ্ছলছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে
'দাও, দাও, দাও' !

বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোঁসে
নীলমৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।

আবেগ ও কল্পনার সংযত প্রকাশ, সংহত ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রকাব্যে এখনো দুর্লভ। তবু তাদের অগ্ন্যুদ্গার প্রবল শক্তিরই পরিচায়ক। রোম্যান্টিক কল্পনার স্বাধর্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখে 'সিন্ধুতরঙ্গ' এ-পর্বের কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হবে।

কবিতার শেষভাগে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে—

এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।

মানবীয় প্রেমের অন্তরে যেমন অনন্তপ্রেমকে খুঁজে পেলেন না কবি, প্রকৃতির অন্তরে তেমনি খুঁজে পেলেন না মানুষের মনে 'ব্যথাভরা' প্রেমের অস্তিত্বের সঙ্গত কারণ। আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য সত্ত্বেও প্রথম পর্বের মূলসন্ধানের সঙ্গে 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতার একটা গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে।

তথাপি 'সিন্ধুতরঙ্গ' জীবনবোধের ও প্রকৃতি-কল্পনার দিক থেকে দ্বিতীয় পর্বেরই সমধর্মী; এর ভাব ও কল্পনার প্রবণতা পরের পর্যায়ের 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতার অভিমুখে। 'সিন্ধুতরঙ্গ' দ্বিতীয় পর্বের কালিমালিপ্ত জীবনদৃষ্টির যোগ্য ভূমিকা।

॥ ২ ॥

মানসীকাব্যের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল পশ্চিমের একটি শহরে—গাজিপুরে। এ-পর্বে পাই মোট বারোটি কবিতা, একপক্ষকালের মধ্যে রচিত। তাদের কালানুক্রমিক সূচী প্রয়োজন হবে—'শূন্যগৃহে' (১১ বৈশাখ, ১৮৮৮), 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' (১৩ বৈশাখ), 'জীবনমধ্যাহ্ন' (১৪ বৈশাখ), 'প্রকৃতির প্রতি' (১৫ বৈশাখ), 'শ্রান্তি' (১৬ বৈশাখ), 'মরণস্বপ্ন' (১৭ বৈশাখ), 'বিচ্ছেদ' (১৯ বৈশাখ), 'আকাঙ্ক্ষা' (২০ বৈশাখ), 'একাল ও সেকাল' (২১ বৈশাখ),

'মানসিক অভিসার, (২১ বৈশাখ), 'কুহুধ্বনি' (২২ বৈশাখ), 'পত্রের প্রত্যাশা' (২৩ বৈশাখ)।

কাব্যের দিক থেকে কবির গাজিপুরবাস ফলপ্রসূ হবে: 'মানসী'র অধিকাংশ কবিতাই এখানে রচিত। গাজিপুর আসা সম্পর্কে কবির কৈফিয়ৎ কৌতুক জাগায়—

"বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।......অনেকদিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে।......শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।" * বাসগৃহের পরিবেশের বর্ণনা করে কবি বলেছেন, "এখানকার একখানা বড় বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে; সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত। দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকা চলেছে মন্থর গতিতে।......গোলাপ-চাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়।......এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটি নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।" †

বিস্ময় লাগে ভাবতে, এ গোলাপ খেতের দেশে, দিগন্ত-প্রসারিত অবকাশ, নিরবচ্ছিন্ন অবসর ও শান্ত রমণীয় পরিবেশে যে 'নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল', তার প্রারম্ভে না আছে এ-রমণীয়তার প্রশান্তি, না আছে 'বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শ'। এ-পরিবেশে সৃষ্ট কাব্যের প্রারম্ভে রয়েছে কামনাসংক্ষুব্ধ কবির নীরন্ধ্র হতাশা; অন্ধ, নিষ্ঠুর সৃষ্টির কঠোর চিত্রণ; 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতার হত'দর্প', হৃত'বিশ্বাস' কবির আত্ম-স্বীকৃতি এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতির কাছে ক্লান্ত আত্মসমর্পণ; এ-পর্বের মধ্যভাগে রয়েছে-অবসন্ন 'শ্রান্ত জীবন' 'নিদ্রালস আঁখিসম' মুদিত করার বাসনা; রয়েছে তুষার-কঠিন মৃত্যুহীন' অন্ধকারের মাঝে 'নতশির বিশ্বব্যাপী নিশার মৃত্যু'পল-গণনার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। গাজিপুরের গোলাপখেতের রঙীন স্বপ্ন এ-পর্বের কোন কবিতায় কোথাও তার চিহ্নমাত্র রাখল না। বস্তুত, গাজিপুরের

* 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৯৫।

† 'রবীন্দ্ররচনাবলী': দ্বিতীয় খণ্ড, মানসীর ভূমিকা।

শান্তমধুর পরিবেশে সপ্তাহকাল ধরে (১১ বৈশাখ থেকে ১৭ বৈশাখ, 'শূন্যগৃহে' থেকে 'মরণস্বপ্ন' পর্যন্ত) যে-অগ্নিগর্ভ কাব্যসৃষ্টি ঘটেছিল, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে, কী জীবনবোধে, কী প্রকৃতিকল্পনায়, তার তুলনা বিরল। কালিমালিপ্ত এ-বোধ ও দৃষ্টি যেমন অকারণ ও আকস্মিক, তেমনি তা কবির মনোধর্ম-বিরোধী। জীবনের কোন্ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার রূঢ় সংঘাত, কল্পনার কোন্ কালগহ্বর এ-বোধ ও দৃষ্টির উৎসস্থল সমালোচককে তা আজও হয়তো কুতূহলী করবে। হয়তো এর উৎস লুকিয়ে আছে কবিজীবনের কোনো অনাবিষ্কৃত ভূমিগর্ভে।

এ-সম্পর্কে স্বর্গীয় অজিতকুমারের উক্তি স্মরণীয়—

"মানসীর অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরে লেখা।.........কিন্তু সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি অনুভব করিলেন যে সৌন্দর্যের কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের তৃপ্তি নাই। কর্মহীন জীবনের একটা অবসাদ তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।" *

'কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের অতৃপ্তি', কর্মহীন জীবনের অবসাদ—দুটোই গভীর সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-'অতৃপ্তি' ও 'অবসাদ' কি 'মানসী'কাব্যের গোড়া থেকেই শুরু হয় নি? তা ছাড়া, এ-পর্বের উৎকণ্ঠ বিরহ, কঠোর প্রকৃতিচেনা—'চিত্তের অতৃপ্তি' ও 'জীবনের অবসাদ'ই তাদের একমাত্র উৎস? মন সায় দেয় না। সুতরাং এ-অনুমান অসঙ্গত হবে না যে এ-পর্বের নীরন্ধ্র হতাশা ও বেদনার উৎস আরও গভীরে।

তবু এ-পর্বের প্রথম কয়টি কবিতার সতর্ক অনুধাবন এ-জীবনবোধের সঙ্গত কারণের কিছুটা আভাস দেবে। প্রথম কবিতা 'শূন্য গৃহে'র প্রথম স্তবকেই প্রিয়জনের বিরহ একান্ত হয়ে উঠেছে—

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন।
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন।

কবিতার শেষভাগে এই বিরহের উল্লেখ আরও সুস্পষ্ট—

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য একি নাথ?

* রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ ৩০।

... ...

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।

এ-বিরহ কাল্পনিক নয়; কোন বিশেষ প্রিয়ব্যক্তির উল্লেখই এ-কবিতায় ঘটেছে একাধিকবার। প্রশ্ন ওঠে—কে এ প্রিয়জন? রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে আছেন সপরিবারে। সুতরাং এ-অনুমান অসঙ্গত নয় যে এ-বিরহের উৎস চার বছর পূর্বে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু। এ-পর্যায়ের পরের কবিতাগুলির নানা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এ-অনুমানেরই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং এ-কথা মেনে নেওয়া যাক্ যে 'চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়' কবিজীবনে যে 'অতলস্পর্শ অন্ধকার' উন্মুক্ত করেছিল, মানসীর রচনাকালে গাজিপুরে সে অন্ধকার গহ্বর অবারিত হয়েছিল যে-কোন কারণেই হোক।

সে 'অতলস্পর্শ অন্ধকার' কবির জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করল; তা প্রতি-ফলিত হল প্রকৃতির অন্তরে। 'শূন্যগৃহে'র দু'দিন পরে রচিত 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায় দেখি প্রকৃতিলোকেও কালিমা ঘনিয়ে এসেছে; দৃষ্টি ও জীবনবোধ বিষাক্ত। 'শূন্যগৃহে'র স্নেহপ্রেম-রিক্ততার কল্পনা বন্যার মতো প্লাবিত হল এ-কবিতায়। সংহত আবেগ ও কল্পনা কবিতাটিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রগাঢ়তা এনেছে। 'সিন্ধুতরঙ্গে'র পর প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের চিত্র 'মানসী'তে আবার পাওয়া গেল, কিন্তু কল্পনা ও অনুভূতি এবার অনেকটা সংযত—

মনে হয় যেন ওই অবারিত শূন্যতল পথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক;
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্যচন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষ কোটি লোক।
সৃষ্টি-স্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কে বা কার,
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করিছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

যে-কবির পরবর্তী জীবনের অন্যতম ধ্যানকল্পনা হবে সৃষ্টির আনন্দ ও কল্যাণ-রূপ তাঁর কাব্যে এ-অনুভূতি বৈশিষ্ট্যময়; তা কবির প্রকৃতিদর্শনকে এক-দেশদর্শিতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করবে, সমগ্রতার ইঙ্গিত দেবে। এ-অভিযোগ রয়েছে ওয়র্ডস্বর্থের প্রকৃতিকাব্যের বিরুদ্ধে—প্রকৃতির করাল-দংষ্ট্রা সংহারমূর্তি তিনি দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন—কাব্যজীবনের প্রারম্ভেই—'ছবি ও গান'-এ, পরে 'মানসী'তে। বস্তুত, প্রকৃতির নির্মমতম রূপকল্পনা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যেরই বিশিষ্টতা; এক অন্ধসৃষ্টির উন্মত্ত প্রবাহ কবিকল্পনায় বার বার দেখা দিয়েছে। তবু স্বীকার করা প্রয়োজন যে এ-দৃষ্টির অন্তরালে নেই সেই গভীরমননজাত জীবনবোধ, যার প্রখর দৃষ্টান্ত টমাস্ হার্ডির কাব্য। এ-দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন বেদনা ও বিক্ষোভ, যার সূচনা দেখেছি 'শূন্যগৃহে'তে। তাই সৃষ্টিতাণ্ডবের উত্তুঙ্গ কল্পনা শেষে বিলীন হল ব্যক্তিগত বিলাপে—

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কেন নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তোরে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

দ্বিতীয় পর্বে একটি সত্য বোধ হয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'নিভৃত আশ্রম' কবিতার প্রশান্ত প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে; 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতি'র নিভৃত উপাসনার বাসনা দ্বিতীয় পর্বে এসে বিলীন হয়েছে। অন্তর্বিক্ষোভ থেকে মুক্তির কামনা বারবার কাব্যে জেগে উঠবে, বারবার ব্যাহত হবে। সে-কামনা 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' রচনার পরদিনই আশ্রয় নিচ্ছে—কবিচিত্তের এমনি দুর্জ্ঞেয় রহস্য-প্রকৃতিরই বুকে। নিরুদ্ধ মনের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত হবে; সে-মন প্রেম ও সৌন্দর্যের বাসনাবহ্নি থেকে মুক্তি পাবে না; ক্ষণিক সান্ত্বনা পাবে।

মনের সে বাতায়ন প্রসারিত হল 'জীবনমধ্যাহ্ন'-এ, নিষ্ঠুর সৃষ্টির পরদিনই রচিত কবিতা। বিরোধ ও অতৃপ্তি যখন একান্ত হয়ে উঠেছে, তখন অবসাদক্লিষ্ট কবি চোখ মেলে চাইছেন প্রকৃতির দিকে, শান্তি খুঁজছেন 'নিশীথ-আকাশে'—

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা।

আশ্রয় চাইছেন তমিস্রার পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষের মাঝে—

সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চিরস্বপ্রকাশ।

এ ব্যাকুল প্রার্থনা অন্তরের নিরাশা ও বেদনারই পরিমাপ। কবি আজ শ্রান্ত, শরণ চাইছেন 'নিখিল-নির্ভর' ঈশ্বরে; আজ অসহায় কবির কণ্ঠে পরিতাপ দেখা দিচ্ছে—

যখন জীবন-ভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোনো পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ—
তোমার অগাধ শান্তি রহস্য অপার
সৌন্দর্য অসীম অতুলন—
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

প্রেম-অতৃপ্ত, জীবন-বঞ্চিত, সৌন্দর্য-তৃষিত কবির পক্ষে এ-শরণ যেমন অনিবার্য তেমনি অর্থপূর্ণ। পরিতাপ-দগ্ধ কবি দেখছেন সম্মুখে প্রসারিত 'অতুলন সৌন্দর্যে'র পথ—'অগাধ শান্তি'র পথ। পরের দুটি স্তবকে প্রকৃতির এ-শান্তি ও সৌন্দর্যের চিত্রটি বেদনা ও অনুরাগে অঙ্কিত হল—

কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণগঙ্গা সৈকত-শয়নে,
শিরোপরি সপ্তঋষি, যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্টনয়ান,

নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান।

'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'র পরদিনই রচিত 'জীবন-মধ্যাহ্ন'-এ দৃষ্টি ও অনুভূতির কী বিস্ময়কর পার্থক্য!

একটা প্রশ্ন থেকে যায়—প্রবল মানসিক বিক্ষোভের মধ্যে রচিত এ-দুটি কবিতাকে এতটা মূল্য না দিয়ে সাময়িক ভাবক্ষণেরই প্রতিক্রিয়া বলে গণ্য করা যেতে পারে কি? কথাটি চিন্তনীয়। কিন্তু প্রকৃতির করালরূপ-কল্পনা শুধুমাত্র 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'তেই পাই না; পূর্বে বলা হয়েছে 'ছবি ও গান' থেকেই এ-কল্পনা কাব্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে; 'কড়ি ও কোমল'-এ পেয়েছি, 'মানসী'তে পেলাম। সুতরাং 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'কে ক্ষণিকের ভাবমুহূর্ত বলে অবহেলা করা চলে না। অন্যদিকে, 'জীবনমধ্যাহ্নে'র প্রকৃতি-অনুরাগ ও তার অন্তরে আশ্রয়-কামনা সাময়িক ভাববিহ্বলতা নয়; প্রকৃতির সৌন্দর্য-চেতনা 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে সুস্পষ্টধারায় রবীন্দ্রকাব্যে প্রবহমাণ। সুতরাং দুটি কবিতাকেই 'মানসী'র অন্তরিতিহাসের নিবিড় অঙ্গ বলে মানতেই হবে; ক্ষণিক ভাবক্ষণের সৃষ্টি তারা নয়।

যাই হোক, একান্তবিরুদ্ধ এই দুটি কবিতার মাঝে সামঞ্জস্য আনল আবার পরদিনই রচিত 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতাটি। এর একদিকে দেখি 'নিষ্ঠুরা প্রকৃতি'র ক্ষণিক কল্পনায় 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতার রূঢ় ছায়া; অন্যদিকে দেখি 'জীবনমধ্যাহ্নে'র সদ্য-উপলব্ধ অনুভূতি। সম্বোধনে রয়েছে 'নিষ্ঠুরা প্রকৃতি', কিন্তু প্রথম চরণেই রয়েছে প্রকৃতির প্রেমের আভাস—

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়,
একী খেলা তোর?

এবার সে 'নিষ্ঠুরা'র 'হৃদয়' খুঁজছেন কবি। প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে—কিছুটা বা অন্তরের তাগিদে—প্রকৃতি আজ মধুরা মায়াবিনীতে রূপান্তরিত—

তবু তোরে ভালোবাসি, পারিনে ভুলিতে,
অয়ি মায়াবিনী।
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।

গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল এই 'তবু' কথাটি! 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' এবং 'জীবন-মধ্যাহ্নে'র দুস্তর ব্যবধানের মাঝে এবার এই 'তবু' শব্দটি সেতু রচনা করল। অন্ধ, হয়তো নির্মম, সে প্রকৃতি; 'তবু তোরে ভালোবাসি'! যে প্রকৃতির বুকে দারুণ দুঃখে কবি শরণ নিলেন 'জীবনমধ্যাহ্নে', তার নিবিড়রহস্যময় রূপের জন্য কবির ভালবাসা আবার উদ্বেল হল—

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি;
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।

প্রকৃতির রূপরহস্যের, তার নানা বিরুদ্ধ ভাবলক্ষণের রসঘন চিত্রণে, পরিণত বলিষ্ঠ কল্পনার স্বাক্ষর পড়েছে এ-কবিতায়। এই 'ললিতে কঠোরে বিপরীত' আত্মভাবনা, মুক্ত কল্পনা মানসীকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। সে-প্রকৃতি কোথাও রহস্যময়ী 'মায়াবিনী', কোথাও কৌতুকোচ্ছলমধুরা, কোথাও 'চির-একাকিনী, চির-মৌনব্রতা'; কোথাও লজ্জাহীনা বিস্রস্তকেশা উদ্দাম বালিকামূর্তি, কোথাও বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ-নয়না। অনন্ত তার মহারূপরাশি; সংখ্যাতীত তার করুণামধুর মায়ারূপ—

প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদুমধু কৌতুকের হাসি
অরুণ-অধরা।
... ...
কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চির-মৌনব্রতা।
চারিদিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরু-নির্জনতা।
... ...
কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশ বেশ;
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত, উৎসের মতন
নাহি লজ্জালেশ।

কল্পনার এ-বৈচিত্র্য ও প্রসারতা 'মানসী' কাব্যে অভিনব ; এর একমাত্র ত্রুটি আবেগের প্রাবল্য, ভাবালুতার স্পর্শ।

সুতরাং দেখা গেল 'জীবনমধ্যাহ্ন'-এ প্রকৃতির 'মহারূপরাশি'র মাঝে, তার প্রেম ও প্রশান্তির মাঝে কবি আশ্রয় নিচ্ছেন। এ-পর্বের উত্তরভাগে দেখব এ-শরণ কবিকে সান্ত্বনা দেবে কিন্তু 'শান্তি' দেবে না। বিরোধ ও নৈরাশ্য আজও রইল, পরেও থাকবে। তবু বিশেষ লক্ষণীয় হল এই যে 'মরণস্বপ্ন' থেকে 'অপেক্ষা' পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় প্রকৃতিচেতনার একটি গভীর ছায়াপাত ঘটবে। সে বিমুগ্ধ চেতনা অনুভূতি ও কল্পনাকে কোথাও করবে পটভূমিকা, কোথাও করবে অনুরঞ্জিত। তাই 'জীবন-মধ্যাহ্ন' রইল কবিমানসের এক সঙ্কটকালের শীর্ষে। গহন অন্তরে কোথায় যেন সুপ্ত রইল 'জীবনমধ্যাহ্নে'র অনুভূতি ; সমস্ত বেদনায় এ অনুভূতির ছায়া পড়বে ; সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতির নানা রঙ এসে মিলবে।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। 'জীবনমধ্যাহ্নে' অন্তরের নিরুদ্ধ গহ্বরে প্রকৃতির আলোক এসে পড়ল ; কিন্তু অন্ধকার কাটল না। 'শ্রান্তি' থেকে মানসিক 'অভিসার' পর্যন্ত ছয়টি কবিতায় * বিরহ ও আকাঙ্ক্ষার ছায়া প্রগাঢ় হয়ে রইল। প্রতিটি কবিতারই মর্মকথা—

বৃহৎ বিষাদছায়া, বিরহ গভীর
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর। ('আকাঙ্ক্ষা')

কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় হল প্রতিটি কবিতায়, এ 'বিরহ' ও 'আকাঙ্ক্ষা' প্রকৃতির রূপচেতনার স্পর্শ পেয়েছে, প্রকৃতির অন্তরে মিশেছে ; তার ইঙ্গিত রয়েছে 'শ্রান্তি' কবিতায়, স্পষ্টতর প্রকাশ ঘটেছে 'মরণস্বপ্ন' কবিতায়। অনুভূতির তীব্রতায়, কল্পনার প্রখরতায় 'মরণস্বপ্ন' 'মানসী'র একটি অপূর্ব সৃষ্টি। 'নির্জনস্তব্ধ', 'স্বপ্ন-চঞ্চলিত' কৃষ্ণপক্ষরাত্রির মায়া নামল কবির মনে। তার পর দেখি দীর্ঘ দশস্তবকব্যাপী নিশীথরাত্রির প্রগাঢ় বর্ণনা—

চিরযুগরাত্রি ধরে শত কোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগন মাঝার ;

---

* 'শ্রান্তি' (১৬ বৈশাখ), 'মরণস্বপ্ন' (১৭ বৈশাখ), 'বিচ্ছেদ' (১৯ বৈশাখ), 'আকাঙ্ক্ষা' (২০ বৈশাখ), 'একাল ও সেকাল' (২১ বৈশাখ), 'মানসিক অভিসার' (২১ বৈশাখ)।

প্রাণপণে চক্ষু চাহি, আঁখিতে আলোক নাহি,
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায়ে সুদীর্ঘ গ্রীবা নামিল মরাল ;
ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া ;
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

প্রকৃতির মৃত্যুহিম অন্ধকার আর অন্তরের নীরন্ধ্র তিমির যেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল ; শূন্যতার বেদনা যেন অন্তরের কালো গহ্বর থেকে প্রকৃতির 'গাঢ়তম অন্তিম কালিমা'র মধ্যে পরিব্যাপ্ত হল।

'মরণস্বপ্নে' মৃত্যুকল্পনা এ কাব্যে প্রথম দেখা দিল ; এর গূঢ় উৎস রয়েছে রোম্যান্টিক কল্পনার স্বভাবধর্মে। মৃত্যু রোম্যান্টিক কাব্যের একান্ত সুপরিচিত, কিছুটা অনিবার্য ভাবপ্রত্যয়। সে-কাব্যের চিরন্তন প্রয়াস কল্প-লোকের ও বাস্তব লোকের সমন্বয়-সাধন। রোম্যান্টিকের চোখে চিরাভ্যস্ত জগৎটার চারিদিকে রয়েছে যবনিকার অন্তরাল ; রোম্যান্টিক কবি তাঁর দিব্যকল্পনার আলোকে সে-যবনিকা সরিয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে যান অরূপ লোকে ; আভাস পান অনন্ত সৌন্দর্যের, অমর্তসত্তার। কবি তখন এই দুই জগতের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধানে পীড়িত হন ; শুরু হয় সেতুরচনার ব্যর্থ প্রয়াস। কবি খুঁজে ফেরেন বাস্তবের মাঝে তাঁর আদর্শলোকের প্রতিরূপ। সে 'নিষ্ফল কামনা' ও 'প্রয়াস' নিরাশার বেদনা আনে এবং সে-নৈরাশ্য-বেদনাই তখন কাব্যের অন্যতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি যখন এই ব্যর্থতার বিলাপকেই কাব্যে বড় করে দেখে তখন সান্ত্বনা খোঁজে মৃত্যুকল্পনায়। মৃত্যু দেখা দেয় বিরোধ ও ব্যর্থতা থেকে মুক্তির পথ হয়ে, সমস্ত রহস্যের অন্তিম পরিণাম হয়ে। মৃত্যু তখন হয় রোম্যান্টিক কবির একান্ত কাম্য।

'জীবনমধ্যাহ্নে'র প্রকৃতিচেতনা 'মরণস্বপ্ন'-এ অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব-মিলনের মধ্যে সংহত হয়ে দেখা দিল ; প্রকৃতির মায়ামন্ত্র এবার অন্তরের

গভীরে সাময়িক রূপান্তর আনবে, কাব্যে কিছুকালের জন্যে প্রকৃতিমাধুর্যের প্রশান্তছায়া পড়বে।

এ-রূপান্তরের স্বাক্ষর রয়েছে 'বিচ্ছেদ' থেকে 'মানসিক অভিসার' কবিতা পর্যন্ত (১৯ থেকে ২১ বৈশাখ)। প্রেমবিরহের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা এ-চারটি কবিতাতেই ফুটে উঠেছে। প্রতিটি কবিতাই প্রিয়ার মূর্তিটিকে অনুরাগে স্মরণ করছে, এবং প্রতিটি কবিতারই পশ্চাৎভূমি প্রকৃতির বিশাল সৌন্দর্য। হৃদয়ের অন্ধকারা থেকে মুক্ত হয়ে সে-মূর্তি যেন পুনঃসৃষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির অন্তরে; প্রকৃতির রূপরহস্যে আজ তার রূপলাবণ্য যেন মিশে গেছে। এ-পরিব্যাপ্তির প্রথম আভাস রয়েছে 'বিচ্ছেদ' কবিতায়—

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ,
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস,
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

'বিচ্ছেদ' সায়াহ্নের একটি শান্ত, স্তব্ধ চিত্র; তার রক্তিম পটভূমিতে দেখা দিল প্রিয়ার 'মোহিনী-প্রতিমা'। অস্তসূর্য দিবসের 'অন্তিম মহিমা'য় প্রিয়ার মূর্তিটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। প্রকৃতির নিবিড় মায়া ও কবিচিত্তের প্রশান্তি এ-কবিতায় পরিস্ফুট।

পরের দুটি কবিতায় এ-বৈশিষ্ট্য আরও গভীর রেখায় ফুটেছে। 'আকাঙ্ক্ষা'য় কবির বিরহ-ব্যাকুলতা যেমন গভীর, প্রকৃতির মায়া তেমনি শান্তনিবিড়। কবির বিরহ পরিকীর্ণ হল বর্ষার মেঘমেদুর আকাশে; বহির্বিশ্ব ও অন্তরের একাত্মতায় কামনার বিক্ষোভ অন্তর্হিত; বেদনার মাঝে নামল প্রশান্ত ছায়া—

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উত্তরোল বায়।'

দু'টি কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথমত, 'জীবনমধ্যাহ্ন' ও 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতাদুটির পরেই 'শ্রান্তি' কবিতা থেকে কাব্যে দেখা দিয়েছে একটি বেদনানিবিড় স্তব্ধ, শান্ত সুর, এ-সুর গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে

'শ্রান্তি', 'বিচ্ছেদ' ও 'আকাঙ্ক্ষা'-য়। প্রকৃতির নিঃসীম নীরবতা, তার ছায়া এবং মায়া এ-কবিতা ক'টির চরণে চরণে নিঃশ্বসিত। দ্বিতীয়ত, এ-কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দ্বিতীয় পর্বে এসে 'মানসী'-কল্পনা অন্তর্হিত, 'নিভৃত আশ্রম'-এর ঐকান্তিক কামনা নির্বাপিত। পরিবর্তে দেখি কবিচিত্তকে আচ্ছন্ন করেছে দুঃখ, শোক ও বিরহকামনা। বিশেষ প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কবির জীবনকে দুর্বহ করেছে, দৃষ্টিকে করেছে অবরুদ্ধ। 'উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ' বারবার দেখা দিয়েছে, 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি'কে নিষ্প্রভ করেছে।

তবু সম্পূর্ণ নয়। 'জীবনমধ্যাহ্নে'র শেষ স্তবকে দু'টি কৌতুকাবহ চরণ আছে—

ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমুরতি।

এই 'আনন্দমুরতি'র আভাস রয়েছে 'বিচ্ছেদ' কবিতার শেষে। বিরহানলের পাবনবহ্নি হতে হঠাৎ জেগে উঠবে 'মানসী' মূর্তি। নিস্তব্ধ সন্ধ্যার স্বর্ণাভায় কবি দেখলেন তাঁর মানবী-প্রিয়াকে; দেখলেন 'সেই মুখচ্ছবি'—

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধহিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

এ-মূর্তি মানবীয়; তার পর অগ্নিদীপ্ত দিগন্তের ক্ষণিক আভায় সহসা সে মুখচ্ছবি নিমেষের জন্যে রূপান্তরিত হল 'মোহিনী প্রতিমা'য়। শুধু মুহূর্তের জন্যে; তার পর—

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন
অনন্ত আকাশ আর ধরণী বিশাল।

কবির বিরহকামনা 'মরণস্বপ্নে'র মৃত্যুস্নান শেষ করে 'বিচ্ছেদ'-এ মানসীর মূর্তিকল্পনায় উন্নীত হল। পাঠকের স্মরণ হবে, ঠিক এমনিভাবেই 'কড়ি ও কোমল'-এ মৃত্যুর অভিঘাতে মানসী কল্পনা জেগেছিল; সে-কাব্যে দেখেছি, 'বিরহ' 'বিলাপ' ও 'আকাঙ্ক্ষা'র পর 'তুমি' ও 'যৌবনস্বপ্ন' কল্পমূর্তির

আভাস এনেছিল। 'মানসী' কাব্যে কতকটা সেই কল্পনরীতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটল : 'শূন্যগৃহে' থেকে 'মরণস্বপ্ন' পর্যন্ত 'প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর' কবিকে কালিমাঘন জীবনবোধের মধ্য দিয়ে মরণকল্পনায় নিয়ে এল ; তার পর 'জীবনমধ্যাহ্নে' প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য ধীরে ধীরে কবিচিত্তে তার প্রভাব বিস্তার করল ; মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তরে এল প্রশান্তি ; প্রকৃতির স্পর্শে সৃষ্ট হল 'মোহিনী প্রতিমা', মানসীর প্রতিমূর্তি।

দু'দিন পরে (২১ বৈশাখ) রচিত হল দু'টি কবিতা—'একাল ও সেকাল' ও 'মানসিক অভিসার'। 'একাল ও সেকাল'-এ কবির অন্তর্বেদনা প্রথম বহির্লোকে প্রক্ষিপ্ত হল, নৈর্ব্যক্তিক রূপ নিল। 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় বর্ষার মেঘাচ্ছায়া যে 'সুগম্ভীর মর্মব্যাকুলতা' জাগিয়েছিল, 'একাল ও সেকাল'-এ তা রূপান্তরিত হল বিরহিণী রাধিকার অভিসার কল্পনায়, যক্ষনারীর বিরহাতুর মূর্তি সৃজনে। কবির আত্মগত বিরহ বর্ষার সুনিবিড় পরিবেশে চিরবিরহের প্রতীক রাধা ও যক্ষনারীতে অভিক্ষিপ্ত হল। বহুদিন পরে পেলাম আত্মগত অনুভূতির বিষয়াশ্রয়-প্রবণতা—

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।
... ...
যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন,
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ
অযত্নশিথিল বেশ ;
সেদিন এমনিতর অন্ধকার দিন।

'মানসিক অভিসার'-এ কল্পনা আবার ফিরে এল আত্মবিরহে। 'আকাঙ্ক্ষা'র কামনা যেমন 'একাল ও সেকাল'-এ রূপ নিল, 'বিচ্ছেদ'-এর 'মোহিনী-প্রতিমা' তেমনি পুনঃসৃষ্ট হল 'মানসিক অভিসার'-এ। 'বিচ্ছেদ'-এ সে-প্রতিমা প্রদীপ্ত হয়ে নিমেষে মিলিয়ে গিয়েছিল ; 'মানসিক অভিসার'-এ সে-মূর্তি ধরা দিল স্বপ্ন-আলিঙ্গনে। এ-কবিতায় তাই কল্পনার বিচিত্র পথরেখা ঔৎসুক্য জাগায় : 'একাল ও সেকালে'-র অভিসারিকা রাধিকারই মতো কবির 'মানসী' দীর্ঘ মানস-অভিসারে বাহির হয়েছেন ; কিন্তু রাধার

অভিসার, যক্ষনারীর বিরহ সেখানে ছিল মিলন-বঞ্চিত। 'মানসিক অভিসার'-এর অভিসারিকা, কবির কামনার পীড়নে, মিলনতৃপ্ত—

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে
মানস-মুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

দীর্ঘসন্তত বিরহকামনা চরিতার্থ হল মনোলোকে, 'মানসিক অভিসার'-এ। 'মরণস্বপ্ন'-এ 'মৃত্যুর ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু'র মাঝে এ-চরিতার্থতা দেখেছি; 'মানসিক অভিসার'-এ 'মানস-মুরতিখানি' ধরা দিল ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে, তার সুকোমল বাহু মেলে। কামনার তপ্তনিশ্বাস রইল সে-মূর্তিকে আবেষ্টন করে। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র ভাষার রূপান্তরে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয় দিয়েই সে-মূর্তি প্রবিষ্ট হল জীবনমূলে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় দেখব কত গভীর গুরুত্ব এ-উক্তির; দেখব এর প্রবল প্রতিক্রিয়া,বিস্ময়কর পরিণতি।

কিন্তু উপস্থিত 'মানসিক অভিসার' কামনার তীব্রতাকে প্রশমিত করল। পরদিন লেখা 'কুহুধ্বনি' কবিতায় (২২ বৈশাখ) পরিতৃপ্ত মন আবার প্রকৃতির মাঝে প্রক্ষিপ্ত হল। গাজিপুরের তপ্ত মধ্যাহ্নের রুক্ষপ্রকৃতির সুবিস্তৃত বর্ণনা কাব্যে প্রথম পাওয়া গেল। অন্তরের আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে মন প্রসারিত মানুষ ও প্রকৃতির দিকে। তাই প্রকৃতি-পরিবেশ-রচনা অকস্মাৎ দীর্ঘ ও বর্ণবহুল; বহুকাল পরে ফিরে-পাওয়া বাস্তব দৃষ্টিতে তুচ্ছতম ঘটনা দেখা দিল অর্থময় চিত্র হয়ে। মানসিক রূপান্তর দৃষ্টির রূপান্তরে প্রতিস্থত হবার পর দীর্ঘকাল পরে 'কড়ি ও কোমলে'র 'বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা' মানসী কাব্যে ফিরে এল; এ-দৃষ্টি একান্তই চিত্রধর্মী—

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা।
অন্বেষিয়া দশদিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডু কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্রফলময়।

গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে
বন হতে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দুরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধু ধু
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া ;
তারি প্রান্তে উপবন মৃদু মন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ-বাস্তব অনুভূতি ও পুঙ্খ বর্ণনা মহার্ঘ ; এ-দৃষ্টি বিক্ষোভ-মুক্ত কবিচিত্তের পক্ষেই সম্ভবপর হল।

তবু 'কুহুধ্বনি'র বাস্তবদৃষ্টি ততটা কৌতূহল জাগায় না যতটা জাগায় কুহুধ্বনিকে আশ্রয় করে 'বিশ্বের বক্ষের কাছে সরলা সুন্দরী'র কল্পনা। প্রাত্যহিক জীবনের ও তুচ্ছতম মানুষের সুদীর্ঘ চিত্রটির পরে শেষে দেখি হঠাৎ এসেছে সে-দিব্যরূপিণীর কল্পনা—

এত কাণ্ড এত গোল বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত-বিভ্রমে,
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন সরলা সুন্দরী ;
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্চনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সঙ্গীতে।

পিছনে তাকালে এ-কল্পনার অর্থ সুস্পষ্ট হবে। 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য় দেখেছি প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রথম অস্ফুট কল্পনা। বাস্তব প্রেমের মধ্যে অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক 'মানসী'কে খুঁজে পাবার 'নিষ্ফল কামনা' ও 'প্রয়াসের' পর 'নিভৃত আশ্রমে' প্রথম পাওয়া গেল 'অনুপম জ্যোতির্ময়ী

মাধুরী মুরতি'-কে হৃদয়-আসনে স্থাপন বাসনা। 'পুরুষের উক্তি'তে দেখলাম সে-কামনা ও অন্বেষণের ইতিবৃত্ত—প্রথম প্রেমের দিব্যস্পর্শ; সে-স্পর্শে জাগ্রত বিশ্বের রহস্য-উন্মথিত মানসী মূর্তি; মানবীয় প্রেমে ও সৌন্দর্যে সে-মূর্তির অন্বেষণ; কামনার ব্যর্থতা ও শ্রান্তি।

দ্বিতীয় পর্বে দেখেছি 'নিভৃত আশ্রমে'র প্রশান্ত আকাঙ্ক্ষা বিলীন হল 'শূন্যগৃহে'। একদিকে সুতীব্র বিরহ অন্যদিকে কঠোর বাস্তবদৃষ্টি কবির জীবনবোধকে কালিমাচ্ছন্ন করল; তার গভীর স্বাক্ষর পড়ল 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'প্রকৃতির প্রতি'তে। বেদনা ও নৈরাশ্য কবিকে নিয়ে এল প্রকৃতির বক্ষে; 'জীবনমধ্যাহ্নে' ক্ষণকালের জন্যে প্রকৃতির বাতায়ন উন্মুক্ত হল; বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রকৃতির প্রশান্তির ছায়াপাত ঘটল। তবু প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ ঘুচল না; 'শ্রান্তি' থেকে 'মানসিক অভিসার' পর্যন্ত কবিতাগুচ্ছ তার সাক্ষ্য দিল। তা সত্ত্বেও দেখলাম প্রকৃতির মায়ামন্ত্র কিছুকালের জন্যে মনের গভীরে সক্রিয় হল; প্রকৃতির শান্তিধারা কামনাকে কিছুটা স্তিমিত করল; বিরহের স্মৃতি ও কামনা জেগে রইল, কিন্তু বিরহের বিক্ষোভ রইল না। সব থেকে লক্ষণীয় হল প্রকৃতির মন্ত্রে মানবী প্রিয়ার কল্পনার মাঝে মানসীর 'মোহিনী প্রতিমা' মুহূর্তের জন্যে উদ্দীপ্ত হল। 'মানসিক অভিসার'এ সে-মূর্তি ধরা দিল কবির বাসনার আলিঙ্গনে।

এই মানসিক পটভূমিতে 'কুহুধ্বনি' দৃষ্টিকে বাহিরের জগতে প্রসারিত করল; নিয়ে এল প্রাত্যহিক জীবনের ও প্রকৃতির বর্ণময় চিত্র। পরিশেষে বিশ্বের অন্তরে 'বীণাপাণি সুন্দরী'র কল্পনা অবচেতনে মানসীকল্পনার বর্ণাভা নিয়ে 'মুহূর্তের জন্যে আবির্ভূত হল। সে দিব্য মূর্তির ক্ষণিক আভাস মাত্র দিয়ে 'কুহুধ্বনি' দ্বিতীয় পর্বের যবনিকা টানল। তার পর আবার সে অনুভূতি বিলীন হল; ঘনিয়ে এল নিরাশার মেঘ। পুনরুক্তি করা প্রয়োজন সমগ্র মানসীকাব্যের অন্তরাখ্যান এই—নানা উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে ব্যর্থতার অনবচ্ছিন্ন সুর। ঘনমেঘের বুকে বিদ্যুৎশিখার মতোই সমস্ত উপলব্ধি ক্ষণকাল দীপ্ত হয়ে অন্তর্হিত হবে।

তবু একেবারে নয়। বুঝি বা সে-দীপ্তি মেঘের বুকেই লুকিয়ে থাকবে নূতনতর বোধের প্রতীক্ষায়। এমনি করেই অগ্রসৃত কবিমানস তার পদচিহ্ন রেখে যাবে মানসী কাব্যে—বিদ্যুৎমালার ক্ষণদীপ্তিকে কাব্যের

মধ্যে সঞ্চিত করে, পেয়ে এবং হারিয়ে—যতদিন না সে-'চঞ্চলগামিনী' 'ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমায়' 'অচপলদামিনী' হয়ে দেখা দেবে।

সে-চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের পরিণতি ঘটেছে সুদূরকালে। কিন্তু তবু সে-ইতিহাসের প্রাথমিক সূচনা রয়েছে মানসী কাব্যে। 'মানসী'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখলাম প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্যে শ্রান্তিহীন, তৃপ্তিহীন ব্যাকুলতা। তৃতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে দেখব সেই বেদনা-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়েই মানসীমূর্তির প্রথম উন্মেষ, তার বিস্মিত প্রকাশ।

॥ ৩ ॥

মানসীকাব্যের তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হল আঠারো দিন পরে। এ পর্বে পাই উনিশটি কবিতা—বধূ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫, ইং ১৮৮৮), 'ব্যক্ত প্রেম' (১২ জ্যৈষ্ঠ), 'গুপ্ত প্রেম' (১৩ জ্যৈষ্ঠ), 'অপেক্ষা' (১৪ জ্যৈষ্ঠ), 'দুরন্ত আশা' (১৮ জ্যৈষ্ঠ), 'দেশের উন্নতি' (১৯ জ্যৈষ্ঠ), 'বঙ্গবীর' (২১ জ্যৈষ্ঠ), 'সুরদাসের প্রার্থনা' (২৩ জ্যৈষ্ঠ), 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' (২৪ জ্যৈষ্ঠ), 'কবির প্রতি নিবেদন' (২৫ জ্যৈষ্ঠ), 'পরিত্যক্ত' (২৮ জ্যৈষ্ঠ), 'ভৈরবীর গান' (২৯ জ্যৈষ্ঠ), 'ধর্মপ্রচার' (৩২ জ্যৈষ্ঠ), 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' (২৩ আষাঢ়), 'প্রকাশবেদনা' (৩ বৈশাখ ১২৯৬, ইং ১৮৮৯), 'মায়া' (১ জ্যৈষ্ঠ), 'বর্ষার দিনে' (৩ জ্যৈষ্ঠ), 'মেঘের মেলা' (৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬, ইং ১৮৮৯)।

মানসীর তৃতীয় পর্যায়ে পাই উনিশটি কবিতা; এক বছরের মধ্যে তারা রচিত—১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ থেকে ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬। নতুন পর্যায়ের আরম্ভে 'কুহুধ্বনি'র বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা কাব্যে সন্তত রইল; আত্মমন্থন-শ্রান্ত কবি যেন বহির্মুখ কবিতায় মুক্তি খুঁজছেন। 'জীবনমধ্যাহ্ন' থেকে 'মানসিক অভিসার' পর্যন্ত কাব্য প্রধানত আত্মধর্মী; 'কুহুধ্বনি', 'বধূ', 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম'—ক্রমান্বয়ে চারটি নৈর্ব্যক্তিক কবিতা। 'বধূ' কবিতায় দেখি পাষাণ-কায়া রাজধানী'র বিরাটমুঠিতলে' গ্রাম্য বধূর অসহায় বেদনা; স্নেহহীন পরিবেশে সে গ্রামের উদার মাঠ ও শ্যামল ছায়ার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে;

'ব্যক্ত প্রেম'এ দেখি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করে নারীর আত্মনিবেদনের পর প্রেমের ব্যর্থতা, রিক্ততা ; 'গুপ্ত প্রেম'-এ দেখি রূপহীনা নারী তার প্রেমকে সংগোপনে রেখেছে ; দুঃসহ অন্তর্দাহ শুধু 'আপনার মরমে' 'প্রেমের কারাগার' রচনা করেছে। নারীহৃদয়ের প্রেম, তার কোমল নিঃসহায় রূপ কবি আবিষ্কার করছেন এই তিনটি কবিতায়। দুটি দিক বিশেষ লক্ষণীয়—প্রথমত, মানসী কাব্যের মূলতম সন্ধানই অন্যপথে ফিরে এল এ কবিতাগুলিতে : নারীহৃদয়ের প্রেমের শুভ্র, অকলঙ্ক রূপটি যেমন পরিস্ফুট, তেমনি সুস্পষ্ট সে-প্রেমের নিঃসহায়, বেদনাময় স্বরূপ। মানবীয় প্রেমের রিক্ততা ও নিষ্ফলতা এখানেও অভিব্যক্ত।

দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকেও কবিতাগুলি কৌতূহল জাগায়। এদের মাঝে গীতিধর্ম ও নাট্যধর্মের যে-সমন্বয়প্রয়াস রয়েছে তা ব্রাউনিং-এর কাব্যকে স্মরণ করাবে। ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রিয় কবি ; সুতরাং এদের মধ্যে ব্রাউনিং-এর প্রভাব অনুমান করলে বোধ হয় ভুল করা হবে না। কিন্তু সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যটা বেশি চোখে পড়ে। ব্রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ dramatic lyricsএ যে দৃঢ় সংহত রূপ, অনুভূতির যে বলিষ্ঠ নাটকীয় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম কাব্যপদবাচ্য' রচনায় সে সংহতি ও শক্তি দেখা দেয় নি। ব্রাউনিং-এর এ শ্রেণীর কাব্যে নাট্যধর্ম গীতি-প্রবণতার রাশ টেনেছে কঠোর হাতে ; 'মানসী'তে সে রাশ শিথিল, নাটকীয় রূপ দুর্বল। তাকে ছাপিয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের দুর্দমনীয় গীতিধর্মিতা।

এই গীতিধর্মই কাব্যে আবার ফিরে এল পরের কবিতা 'অপেক্ষা'য়। সমগ্র মানসীকাব্যে প্রসারিত এই আত্মমুখ কল্পনার দুর্বার আকর্ষণ, এই বারবার বেদনাঘন কল্পনালোকে প্রত্যাবর্তন। কবিতাটির প্রথমে রয়েছে স্তব্ধ সন্ধ্যায় স্নানরতা প্রেমিকার একটি চিত্র। তার পর সে চিত্রটির মাঝে দেখা দিল ইন্দ্রিয়ানুগ সৌন্দর্যের বর্ণন-মাধুর্য—

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।…

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি,
শরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি।

কবির অন্তরে জাগল মিলনব্যাকূলতা; সুকুমার কল্পনা সে-অন্তর্ব্যাকুলতার সঙ্গে আঁধারঘন পরিবেশের সমন্বয় ঘটাল—

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধার তলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

ঘননিবিড় অন্ধকারে পূর্ণমিলনের আকাঙ্ক্ষা কবিতাটির মাঝে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল। সে আকাঙ্ক্ষা অন্ধকারের মতোই অতলস্পর্শ। 'অপেক্ষা' আবার প্রমাণ করল এই কথাটি যে দ্বিতীয়পর্বের প্রেম, বিরহ ও মিলন-তৃষ্ণাই কাব্যে আজও অক্ষুণ্ণ রইল। অসীম সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাকে স্তিমিত করে ইন্দ্রিয়-গত প্রেমকামনা—'শূন্যগৃহে', 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'মানসিক অভিসারে'র ঐকান্তিক কামনাই কবিচিত্তে জেগে রইল। অন্তর্বিক্ষোভ আজ নেই, কিন্তু অন্তর্বেদনা আজও অপ্রতিহত।

কিন্তু বিক্ষোভ ও অন্তর্দাহ কাব্যে ফিরে এল অন্যরূপে, অন্য অভিঘাতে। 'অপেক্ষা'য় ছিল ঝঞ্ঝাপূর্ব স্তব্ধতা; ঝঞ্ঝার রূপ পেলাম চারদিন পরে, 'দুরন্ত আশা'য় (১৮ই জ্যৈষ্ঠ)।

'দুরন্ত আশা'র মত্ত ঝঞ্ঝা আকস্মিক নয়; সমগ্র কাব্যের মধ্যেই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ থেকে থেকে দেখা দিয়েছে। গাজিপুরের প্রথম কাব্যসৃষ্টির মধ্যে, তার পূর্বে, কড়ি ও কোমল-এর শেষে, 'স্বপন চয়ন'-শ্রান্ত কবির 'প্রকাণ্ড জীবন মাঝে' বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায়। কর্মহীন, কাব্যময় জীবনে গভীর অতৃপ্তি বহুদিন থেকেই কবিকে পীড়িত করছিল।

এ অতৃপ্তি ও অসন্তোষ শুধু অন্তরের নয়; বাহিরেও তার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ছিল। অজিতকুমার চক্রবর্তী দুই কথাই সংক্ষেপে বলেছেন—

"আমাদের দেশের চারিদিকের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন, ক্ষুদ্র কাজকর্ম কবিকে তখন বড়ই আঘাত দিতেছিল। নিজের ও কেবল অনুভূতি-ময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল—খুব একটা বড় ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—'দুরন্ত আশা' কবিতাটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।" (রবীন্দ্রনাথ: অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ ২৯-৩০)

'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর' কবিতায় সেই বাসনাই অকস্মাৎ দেখা দিল প্রবল বিদ্রোহ ও বিদ্রূপের রূপ নিয়ে। কড়ি ও কোমলের অন্তর্বিক্ষোভের পর পেয়েছিলাম 'আহ্বান-গীত'; মানসী কাব্যে 'বেদনা-ভরা প্রাণ' রচনা করল এই তিনটি কবিতা। সমস্ত অন্তর্বেদনা প্রতি-ফলিত হল বঙ্গভূমি ও বঙ্গবাসীর প্রতি কঠোর ব্যঙ্গে; প্রক্ষিপ্ত হল বীর্য-হীন বাঙালীর দুর্দিন কল্পনায়; 'অনপায়ী বঙ্গবাসী'র 'দাস্যসুখে হাস্যমুখ' চিত্রণে; আর্যতেজ-দর্পে বিভ্রান্ত দেশবাসীর মানসিক দৈন্যের শ্লেষোদ্দীপ্ত বর্ণনায়। 'দুরন্ত আশা' বঙ্গবাসীর একান্ত পরিচিত, একান্ত প্রিয় কবিতা; তথাপি এই ব্যঙ্গকঠিন দৃষ্টির প্রখরতা উদ্ধৃতি দাবী করবে—

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগমদে
দোদুল কলেবর।
পাদুকা তলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি,
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে বসে গর্ব কর পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ-দর্পভরে পৃথিবী থরহর।"

'অপেক্ষা' কবিতার চারদিন পরে 'দুরন্ত আশা'র মতো কবিতা। ভাব-বিলাসী, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-মন্থর কবির কী প্রবল বাস্তবসমৃদ্ধ জীবনবোধ, কী

অগ্নিদীপ্ত কল্পনা। বিস্ময় লাগে ভাবতে শ্লেষ ও বিদ্রূপের এমন তীক্ষ্ণ প্রকাশ, এমন পরিণতদৃষ্টি কোথা থেকে পেলেন এই আত্মবিলাপমুখর গীতিধর্মী কবি। অতিপ্রচলিত বাক্যসমষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে ধরা যাবে না। পরিণত শ্লেষ-তীক্ষ্ণ রচনা এর পূর্বে গদ্যে পেয়েছি একাধিক বার, কিন্তু কাব্যে 'দুরন্ত আশা'ই প্রথম সার্থক সৃষ্টি।

কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে 'দুরন্ত আশা'র গুরুত্ব গভীর। 'দুরন্ত আশা' শুধু শ্লেষসমৃদ্ধ দৃষ্টির প্রথম প্রকাশ নয়; পরিপূর্ণ জীবনাভিলাষের জন্যে অশান্ত কবির প্রথম, প্রবল বিদ্রোহঘোষণা। 'কড়ি ও কোমল'এ যে-আকাঙ্ক্ষা বারবার ধ্বনিত এবং বারবার ব্যাহত; 'মরীচিকা', 'স্বপ্নরুদ্ধ', 'আত্ম-অপমান' ও 'আহ্বান-গীতে' যে-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্পের স্তরে উন্নীত; 'মানসী'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে যা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, 'দুরন্ত আশা'য় সেই তীব্র, তপ্ত বাসনাই বহ্ন্যুদ্গার করে স্ফুরিত হল। 'কড়ি ও কোমলে'র 'আহ্বান-গীতে' যদি পেয়ে থাকি পূর্ণজীবনকামী কবির জন্মসূচনা, তবে 'দুরন্ত আশা'য় পেলাম তার উদ্দাম যৌবনচঞ্চল বিকাশ—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

দীর্ঘকাল আত্মরত প্রেমসম্ভোগকামী কাব্যের পর অকস্মাৎ 'মানসী'তে দেখা দিল কবির বিপুল জীবন-তৃষ্ণা, বীর্যদৃপ্ত বিদ্রোহ, নিঃশঙ্ক জীবনোচ্ছ্বাস। 'কড়ি ও কোমলে'র 'আহ্বান-গীত'-এ তার উৎসমুখ; মানসীর 'দুরন্ত আশা'য়

তার স্ফুরণ ; 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় তার পূর্ণতর ব্যাপ্তি ; 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে'তে তার বহ্নিময় শীর্ষদেশ।

চারদিনের মধ্যে পেলাম তিনটি শ্লেষদীপ্ত রচনা—যখন 'সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ' ; যখন—

আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।

এই 'বেদনাভরা প্রাণ' ও প্রজ্বলিত 'শরম-তাপ' এবার সৃষ্টি করল মানসীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা'। অন্তর ও বাহির যখন তিক্ততায় ভরে উঠেছে, আত্মজীবনের ও স্বদেশের গ্লানি ও ব্যর্থতায় সমস্ত মন যখন সমাচ্ছন্ন ; যখন, সুরদাসের ভাষায়,

অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্ম মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস—

তখন অবসন্ন মন বেদনায় ও অনুতাপে আবার ফিরে এল মানসী-কল্পনায়। রূপকের মাধ্যমে স্তরে স্তরে অনাবৃত হল কবির সমগ্র অন্তরিতিহাস ; অনাবৃত হল 'অসহন বহ্নি-দহনে'র নিভৃত উৎসমূল। সে-দহন প্রচ্ছন্ন রয়েছে দ্বিতীয় পর্বের 'শূন্য গৃহে' থেকে 'অপেক্ষা' পর্যন্ত 'মোহ-চঞ্চল' কামনায়। 'আকাঙ্ক্ষা'র

বৃহৎ বিষাদছায়া বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,

'মানসিক অভিসার'-এর

উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ 'তিয়াস,

'অপেক্ষা'র ইন্দ্রিয়ানুগ কল্পনা ও কামনা-মন্থর আবেশ সন্তাপের মধ্য দিয়ে আবার জাগিয়ে তুলল 'মানসী'র জ্যোতির্মূর্তিকে।

সুরদাস একদিন রানীকে দেখেছিলেন বাসনা-মলিন চক্ষু মেলে। দুর্বিষহ পরিতাপ উৎপাটিত করেছিল সে-দুটি চক্ষু। কবির অন্তর্গূঢ় ইতিহাসও সমজাতীয় : তিনিও একদিন উৎকণ্ঠ কামনা নিয়ে 'পাপ-আঁখি' মেলেছিলেন ;

দেখেছিলেন তাঁর মানস-প্রিয়াকে 'বাসনা-বিভোর' দৃষ্টিতে। আজ সুরদাসের কণ্ঠে উদ্ব্যক্ত হল কবির অনুতাপ-ক্লিষ্ট প্রশ্ন—

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে,
তুমি কি তখন পেয়েছ জানিতে ?
বিমল হৃদয় আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিঃশ্বাস রেখা-ছায়া ?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া।

তার পর শাস্তি চাইছেন সুরদাসের প্রণালীতে—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত,
প্রভাতরশ্মি সম ;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম।

পূর্ব ইতিহাসের অনুস্মৃতি আজ আনল তীব্র পরিতাপ-দাহ। তার পর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হল উত্তরভাগের অনুতপ্ত কামনা: কবি বলছেন, ছুরিকাঘাত উৎপাটিত করুক লালসা-কলঙ্কিত সে দুটি চোখ ; কেড়ে নিক, দৃষ্টি থেকে একেবারে মুছে নিক বাহির-বিশ্ব ; মুছে নিক প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য—

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূরদিশি…

…

লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে।

তার পরে পাই একটি গভীর স্বীকারোক্তি, কবির মানস-ইতিহাস রচনায় যা গুরুত্ব পাবে: ধ্যানকল্পনায় মানসী মূর্তিকে পেতে হলে এই 'তিমির-তুলিকা'ই তাঁর প্রয়োজন, কারণ প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য তাঁকে ভুলিয়েছে, তার 'মাধুরী-মদিরা' তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে—

ইহারা আমায় ভুলায় সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরী-মদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মতো রচি নব গান
নব নব তান ছাড়ি।
... ...

'জীবন-মধ্যাহ্নে'র ক্ষণিক আশ্রয় ও উপলব্ধি আজ স্পষ্টতই অস্বীকার করছেন কবি। প্রকৃতির মাঝে 'অগাধ শান্তি'র যে দুরাশা ছিল, 'মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে' ভুবনকে দেখার মধ্যে যে সাময়িক প্রতিশ্রুতি ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বিক্ষোভ স্তিমিত হয়েছিল, কিন্তু প্রেমের তৃষ্ণা ও মিলনের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল অপ্রতিহত। শান্তি মরীচিকার মতো দূরে সরে গেল। আজ ব্যক্ত হল তার নিগূঢ় হেতু। প্রকৃতির রূপসম্ভার বারবার ব্যাহত করেছে মানসীর অনুধ্যান; বারবার প্রলুব্ধ করেছে কবিকে তার উচ্ছলিত রূপমাধুর্যে; তার 'মাধুরী-মদিরা' কবিকে করেছে বিভ্রান্ত, তার 'ভুবনমোহিনী মায়া' কবিকে করেছে ব্যাকুল—

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।

চারিদিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।

এ স্বীকৃতি যেমন অভিনব তেমনি অর্থপূর্ণ। 'মানসী-কল্পনা' একটি বিশেষ স্তরে এসে পৌঁছল যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে তার সাময়িক বিরোধ সৃষ্ট হল। সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল, প্রকৃতির বহুবিচিত্র শোভা কবিকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, টেনে নিয়ে যায় বিপথে : 'মাধুরী-মদিরা পান করে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে'। সে-পথ মানসীর ধ্যানমূর্তির অনুস্মৃতির পথ যার দূরদিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল প্রথম যৌবনে ; যার কাছ থেকে কবিকে টেনে নিয়ে গেল প্রকৃতির মোহন মায়া। তা শুধু কবির রূপতৃষ্ণাই বাড়াল ; আনন্দ তৃপ্তিহীন 'আঁখির পিপাসা'—ইন্দ্রিয়জাত, কামনালিপ্ত। সে-তৃষ্ণা কবিকে লক্ষ্যচ্যুত করল, ম্লান করল অন্তরের ধ্যানমূর্তি। তাইতো কবির অনুতাপদগ্ধ ঘোষণা—'বাস্তব প্রেমে তোমায় পাইনি ; রূপে তোমায় চিনিনি ; বাসনা-কলঙ্কিত আঁখি তোমায় দেখেনি ; প্রকৃতি তার মোহন মায়ায় আমায় ভুলিয়েছে ; নিষ্প্রভ করেছে তোমার জ্যোতির্মূর্তি। এবার তিমিরশোভা নামুক আমার দৃষ্টিহীন চক্ষের সামনে ; আর সেই অনন্ত আঁধার ভেদ করে অন্তর্লোকে দেখা দিক দেবীর 'দিব্য প্রতিমা'—

ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে নাকি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি ?
... ...
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।

তবে তাই হোক, হয়ো না বিমুখ—
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি।

হৃদয়-আকাশে থাক্‌ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি !
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার-হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।

ইন্দ্রিয়কামনার ম্লানস্পর্শ থেকে মুক্তিলাভ করে, নিখিল-শোভার মায়াপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, 'আলোকমগন মুরতিভুবন' পরিহার করে, শুধু 'অন্তরের বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে' দেবীপ্রতিমাকে অবলোকন করার সুগভীর আকুলতা স্তবকে স্তবকে পরিকীর্ণ হল 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়। অদূরে দেখব 'ধ্যান' কবিতায় যখন মানসীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন 'বিশ্ববিহীন বিজনে' বসেই কবি তাঁকে বরণ করবেন, প্রকৃতির 'মুরতি-ভুবনের' মাঝে নয়। পুনরুক্তি প্রয়োজন যে মানসী-কাব্য একটি স্তরে পৌঁছে বিরোধ আনল প্রকৃতিলোক ও সৌন্দর্যকল্পনার মধ্যে। সে বিরোধ সাময়িক, কিন্তু একান্ত সত্য। হয়তো শ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত মনকে শান্তি দেবার জন্যে, ছুঁয়ে-যাওয়া, মিলিয়ে-যাওয়া মানসী মূর্তিকে সমাহিত চিত্তে উপলব্ধি করার জন্যে, ধ্যান-প্রতিমাকে অচঞ্চল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এই ক্ষণকালের বিরোধ ও বিচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নিখিলের অন্তর্মাধুর্যের বিরাট প্রতীক হয়ে যে-কল্পনা আবির্ভূত হবে উত্তরকাব্যে, চরাচরে ব্যাপ্ত হবে যে দিব্য-প্রতিমা অদূর ভবিষ্যতে, সে-কল্পনার এ-সাময়িক বিরুদ্ধতাও অত্যন্ত কৌতুকাবহ, বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য। 'মানসী'-কল্পনা হবে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় সত্তা। কিন্তু সুরদাসের প্রার্থনায় মানসী-কল্পনা হল প্রকৃতিবিমুখ —এ-ঘটনা যেমন আকস্মিক, তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ; যেমন অভাবনীয়, তেমনি অভিনব।

'সুরদাসের প্রার্থনা'য় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা একটি বিশেষ স্তরে এসে পৌঁছল। আরও একটি দিক থেকে এ কবিতার গুরুত্ব অসামান্য।

'সুরদাসের প্রার্থনা' স্মরণ করায় দার্শনিক প্লেটোর সৌন্দর্যবাদ; এ-কবিতার অন্তর্মূলে যে-বিরোধ দেখেছি তা বহু ও একের বিরোধ। সে-বিরোধের প্রথম ও প্রধান চিন্তানায়ক হলেন প্লেটো—অধ্যাপক বোসাঙ্কোয়ের ভাষায়: 'The prophet of a dualism between nature and

intelligence or spirit.' রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনার নানা বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও প্লেটোর কল্পনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য গভীর। 'মানসী' কাব্যে এগিয়ে যাবার আগে এ-প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রয়োজন।

'Republic' ও 'Symposium' গ্রন্থে প্লেটোর সৌন্দর্যকল্পনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। সমস্ত দৃশ্যজগতের খণ্ড সৌন্দর্যের অন্তরালে রয়েছে এক অখণ্ড, অদৃশ্য সৌন্দর্যসত্তা—শাশ্বত, বস্তুনিরপেক্ষ, বহুসাধনালভ্য। দার্শনিক —প্লেটোর স্বরাজ্যে কবি বিতাড়িত—মানসিক প্রশিক্ষার দ্বারা সৌন্দর্যের বহু ও বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে সেই নিত্য ও অপরিবর্তনীয় একের পরাদৃষ্টিতে পৌঁছন। প্লেটোর মতে এই 'Forms' বা 'Ideas'-এর জগৎ শুধু শাশ্বতিক নয়, একমাত্র সত্যজগৎ। দৃশ্যজগতের সমস্ত সৌন্দর্য সেই নিত্যলোকের ছায়ামাত্র; অসম্পূর্ণ অনুকৃতি মাত্র।

Penguin Classicsএ 'Republic' গ্রন্থের অনুবাদক*এই সূত্রে বলছেন, "For him (Plato) there are two orders of reality. There is the world of everyday experience, of becoming and change, of visible and sensible things ; and there is the unchangeable eternal world, the world of the Platonic 'Forms', apprehended by the intellect, not the senses. The first of these two worlds is in some sense an image or shadow of the other, which contains the patterns which it imperfectly imitates."

বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ তাঁর Problems of Philosophyতে † এই কথাটাকেই আর একটু বিশদভাবে বলেছেন—

"Thus Plato is led to a supra-sensible world, more real than the common world of sense, the unchangeable world of 'ideas' which alone gives to the world of sense whatever pale reflection of reality may belong to it. The truly real world for Plato is the world of ideas ;......Hence it is easy to pass on into a mysticism. We may hope in a mystic

* Plato : 'The Republic'—Translated by H. D. P. Lee. p. 234.

† B. Russell . 'Problems of Philosophy', p. 143.

illumination to see the 'ideas' as we see objects of sense ; and we may imagine that the 'ideas' exist in heaven. These mystical developments are very natural but the basis of the theory is in logic."

এ-দুটি উদ্ধৃতি প্লেটোর দর্শনে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিরোধটাই সুস্পষ্ট করে। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় কবির সৌন্দর্যকল্পনায় এই বিরোধই একান্ত হয়ে দেখা দিল। প্লেটোর মতো রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসত্তাকে দেখলেন বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। দৃশ্যমান 'মূর্তিস্রোত'কে বর্জন করে কল্পনা ধাবিত হল 'বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে', 'দেহহীন জ্যোতি'র অভিমুখে। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় সৌন্দর্য-চেতনা দুটি বিরুদ্ধ লোকে পরিচ্ছিন্ন হল। কবি যাকে বলেছেন 'নিখিলের শোভা', 'মুরতি-স্রোত' এবং 'মুরতি-ভবন', দার্শনিক তাকেই বলেছেন 'The many particular things which we call beautiful or good which are the objects of sight but not of intelligence' ; কবি যাকে বলেছেন,

হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি !

দার্শনিক তাকেই বলেছেন 'absolute beauty and goodness', 'unique Form which we call an 'absolute reality', 'Forms which are the objects of intelligence but not of sight. * বিশেষ কৌতূহল জাগায় প্লেটোর এই 'sight' কথাটি ; প্লেটো বলতে চেয়েছিলেন

* 'Republic' গ্রন্থে 'Philosopher Ruler' অধ্যায়ে সক্রেটিসের উক্তি ; Plato : 'The Republic'—Penguin Books, p. 271.

'Symposium'এর শেষে বিশ্ববিশ্রুত একটি অধ্যায়ে ডায়টিমা সক্রেটিসকে এই স্তরবিভেদের কথাই বলেছেন 'Ascent to Absolute Beauty' প্রসঙ্গে। ডায়টিমা প্রথম স্তরকে বলেছেন 'the contemplation of physical beauty' ; তার পর অন্তিম স্তরে পরমসৌন্দর্যের বর্ণনায় বলেছেন—"a beauty whose nature is marvellous, indeed the final goal of all the previous efforts. This beauty is first of all eternal ; it neither comes into being nor passes away, neither waxes nor wanes ; ·········absolute, existing alone with itself, unique, eternal, and all other beauties partaking of it······"

দৃষ্টির অতীত এক পরমসত্তা, তা একমাত্র মননগম্য। সুরদাসের কণ্ঠে দৃষ্টিবিলুপ্তি-কামনার মধ্য দিয়ে সেই সত্তারই নির্দেশ রয়েছে—

শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে,
অনন্তনিশি-মাঝে।

প্লেটোর ভাষায় 'Forms are the objects of intelligence, not of sight'; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।'

কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার এইখানেই প্রচ্ছন্ন দার্শনিক ও কবির মৌল পার্থক্য। প্লেটোর 'Unique Form' বুদ্ধিগম্য, 'objects of intelligence'; রবীন্দ্রনাথের অনন্ত সৌন্দর্যসত্তা বুদ্ধির অতীত, শুধু মাত্র অতীন্দ্রিয়দৃষ্টির অধিগম্য।

যাই হোক, দেখা গেল প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপৈশ্বর্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য অনুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম তীক্ষ্ণ বিরোধ ঘটল 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়। বলে রাখা প্রয়োজন—এই প্রথম ও এই শেষ। কারণ এ-বিভেদ রবীন্দ্রমানসধর্মবিরোধী। এ'কে ক্ষণিকের একটি ভাবমুহূর্ত বলা হলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যের সাধনা হবে বিশ্বলোকে সৌন্দর্যসত্তার প্রকাশ অসীম বিস্ময়ে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্র-কাব্যে রূপ হবে অরূপের দিব্যাভাসে সমুদ্ভাসিত; ইন্দ্রিয়জগৎ হবে দিব্য-রূপিণীর স্পর্শচকিত। দু'য়ের বিরোধ কোথাও থাকবে না।

পূর্বে বলেছি এ-বিরোধের মূলে আছে কামনাবিক্ষুব্ধ কবিচিত্তের বেদনা ও নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া। 'কড়ি ও কোমল' থেকে দীর্ঘসন্ধানশ্রান্ত অন্তরে 'মানসী'র দিব্য কল্পনা বারবার ব্যাহত হল; ম্লান হল কামনার কলুষস্পর্শে। তার ইন্ধন জুগিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির 'ভুবনমোহিনী মায়া'। তাই রবীন্দ্রকাব্যে এই 'মুরতি-স্রোত'-সন্তরণে সুগভীর ক্লান্তি এল; সমস্ত মূর্তিস্রোতের অন্তরালে, অসীম আঁধারে, মানসীর দেহহীন জ্যোতির্মূর্তির জন্য ব্যাকুলতা জাগল। তাই কাব্যে দেখা দিল প্রাতন্বিক বিরোধ। উত্তরকাব্যে দেখব মানসীর কল্পমূর্তিকে ধ্যানের মাঝে লাভ করার পর

এ-বিরোধ কাব্য থেকে মুছে যাবে। কিন্তু এই নির্জনধ্যানসাধনার জন্য এ বিরোধের প্রয়োজন ছিল। এই 'বিশ্ববিহীন' বিজনসাধনারই কথা রয়েছে অদূরে 'ধ্যান' কবিতায়।

কিন্তু ক্ষণকালের এই দ্বৈতবাদ প্লেটো ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসাদৃশ্যের একমাত্র সাক্ষ্য নয়। দার্শনিক ও কবির চিন্তাধারার তুল্যতা আরও সুদূরপ্রসারী।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনার অভিব্যক্তি ঘটেছে কয়েকটি বিশেষ স্তরের মধ্য দিয়ে। তার রূপ ও রেখা পূর্বে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্লেটোর সৌন্দর্যবাদের স্তরবিভক্ত অভিব্যক্তির সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য গভীর। প্লেটোর এই স্তর-বিভাগের একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি আছে Gilbert ও Kuhn-এর History of Aesthetics গ্রন্থে। কবির সৌন্দর্যকল্পনার ক্রমোদ্ভিন্ন ইতিহাসে এ উদ্ধৃতি চিত্তাকর্ষক—

"The main interest for Plato in love specifically philosophic is the ascent of the way, the ladder of beauty : dialectic. The first step up is the universalising of beauty......**The fair body of his beloved becomes part and instance of a world of physical beauty.** The next step involves the change from body to soul. Even a slight measure of mental grace will come to outweigh in his estimation a great deal of physical beauty....The Beauty that lies at the end gives meaning to all the lower beauties. ...Those who have great courage and understanding, and hold fast to the end, have suddenly revealed to them "a wondrous vision." Plato conceives of this vision as if it were the mystic fulfilment of a rite. ...Beauty itself is stable. The many beauties come into being and pass out again....The contrast for Plato between the Ideas or essences and the particular existences or instances always implies **the opposition between an unchanging one and the changing many.**"

প্লেটোর সৌন্দর্যবাদের ক্রমোন্নত স্তরের প্রতিচ্ছায়া রয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে ; যেমন রয়েছে রবীন্দ্রকল্পনার বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর। 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত বলা যেতে পারে সে কল্পনার প্রথম ধাপ। 'প্রভাত-সঙ্গীত' থেকেই চোখ মগ্ন হল প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে সুন্দরকে টুকরোভাবে দেখায়—ডায়টিমার ভাষায় 'The contemplation of physical beauty' ; সক্রেটিসের দার্শনিক ভাষায় 'the many particular things which we call beautiful or good which are the objects of sight but not of intelligence.' এই দৃষ্টি অনবচ্ছিন্ন রইল 'ছবি ও গানে' এবং 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম দিকে। তার পর 'কড়ি ও কোমলে' হঠাৎ এল প্রেম ও বিরহ—সুন্দরকে খুঁজলেন কবি প্রিয়ার তনুলাবণ্যে। 'The fair body of the beloved becomes part and instance of a world of physical beauty.' তার পর 'মানসী' কবিকে নিয়ে গেল দ্বিতীয় ধাপে—'আত্মার রহস্যশিখা'র মধ্যে কবি খুঁজে বেড়ালেন সুন্দরের প্রতিমূর্তি। Symposium-এ ডায়টিমার ভাষায় 'The next stage is···to reckon beauty of soul more valuable than beauty of body.' মানসী-কাব্যে এ-সন্ধান যে কুটিল রেখায় সম্প্রসারিত, যে বেদনা ও হতাশার হেতুমূল, তা এ আলোচনার বাহিরে ; কিন্তু 'মানসী'তেই পাব প্লেটোর চরম সোপানশীর্ষ—অনন্ত সৌন্দর্যের দিব্য অনুভূতির প্রথম প্রকাশ—প্লেটো (ডায়টিমা) যাকে বলেছেন 'absolute beauty in its essence pure and unalloyed', 'a beauty whose nature is marvellous indeed.' সে চরম উপলব্ধির প্রথম স্বাক্ষর পড়েছে 'ধ্যান' কবিতায়।

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে প্লেটো ও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকল্পনায় নানাদিক থেকে তুলনীয় ; নানাভাবে তাঁরা সমধর্মী। কবির কাব্য তাই একদিক থেকে দার্শনিকের সিদ্ধান্তের নিদর্শন হয়ে রইল। কিন্তু কিছুদূর পর্যন্ত ; অন্যদিক থেকে দেখব বৈষম্যও গভীর।

প্রথম ও প্রধান বৈষম্যের নির্দেশ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে—'সুরদাসের প্রার্থনা'য় সাময়িক দ্বৈতবাদ সত্ত্বেও রবীন্দ্রকল্পনা সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ; তার সংশয়হীন প্রমাণ সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য। দ্বিতীয় প্রভেদ রয়েছে সৌন্দর্যকল্পনার মূলে একেবারে প্রথম স্তরে। এ কথা ভুললে চলবে না, প্লেটোর সোপানশ্রেণী চূর্ণ করে 'প্রভাতসঙ্গীত'-এ প্রথমেই দেখা দিল প্রবল সৌন্দর্যচেতনা, প্লেটো

যাকে বলেছেন 'the sudden wondrous vision'; ভুললে চলবে না যে প্লেটো যে-বয়সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই অকস্মাৎ দেখেছিলেন সৌন্দর্যের আদি উৎসকে। প্লেটোর দিব্য উপলব্ধি প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের উক্তি পূর্বে দেখেছি, 'We may hope in a mystic illumination to see the ideas as we see objects of sense." একই প্রসঙ্গে গিলবার্ট ও কুহ্ন্ বলেছেন 'Plato conceives of this vision as if it were the mystic fulfilment of a rite.' একথা একান্ত স্মরণীয় যে রবীন্দ্রকাব্যে এই 'mystic illumination', 'mystic fulfilment' প্রথম যৌবনেই তার প্রবল প্রাথমিক আভাস এনেছিল; রবীন্দ্রমানসের সৌন্দর্য-সোপান-চর্যা শুরু হয়েছিল সোপানশীর্ষের ক্ষণিক-উদ্ভাসিত 'মহাসৌন্দর্যের নৃত্যের আভাস' চক্ষে তুলে নিয়ে।

দার্শনিক বোধ হয় কল্পনা করেন নি বিতাড়িত কবির দৃষ্টিরহস্য।

'সুরদাসের প্রার্থনা'র পর হঠাৎ দেখি কাব্যমান নেমে এসেছে; ভাবালুতায় কবিচিত্ত সমাচ্ছন্ন। রোম্যান্টিক কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে কাব্যে কবির বিক্ষোভ-বেদনাই একান্ত হয়ে কাব্যে আনে কল্পনার বর্ণচ্ছটা, আবেগের প্রগাঢ়তা। তাই বেদনানিবিড় আকাঙ্ক্ষা 'সুরদাসের প্রার্থনা'কে মহার্ঘ সৃষ্টির স্তরে উন্নীত করেছিল। কিন্তু তার প্রবল নিষ্কাশন যখন ঘটল, তখন বেদনার ও কামনার সে-প্রগাঢ়তা আর রইল না, কল্পনাও ম্লান হয়ে এল। তাই 'সুরদাসের প্রার্থনা'র রসঘন কাব্যাভাসের পর পেলাম তিনটি দুর্বল কবিতা—'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', 'কবির প্রতি নিবেদন', ও 'পরিত্যক্ত'। চার দিনে রচিত এই তিনটি কবিতায় 'সুরদাসে'র আবেগ ও কল্পনার দ্যুতি অন্তর্হিত। আত্মরত ভাবাবেশ কাব্যকে দুর্বল করেছে। স্পর্শকাতর মন নিন্দার গ্লানিতে, সমালোচনার কঠোরতায় ক্লিষ্ট। সমকালীনদের নিকট হতে যে-অশ্রান্ত নিন্দা ও অপবাদ কবিকে সইতে হয়েছিল, তার মর্মান্তিক ইতিহাস সর্বজনবিদিত। দেশবাসীর কাছ থেকে নানা অবমাননার স্মৃতি নিয়ে জীবনের প্রান্তে এসেও কবিকে বলতে হয়েছে—"এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর-কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি।" (*১) এর ইতিহাস শুরু হয় 'কড়ি ও কোমল' থেকেই। তার প্রত্যুত্তরে 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন'-এ 'দুরন্ত আশা'র শ্লেষকঠোর ভঙ্গি

(*১) 'আত্মপরিচয়' (১৩৫২), পৃ ৯১।

নেই ; 'দেশের উন্নতি'র ব্যঙ্গমুখর ভাষা নেই। 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন'-এ (*১) রয়েছে নিন্দাকাতর কবির ভাবালু বিলাপ ; 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ আছে কোলাহলশ্রান্ত কবির বৃহত্তর জগতের মাঝে সকরুণ মুক্তি আকাজ্ক্ষা।

'কবির প্রতি নিবেদন' জীবনকোলাহল-ক্লিষ্ট, মুক্তিকামী কবির আত্ম-সমীক্ষণ। যশ-অপযশের পঙ্কস্রোতে, 'ধূলি আর কলরোলে'র আবর্তে জীবন যখন অবরুদ্ধ, তখন পেলাম, এই আত্মকেন্দ্রিক পরিবেষ্টনের বাহিরে বিরাট জীবনের কল্পনা—মানুষ যেখানে সুখেদুঃখে সৃষ্টি করছে 'নূতন জগৎ', রচনা করছে 'সুদূর ভবিষ্যৎ'—

দেখো, হোথা নদী-পর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগন-বুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।
... ...
দেখো হোথা নূতন জগৎ,
ওই কা'রা আত্মহারাবৎ ;
যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।
... ...
হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।
হেথা কবি তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল মাঝে ?

বৃহৎ জীবনের আকাজ্ক্ষা 'কড়ি ও কোমলে'র পর 'মানসী'তে প্রথম দেখা দিয়েছিল 'দুরন্ত আশা'য়। সেখানে দেখেছি তার শৃঙ্খলহীন, বিদ্রোহী রূপ। 'কবির প্রতি'-তে সে-কামনা ফুটে উঠল ভাবাবেশের মধ্য দিয়ে। তবু লক্ষণীয়, সৌন্দর্যপিপাসু কবির আত্মগত কাব্যের মাঝে মাঝে এই ভূমিগর্ভের আক্ষেপ। 'দুরন্ত আশা'র অগ্ন্যুদ্গারের পর 'কবির প্রতি'-তে দেখি তার মৃদু

(*১) 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' রচিত হয় 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রতি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের আক্রমণের উত্তরে।

আন্দোলন। উত্তরকাব্যে দেখব নূতন চেতনার অভিঘাতে আবার তার প্রবল বিস্ফোরণ।

'পরিত্যক্ত' কবিতার পটভূমিকা তখনকার বাংলার বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াপন্থী নব্যহিন্দুদের আর্যামি, তাঁদের সমস্ত প্রগতি ও সংস্কারের প্রতিকূলতা। এই নব্যহিন্দুদের অধিনায়ক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রজীবনীকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—"এই সময় চন্দ্রনাথ বসু, হিন্দুপত্নীর আদর্শ, হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ('সাবিত্রী', ১২৮৩)। এই সব প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র অনুরোধ আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষদিগকে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে, কারণ উভয়কেই তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন···। এ ক্ষেত্রে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক; নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই চন্দ্রনাথের অযৌক্তিক তর্কজালকে বারে বারে আঘাত করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা এককালে বাংলার যুবমনকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের বাণী তাঁহারাই শুনাইয়াছিলেন; কিন্তু কালে তাঁহারাই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া প্রগতির খরস্রোত-ধারায় শাস্ত্রের আবর্জনা পুঞ্জীভূত করিয়া বাঙালির সহজ গতিবেগকে প্রতিহত করিলেন।" (প্রভাত মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খণ্ড, পৃ ১৮৯-১৯১)। তাঁদের 'জীবনাদর্শের এমন জীবন্ত সমাধি' দেখে দুঃখ ও বেদনায় লিখলেন 'পরিত্যক্ত' কবিতা।

তার পর পুঞ্জীভূত গ্লানি নিয়ে পরদিনই আবার ফিরে এলেন মনোলোকে —রচিত হল 'ভৈরবীর গান'—ক্লান্তপক্ষ মধুকরের কুসুমবেষ্টন-গুঞ্জন। ভৈরবীর সিক্ত বেদনা দীর্ঘশ্বাসের মতো পরিব্যাপ্ত হল এ-কবিতাটিতে। আবার পূর্ব-প্রেমের স্মৃতির মধ্য দিয়ে, নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে, আত্মবিলাপ ফিরে এল; তারই মাঝে জেগে উঠল 'সংকটময় কর্মজীবনে'র বাসনা। পিছনে রয়েছে জীবনবিরুদ্ধ স্বপ্নময় পরিবেষ্টন, সদ্য-অতীতের 'প্রেম-বাহুঘেরা অশ্রুকোমল শিকলি'—

যারে ফেলিয়া এসেছি মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষবার ;
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।

সামনে রয়েছে প্রেমের নৈরাশ্যজড়তা ছিন্ন করে মহৎজীবনের আহ্বান ; নূতন জীবনের ব্রতসঙ্কল্প। অন্তরে রইল বিদায়ের বেদনা—

'ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে তুমি ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর গেয়ো না।

কিন্তু সম্মুখে প্রসারিত হল 'নবীন জীবনে'র সুদুর্গম পথ ; মানুষের দুঃখ-সুখের মধ্য দিয়ে সে-পথের কুটিল রেখা—

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।'

সমস্ত সুখস্বপ্ন ত্যাগ করে সে-পথ অনুসরণের সঙ্কল্প জেগে উঠল কবিতার শেষ স্তবকে—

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।'
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।'

'দুরন্ত আশা', 'কবির প্রতি নিবেদন', 'ভৈরবীর গান'—জীবনতরঙ্গে অবগাহনের যে প্রস্তুতি ছিল 'কড়ি ও কোমলে', 'মানসী'তে তা ফিরে ফিরে আসছে প্রবলতর, তীব্রতর কামনা হয়ে। একদিকে রইল কল্পলোকে দিব্যরূপিণীর পরিমলনিঃশ্বসিত, কিঙ্কিণীঝংকৃত, অনন্তপ্রসারিত ছায়াপথ, অন্যদিকে রইল জীবনকামী, বাস্তবাভিমুখী 'সংকটময়, পাষাণ-কঠিন' কর্মপথ। রবীন্দ্রকাব্যে দুই পথরেখাই সমান্তরালে ধাবিত হবে ; তারা বহুকাল থাকবে অসমন্বিত। বস্তুত, তাদের অসংযোগে যে-বিরোধ সৃষ্ট হবে, সে-বিরোধই

হবে একদিক থেকে 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র নিগূঢ় আখ্যান। এ-দ্বন্দ্বের স্বরূপটা কবি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন; তার প্রমাণ রয়েছে এই দুটি অসামান্য চিঠিতে। সুপরিচিত হলেও চিঠি দুটি উদ্ধৃতি দাবী করবে—

"মানসী সম্বন্ধে লিখেছ যে তার মধ্যে একটা 'Despair' এবং 'Resignation'-এর ভাব প্রবল; সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম ও পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না।......" (২৯ জানুয়ারী ১৮৯১, সবুজপত্র ১৩২৫)

আর একটি চিঠিতে কবি বলছেন—

"আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলীর স্কাইলার্ক, আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্ক। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে; সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর-একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে............; আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক করে অনুভব করে।" (সবুজপত্র ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা)

রবীন্দ্রমানসে বিরোধের স্বরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠল একটি বাক্যে— "আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" এই দুই বিরুদ্ধ ধারা আলোচ্য কাব্যত্রয়ীর মধ্যে সমান্তরালে প্রসারিত। রবীন্দ্রকাব্যে এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সমালোচকেরা দেখেছেন; সুতরাং কথাটা মৌখিক নয়। কিন্তু যতদূর জানি, এ-বিরোধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, তার ক্রমোদ্ভিন্ন প্রকাশ তাঁরা দেখেন নি। তাই, কী অনুভূতির মধ্য দিয়ে এ-বিরোধের বীজ

সঞ্চারিত, কোন্ পথে অঙ্কুরিত, কী অভিঘাতে তা পল্লবিত, শাখান্বিত—তার পূর্ণ ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত। সে ইতিহাসের সমগ্র রূপ ও রেখা আমাদের আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

'সুরদাসের প্রার্থনা'র পর, 'নিন্দুকের প্রতি' ও 'পরিত্যক্ত'তে কবি নব্য হিন্দুদের করুণ নিবেদন জানিয়েছিলেন। 'ধর্মপ্রচার' ও 'নবদম্পতীর প্রেমালাপ'এ ফিরে এল শাণিত শ্লেষ; চলতি ভাষার শক্তি তার মধ্যে সঞ্চালিত হল। আর্যপরিবারবর্গের ধর্মের নামে হিংস্র গোঁড়ামি, তাঁদের সমর্থিত ও প্রচারিত বাল্য-বিবাহের পরিণাম হল ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

তার পর দীর্ঘকাল—প্রায় এক বছর—কাব্যে এল বিরতি। মহিলা-সমিতির অনুরোধে কবি 'মায়ার খেলা' রচনায় ব্যাপৃত হলেন। 'মায়ার খেলা' অপরিণত রচনা; তাতে "নাট্য মুখ্য নয়, গীতই মুখ্য।" তবু এই উচ্ছ্বাস-প্রবল রচনায় 'মানসী'র সৌন্দর্যতৃষ্ণার ছায়াপাত ঘটল। নায়ক অমর হল কবিরই প্রতিরূপ: অমরের হৃদয়ে জেগেছে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা; জগতে সে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজে ফিরছে। কিন্তু 'মায়ার খেলা'য় পরিস্ফুট হল এই মরীচিকা সন্ধানের প্রতিবাদ। কবি পরোক্ষে স্বীকার করছেন নিজের অন্বেষণের ব্যর্থতা। অমর তার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে প্রকৃত প্রেমকে লাভ করল বাস্তবে শান্তার প্রেমে। প্রেমের ও সৌন্দর্যের স্বরূপসন্ধান 'মানসী' কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য; সে-সন্ধান 'মায়ার খেলা'য় অনন্ত প্রেমতৃষ্ণাকে অস্বীকার করে বাস্তব প্রেমকে গ্রহণ করল।

কাব্যের অন্বেষণা গীতিনাট্যে প্রতিদিষ্ট হল; কাব্যের নিবিড়তম কামনা প্রতিরুদ্ধ হল সচেতন মনে।

'মহিলা শিল্পমেলা'য় 'মায়ার খেলা' অভিনীত হল ১৫ই পৌষ ১২৯৫। ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ এলেন সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। প্রবাসপর্বে রচিত মানসীর তৃতীয় পর্যায়ের শেষ তিনটি কবিতা—'প্রকাশ-বেদনা', 'মায়া' ও 'বর্ষার দিনে'; সেই সঙ্গে রচিত হল প্রথম নাটক 'রাজা ও রানী'।

তিনটি কবিতায় অন্তর্গূঢ় কামনাই স্তবকে স্তবকে নিঃশ্বসিত। 'ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ' শিরায় শিরায় হাহাকার তুলেছে। 'চিরজীবনের বাসনা', 'চির-আকাঙ্ক্ষিত' মানসী মূর্তি আজও রইল দূরে; তার দিব্যপ্রতিমা আজও

রইল মরীচিকা হয়ে। প্রথম কবিতা দুটিতে কবির অধীর প্রতীক্ষা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে ; যেন বেদনার হোমানল চিরবাঞ্ছিত চিরপলাতক কল্পমূর্তির উদ্দেশে শিখা মেলেছে—

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে।
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে। ('প্রকাশ-বেদনা')

কল্পলোকে যে বার বার দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে, সে মানসী-মূর্তি আজও ধরা দিল না। বাস্তব প্রেমে সে মৃগতৃষ্ণা চির-অতৃপ্ত রয়ে গেল। মানসী রইল শুধু ছায়া হয়ে ; কায়ায় তাকে ধরা গেল না—

ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন,
এই যদি পাই এই ভুলে যাই
তৃপ্তি না মানে মন।
কতবার আসে কতবার ভাসে
মিশে যায় কতবার,
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার। ('মায়া')

দরশন-পরশন-অতীত এই মায়াবিনী 'ছায়া'মূর্তির জন্য উৎকণ্ঠ কামনা হাহাকারের মধ্যেই তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি আনল। এ-মূর্তির সন্ধানে কবির শ্রান্ত পদরেখা দেখলাম নানা পথের বাঁকে ; মরীচিকার আলোক দেখা দিল একাধিকবার—'নিভৃত আশ্রম'-এ, 'জীবন-মধ্যাহ্নে', 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়। কিন্তু যাত্রাপথের শেষে তীর্থদেবতা আজও রইলেন অলক্ষিত। ব্যাকুল চিত্ত তাঁকে খুঁজে ফিরল নিষ্ফল কামনা নিয়ে। সুদুর্গম পথ এখনও রইল সম্মুখে প্রসারিত, অনতিক্রান্ত।

॥ ৪ ॥

মানসীর সে অমর্ত্যপ্রতিমা ক্ষণকালের জন্য অন্তরে উদ্‌ভাসিত হল প্রায় আড়াই মাস পরে ; চতুর্থ ও অন্তিম পর্বের প্রথম রচনা, 'ধ্যান' কবিতায়

(২৬ শ্রাবণ, ১২৯৬)। এ কবিতার সুর হঠাৎ চমক লাগায়; তা একেবারে অভিনব; এর স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। বেদনা ও বিক্ষোভ আজ অকস্মাৎ অন্তর্হিত; হঠাৎ দেখি কবিচিত্ত আবিষ্ট অজ্ঞাতপূর্ব উপলব্ধির প্রশান্তিতে; হঠাৎ দেখি চির-পলাতকা ধ্যানের গভীরতায় ধরা দিয়েছে—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।

আজ 'নিষ্ফল কামনা'র অন্তর্দাহ নেই; 'সুরদাসের প্রার্থনা'র অনুতাপ-দগ্ধ কামনা নেই; 'ভৈরবী গানে'র নৈরাশ্য নেই; 'মায়া'র মরীচিকা-সন্ধান নেই। আছে দীর্ঘসাধনার পর ধ্যানলব্ধ মূর্তির বিস্মিত প্রকাশ। কামনার আলিঙ্গনে যে মানসচারিণী ধরা দিল না, ধ্যানের গভীরে তার দেখা পেলেন কবি। সমগ্র মানসী-কাব্যে এই অনুভূতির অশান্ত প্রতীক্ষা দেখেছি। আজ আনন্দে, বিস্ময়ে কবির প্রেম উচ্ছলিত—

তোমার পাই নে কূল,
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম,
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন সম।

দু'টি কথা লক্ষণীয়। প্রথমত, সুরদাসের প্রার্থনা পূর্ণ হল ধ্যান কবিতায়। সে-প্রার্থনা ছিল প্রকৃতির 'ভুবনমোহিনী মায়া' থেকে, 'মুরতি-স্রোত' থেকে বিমুক্ত করে 'বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধারে' দেবীপ্রতিমাকে উপলব্ধি করা; 'ধ্যান' কবিতায় তাঁকে বরণ করলেন 'বিশ্ববিহীন বিজনে' বসে। 'ধ্যান'-এ এ-কথা সুস্পষ্ট যে মানসীর ধ্যানমূর্তি উদ্দীপ্ত হল হৃদয়লোকে, 'আপনা-মাঝারে আপনার প্রেমে'। একান্ত লক্ষণীয়, সুরদাসের প্রার্থনানুযায়ী প্রকৃতিলোকে তাঁর আসন পাতা হল না। ধ্যানমূর্তি রইল

'হৃদয়-আকাশে দেহহীন জ্যোতি' বিকীর্ণ করে। এ-বিশ্ববিহীনতা সম্ভত থাকবে মানসীর 'পূর্বকালে' ও 'অনন্তপ্রেম' কবিতা পর্যন্ত। তার পর ধীরে ধীরে ধ্যানের নিঃসীমতা অতিক্রান্ত হয়ে মানসী-কল্পনা পরিকীর্ণ হবে প্রকৃতির রূপে ও শোভায়।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখা প্রয়োজন এ-অনুভূতি চরম নয়, দীর্ঘস্থায়ীও নয়। পুনরুক্তি করি, কবির চলার পথের বাঁকে নানা উপলব্ধি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে ও যাবে। তবু একেবারে বিলীন হবে না। মনের গহনে সঞ্চিত রইল তাদের রেশ, তাদের দ্যুতি। যে বেদনা ও নিরাশার কালো মেঘ রয়েছে মানসীর সমগ্র কাব্যাকাশ ঘিরে, কনকোজ্জ্বল আভা তাকে ক্ষণিক দীপ্ত করবে একাধিকবার। ঘন মেঘের আঁধার তাতে ঘুচবে না। কিন্তু সে আলোও রইল মেঘের বুকে লুকিয়ে।

মানসীর অন্তিম পর্বে পাই মোট সতেরোটি কবিতা—'ধ্যান' (২৬ শ্রাবণ, ১৮৮৯), 'পূর্বকালে' (২ ভাদ্র, ১৮৮৯), 'অনন্ত প্রেম' (২ ভাদ্র, ১৮৮৯), 'ক্ষণিক মিলন' (৯ ভাদ্র, ১৮৮৯), 'আত্মসমর্পণ' (১১ ভাদ্র), 'আশঙ্কা' (১৪ ভাদ্র), 'উপহার' (৩০ বৈশাখ, ১৮৯০), 'ভালো করে বলে যাও' (৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০), 'মেঘদূত' (৮ জ্যৈষ্ঠ), 'অহল্যার প্রতি' (১২ জ্যৈষ্ঠ), 'গোধুলি' (১ ভাদ্র), 'উচ্ছৃঙ্খল' (৫ ভাদ্র), 'আগন্তুক' (৫ ভাদ্র), 'বিদায়' (আশ্বিন, ১৮৯০), 'সন্ধ্যায়' (৯ কার্তিক), 'মৌনভাষা' (১০ কার্তিক), 'আমার সুখ' (১১ কার্তিক, ১৮৯০)।

'ধ্যান' কবিতার দিন-ছয়েক পরে একই দিনে পেলাম দুটি কবিতা, 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম' (২ ভাদ্র, ১৮৮৯)। কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এ দুটি কবিতার গভীর গুরুত্ব। এদের মধ্য দিয়ে মানসী-কল্পনা একটি নতুন স্তরে পৌঁছবে। এ কথার পূর্ণ উপলব্ধির জন্য কিছুটা পূর্বানুস্মৃতি প্রয়োজন।

মানসী-কল্পনার উৎসসন্ধানে আমরা কবির বাল্যস্মৃতির সাক্ষ্য নিয়েছিলাম। দেখেছিলাম রহস্যে ঘেরা পৃথিবী তার 'রূপ রস গন্ধ' নিয়ে বালক-কবিকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল; কবি জেনেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর 'নাড়ী-চলাচলের যোগ'। 'সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধ-পরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে' তাঁকে সঙ্গদান করেছিল। 'কড়ি ও কোমলে' দেখেছিলাম বাল্যের এই অর্ধপরিচিত সত্তা প্রথম যৌবনে, 'ক্ষণিক মিলন'-এ

'দুই অচেনার চেনাশোনা'কে স্মরণে এনেছিল, বিস্মৃত-বাসনাকে জাগিয়ে 'জগৎ-কমলবনে কমলাসনা'র স্বপ্নমূর্তি এঁকেছিল। তার পর 'মানসী' কাব্যে আর্ত অন্বেষণের মাঝে 'ধ্যান' দেখা দিল 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি'। বিচিত্র অনুভূতির অভিঘাতে মানসী-কল্পনা 'ধ্যান' কবিতায় এক বিশিষ্ট স্তরে এসে পৌঁছল।

তার পর 'পূর্বকাল' ও 'অনন্ত প্রেম' মানসী কল্পনাকে আর এক স্তর এগিয়ে নিয়ে গেল।

'ধ্যান'-এ অন্তরের বিজনে 'মানসী'কে পাবার পরেই কবিকল্পনা প্রক্ষিপ্ত হল 'অসীম অতীতে'। কবির মনে হল অনাদিকাল থেকে অনন্ত জন্ম-স্রোতের মধ্য দিয়ে মানসীর সঙ্গে তাঁর প্রেমলীলা চলে এসেছে; সে-স্রোতে তাঁদের বিরহ-মিলনের প্রেমস্মৃতি প্রবাহিত। অসীম কালের পটভূমিকায় প্রতিফলিত হল জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমকল্পনা। এই অনুভব জাগল যে 'অনাদি বিরহ-বেদনা' নিয়ে 'সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে' কবি রয়েছেন তাঁর মানসীর প্রতীক্ষায়—

ছিনু বুঝি বসে কোন এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়,
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়।

'পূর্বকালে'র এ অনুভূতি আরও গভীর ও বিস্তীর্ণ হল সেইদিনই লেখা 'অনন্ত প্রেম' কবিতায়—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

মানসী-কল্পনার ক্রমোন্নত বিকাশে এ অনুভূতি মহার্ঘ। এই জন্ম-জন্মান্তর প্রবাহিত প্রেমকল্পনার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বাল্যের রহস্যানুভূতি, 'বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গ' এবং যৌবনের 'ক্ষীণালোকে মনে পড়া' 'দুই অচেনার চেনাশোনা'। রবীন্দ্রকাব্যে ক্রমাভিব্যক্ত সৌন্দর্যকল্পনায় এরা বিশিষ্ট স্তরনির্দেশ আনল। বাল্যের অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গস্মৃতি 'কড়ি ও কোমলে' এই চেতনাই জাগাল যে বহুজন্ম পূর্বে কোন 'কুহেলিকা-ঘেরা দেশে', 'সন্ধ্যা-সাগরের কূলে' জন্মান্তরের প্রেয়সীর সঙ্গে কবির প্রথম চেনা-

শোনা' ঘটেছিল। 'কড়ি ও কোমলে' এ অনুভূতি ক্ষীণ আভাস মাত্র দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিল। মানসীর 'পূর্বকাল' ও 'অনন্ত প্রেম'-এ এই অনুভূতিই এবার কল্পনায় সম্প্রসারিত হল। 'অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গ'ই ক্রমবিবর্তিত হয়ে দেখা দিল 'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে'—

অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে,
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

সুতরাং স্তরনির্দেশ করে বলা যেতে পারে : বাল্যের রহস্যনিবিড় অনুভূতি **মানসী কল্পনার** ভূমিগর্ভে **প্রাথমিক স্তর**। 'কড়ি ও কোমলে', স্মৃতির ক্ষীণালোকে, অনুভূতি উন্নীত হল কল্পনার পর্যায়ে—প্রথম 'মানসী'র অস্পষ্ট-মূর্তি আভাসিত হল। মানসী-কল্পনার **দ্বিতীয় স্তর** পেলাম।

মানসীকাব্যে কামনা ও হতাশার বিরোধের মধ্য দিয়ে, ব্যাকুল অন্বেষণা ও ক্ষণিক উপলব্ধির বিচিত্র ইতিহাসের মধ্য দিয়ে 'ধ্যান' কবিতায় পৌঁছলাম। তার পর 'পূর্বকালে' ও 'অনন্তপ্রেম'-এ পেলাম মানসীকল্পনার **তৃতীয় স্তর**। যুগ-যুগান্তরের প্রেমকল্পনা, অনাদিকাল- ও অনন্তজীবন-প্রবাহিত 'বিরহ-মিলন-কথা' মানসীকল্পনাকে নিয়ে এল এই তৃতীয় স্তরে। এই স্তরেই কবিমানসে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হল 'সোনার তরী'র 'মানস-সুন্দরী' কল্পনার, 'চিত্রা'র জীবন-দেবতা কল্পনার বীজ। এ-কথার উদ্ব্যক্তি একান্ত প্রয়োজন যে এ-দুটি কল্পনার প্রথম পটভূমিকা 'মানসী' কাব্যের 'পূর্বকাল' ও 'অনন্তপ্রেম'।

'মানসী'কল্পনার তিনটি বৈশিষ্ট্য এ-দুটি কবিতায় লক্ষণীয়। প্রথমত, 'ধ্যানে' মানসী মূর্তিকে লাভ করার পরেই অন্তরে প্রশ্ন জেগেছে—

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিনে এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?

অনন্ত সৌন্দর্য যুগে যুগে কবিদের ধ্যানসাধনার লক্ষ্য। সে-মূর্তি কি বাস্তবে কোথাও কখনও জন্ম নেয় নি? 'পূর্বকাল'-এ এ প্রশ্ন দেখা দিয়েই বিলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু এই প্রশ্নই আবার ফিরে আসবে 'সোনার তরী'র 'মানস-সুন্দরী'-তে—'সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা?' শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কল্পনার প্রবণতা আত্মমুখ অনুভূতিকে নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রতিচিত্রিত করা। তার ক্ষীণরেখা মাত্র এ-কবিতায় পেলাম। এই প্রবণতাই রোম্যান্টিক কল্পনাকে নিয়ে যায় প্রতীকের আশ্রয়ে। আমাদের আলোচ্য কাব্যত্রয়ীতে এ প্রবণতার সার্থকসৃষ্টি বিরল। তথাপি অদূরেই রয়েছে এই প্রতীকাশ্রয়ী কল্পনার একটি দৃষ্টান্ত—'অহল্যার প্রতি' কবিতা।

দ্বিতীয়ত, 'মানসী' এতকাল ছিল একান্ত প্রাতিস্বিক কল্পনা। 'অনন্তপ্রেম'-এ 'মানসী' প্রতিভাত হল বিশ্বের সমস্ত প্রেমের সমস্ত বিরহ-মিলনের আদি-উৎসরূপে, 'চিরদিবসের প্রেমে'র প্রতীক হয়ে। কল্পনার এই অভিক্ষেপ প্রথম দেখা দিল 'অনন্ত প্রেম'-এ—

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল প্রেমের গীতি।

কিন্তু তৃতীয় বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ। 'ধ্যান' কবিতার আলোচনায় দেখেছি সুরদাসের প্রার্থনার অনুগামী হয়ে মানসীর আবির্ভাব ঘটল ধ্যানের নিবিড়তায়, 'হৃদয়-আকাশে'। সে-আবির্ভাব বিশ্ববিহীন বিজনে; প্রকৃতির ভুবনমোহিনী মায়া' থেকে সে-মূর্তি বিচ্ছিন্ন।

'পূর্বকালে' ও 'অনন্তপ্রেম'-এ এই প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন কল্পনাই সন্তত রইল। অতীতের অনন্তপ্রেমের স্মৃতিকে বহন করে, কালের তিমিররজনী ভেদ করে, যে-মূর্তি উদিত, তা এল—'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে'। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে, তার অজস্র 'মুরতি-স্রোতে' কবি তাঁর মানসীকে দেখলেন না। কল্পনা রইল ধ্যানাবিষ্ট অন্তরলোকে আবদ্ধ।

এ-সূত্রে একটি কথা একান্ত কৌতূহল জাগায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 'ধ্যান', 'পূর্বকালে' ও 'অনন্তপ্রেম'—এই তিনটি কবিতায় মানসী

সম্পর্কে যে চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে তা 'আকাশ'কে আশ্রয় করে। 'ধ্যান' কবিতায় পাই দুটি চিত্রকল্প—

'তুমি যেন ওই আকাশ উদার',

এবং,-'যতদূর দেখি দূরদিগন্তে তুমি আমি একাকার'।

'অনন্তপ্রেম'-এ মানসী মূর্তি অবশেষে দেখা দিল—

'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে'।

'আকাশ', 'দূরদিগন্ত', 'ধ্রুবতারকা'—প্রকৃতির মূর্তি-স্রোত-বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্প—বিমূর্ত, স্থিতিজ্ঞাপক, রূপ-বিশ্লিষ্ট। এ-'আকাশ' ও 'দূরদিগন্ত' অন্তরাকাশেরই প্রতিরূপ। চিত্তলোকের বিশ্ববিহীন বিজনতাই সুস্পষ্ট এই তিনটি শব্দে। সুরদাসের প্রার্থনাকে সার্থক করে 'হৃদয়-আকাশে'ই জাগল মানসীর 'দেহহীন জ্যোতি'।

সুতরাং 'ধ্যান', 'পূর্বকালে' ও অনন্ত প্রেম'—তিনটির কবিতায় অসীম কালের পটভূমিতে প্রেমকল্পনা মানসীকে নিয়ে গেল নতুন স্তরে; মানসী-কল্পনা ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করল। কিন্তু পরের কবিতায় ('আশঙ্কা', ১৪ ভাদ্র) দেখি কবির আত্মসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এল আশঙ্কাঃ এই প্রকৃতিবিমুখ আত্মমুখী কল্পনা—একি ভালো? ঔৎসুক্যকর কবির এ-প্রশ্ন—

কে জানে একি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে একি ভালো?
... ...
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারিধারে;
কোথায় তারা সকলি আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে একি ভালো?"

মানসী-কাব্যের অন্তরিতিহাসে 'আশঙ্কা' কবিতা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য দাবী করবে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে 'অনন্ত প্রেম' পর্যন্ত যে

প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন কল্পনা সম্ভত দেখেছি, 'আশঙ্কা'য় সে-সম্পর্কে সংশয় জাগল। শুধু প্রকৃতিবিচ্ছেদই সংশয় ও আশঙ্কার হেতু নয়; এ-বোধেরও আভাস রয়েছে যে মানসী-কল্পনা কবিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে জীবনের সঙ্গেও এনেছে বিচ্ছেদ—

ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ,
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল,
আমার চারিধারে,

কবির আশঙ্কা, আজ সমস্ত বিলুপ্ত মানসীর ধ্যানকল্পনায়। এই আশঙ্কাই কবিকে ফিরিয়ে আনবে শূন্যচারী কল্পনা থেকে প্রকৃতির বক্ষে, ধরিত্রীর অঙ্কে। তার সাক্ষ্য বহন করছে পরের তিনটি কবিতা—'উপহার', 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'।

'আশঙ্কা'র পর কাব্যে আবার এল দীর্ঘ ছেদ—প্রায় নয় মাস কোন কবিতা নেই। রবীন্দ্রজীবনীতে দেখি 'গদ্য রচনাও প্রায় চোখে পড়ে না'। 'বিসর্জন' নাটক শেষ হল বৈশাখ, ১২৯৭। তার পর রাষ্ট্রনীতির উত্তেজনার মুহূর্তে রচিত হল 'মন্ত্রীর অভিষেক'। "কয়েক দিনের মধ্যে কবিকে দেখি শান্তিনিকেতনে; একলা দোতলার বাড়িতে আছেন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক…। (রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ ২২১)। বহুকাল পরে লিখলেন 'উপহার' (৩০ বৈশাখ, ১২৯৭; ১৮৯০), 'মেঘদূত' (৮ জ্যৈষ্ঠ), 'অহল্যার প্রতি' (১২ জ্যৈষ্ঠ)।

'উপহার' রচিত কাব্যের ভূমিকা-স্বরূপ; কবিতাটির স্থাপনাও কাব্যের প্রথমে। গদ্যে বা পদ্যে 'উপহার'ই একমাত্র রচনা যেখানে মানসী-কল্পনার সুস্পষ্ট, সুসঙ্গত, ক্রমবিবর্তিত ইতিহাস পাওয়া যায়। কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যদি বলা যায় 'উপহার' কবির সৌন্দর্যকল্পনার একান্ত যৌক্তিক, প্রাকরণিক বিবরণী—কবির অন্তর্দর্শনের ও মননস্বচ্ছতার নিদর্শন।

প্রথম স্তবকে পাই সৌন্দর্যকল্পনার উৎসমুখ। স্পষ্টরেখায় পেলাম কি-ভাবে বিশ্বের রূপতরঙ্গ কবিচিত্তকে উতলা করেছে, 'বিচিত্র দুরাশা' জাগিয়েছে—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত;

বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।

এ স্তবকের শেষে দেখি দুরাশার স্বরূপটা—

এ-চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

বোঝা গেল, 'দুরাশা' হল 'অসীমের সীমা' রচনা—অর্থাৎ, জগতের তরঙ্গাঘাতের বিচিত্র কলরোলে যে-অনন্তসৌন্দর্যের আকৃতি জেগেছে কবিচিত্তে, তাকে সুস্পষ্ট মূর্তিতে অবলোকন করা; তাই আশায়, ভাষায় ও প্রেমে কবি গড়ে তুলছেন তাঁর মানসী-প্রতিমা।

'অসীমের সীমা' রচনার প্রয়াস দেখেছি এ-কাব্যে, প্রেয়সীর মধ্যে 'মানসী'র সন্ধানে; 'প্রতিমা' সৃষ্টির প্রয়াস দেখেছি 'নিভৃত আশ্রম' থেকে 'অনন্ত প্রেম' পর্যন্ত এবং অব্যবহিত পরে দেখব 'মেঘদূত'-এ অহল্যার প্রতি'-তে।

'উপহার' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক প্রথম স্তবকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা—'বিচিত্র দুরাশা'রই সম্প্রসারিত ইতিহাস—

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য,
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ-মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।

দুরাশার স্বরূপটি আরও পরিস্ফুট হল দ্বিতীয় স্তবকে। বিশ্বপ্রকৃতির রূপরসগন্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গীহারা কণিকা; তারা কবির চিত্তে আঘাত করল; কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করে বিরহীভাবনা জাগাল; তার পর ধীরে ধীরে 'মর্মের কামনা' মানসী মূর্তিতে রূপ নিয়ে দাঁড়াল। স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হল মানসী-কল্পনার ক্রমোন্নত প্রকাশের বিচিত্র রেখা।

আর একটি দিক থেকে 'উপহার' কবিতাটি গুরুত্ব পাবে। 'আশঙ্কা'র পর দীর্ঘ নয় মাস পরে যখন এ-কবিতাটি পেলাম তখন দেখি প্রকৃতির আসন কাব্যে আবার প্রসারিত। বাল্যের ও যৌবনের সৌন্দর্যানুভূতির মূলে ছিল যে প্রকৃতি-চেতনা সৌন্দর্যকল্পনার উৎসরেখাঙ্কনে কবি বিশ্বের সেই 'গন্ধ গান দৃশ্যে'ই ফিরে গেলেন। 'আশঙ্কা'র সংশয় কি কবিকে এই কথাই স্মরণ করালো যে মানসী-কল্পনার মূলে ছিল প্রকৃতিরই 'গন্ধ গান দৃশ্য'? যাই হোক, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে 'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে মানসী-কল্পনায় ও প্রকৃতিচেতনায় যে বিরোধ বা বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল, 'আশঙ্কা'র মধ্য দিয়ে 'উপহার'এ সে-বিরোধ অন্তর্হিত হল। মানসীকল্পনার উৎস সন্ধানে এই কথাই উদ্ব্যক্ত হল যে সে কল্পনা উৎসারিত প্রকৃতির নানা সৌন্দর্যতরঙ্গ-আঘাত থেকে।

পরবর্তী দুটি কবিতায়, 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'-তে দেখা দিল নিবিড় প্রকৃতি-চেতনা। 'মেঘদূত'-এ কবিকল্পনা 'নবমেঘ-পক্ষ 'পরে' প্রকৃতির রূপলোকে ভ্রাম্যমাণ; 'অহল্যার প্রতি'-তে কবির অনুভূতি সম্প্রসারিত 'ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক-প্রবাহে'।

'মেঘদূত' 'উপহার'-এর সপ্তাহকাল পরে রচিত। 'বিরহী ভাবনা' 'অন্তঃপুরবাস' ছেড়ে মূর্তিমতী 'মর্মের কামনা' হয়ে দেখা দিল 'মেঘদূত'-এ। 'ধ্যান' ও 'মেঘদূত'-এর মধ্যবর্তী কবিতা 'উপহার' একদিকে 'ধ্যান'-এর অনুভূতিকে সমাহৃত করল; অন্যদিকে তার ছায়ারেখা পড়ল 'মেঘদূত'-এর সৌন্দর্যকল্পনায়. 'বিরহিণী প্রিয়তমা'র মূর্তিসৃজনে।

'মেঘদূত' কবিতার আলোচনায় আসা যাক।

রোম্যান্টিক কল্পনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আমরা রবীন্দ্রকাব্যে একাধিকবার লক্ষ্য করব: রবীন্দ্রমানসে কোন নিবিড় অধ্যাত্ম অনুভূতি প্রথম রূপ নেয় আত্মমুখ কল্পনায়। তার পর কিছুকাল মনের গহনে চলে তার সমাকলন; শেষে একদিন সে-অনুভূতি জেগে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক বিষয়মুখ সৃষ্টিতে। কল্পনারীতির এ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রয়েছে 'মেঘদূত'-এ ও 'অহল্যার প্রতি'-তে। একান্ত লক্ষণীয়, 'ধ্যান'-এর আত্মিক অনুভূতি, 'অনন্ত প্রেম'-এর অনাদিকালের হৃদয়উৎসারিত প্রেম, দীর্ঘকাল পরে 'মেঘদূত' কবিতায় বিষয়-মুখ কল্পনায় রূপ নিচ্ছে। 'অনন্ত প্রেম'-এর 'অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা' চিরবিরহের প্রতীক 'মেঘদূত' কাব্যেবিষয়াশ্রিত

রূপ খুঁজছে। এমনি বিচিত্র পথে কবিমানস তার পদচিহ্ন রেখে চলে কবিতা থেকে কবিতান্তরে; গেঁথে চলে বিশেষ ভাবকল্পনার সূত্রে আপাতবিচ্ছিন্ন কবিতা।

'মেঘদূত'-এ দুটি ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রথম, কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন সর্বমানবের বিরহ। সে-বিরহগাথার প্রবাহ এসে লাগল এ-যুগের কবির অন্তরে; কালের ব্যবধান মুছে গেল। নিত্যকালের মানুষের বিরহকল্পনায় 'ভারতের পূর্বশেষের কবি' সর্বকালের সঙ্গে একাত্ম হলেন।

দ্বিতীয় ভাবকল্পনা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষার তিমিরঘন পরিবেশ চিরবিরহের বেদনাকে জাগিয়ে তুলে, এই নিত্যকার পরিচিত পৃথিবীর উপর মেঘের যবনিকা টানে; এক রহস্যময় রূপলোকের আভাস আনে। কবির মন উত্তীর্ণ হয় বাস্তবলোক থেকে 'চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরী'তে।

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই কথাটি যে এই দু'টি ভাবকল্পনার সম্প্রসার ঘটেছে প্রকৃতির রূপৈশ্বর্যের মাঝে। বর্ষার 'নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া' কবিতাটির প্রথমাংশে নিবিড় হয়ে উঠেছে। সর্বমানবের বিরহ 'মেঘদূত' কাব্যে নিঃশ্বসিত—এই ভাবনাটি দীর্ঘকাল পরে কাব্যে আনল প্রকৃতির সুদীর্ঘ চিত্রকল্প—

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি বিরহিণী প্রিয়া?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তরে বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনা সম; শিখরেতে উঠি

সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

'আশঙ্কা'র পরে প্রকৃতিকল্পনার এ পুনরাবির্ভাব বিশেষ কৌতুকাবহ। সুরদাসের প্রার্থনার পর, 'ধ্যান' থেকে 'অনন্ত প্রেম' পর্যন্ত যে প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা দেখেছি, 'মেঘদূত'-এ তা বিলুপ্ত; প্রকৃতির রূপলোক কাব্যে আবার উন্মুক্ত হল।

'মেঘদূত' কবিতার শেষাংশে দেখি 'মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে' আসীনা কবি-কল্পনা দেশদেশান্তরে পর্যটন করে বিশ্বের নরনারীর প্রেমলীলা অবলোকন করে অন্তিম দুটি স্তবকে উত্তীর্ণ হল—

কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি; সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া, করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাস-পুরী অমর-ভুবনে।

'মেঘদূত' কবিতা রচনার গূঢ় প্রেরণা, কবিকল্পনার নিভৃত উৎস প্রচ্ছন্ন এই ক'টি চরণে। 'ধ্যান'-এ সৌন্দর্যের যে-আত্মগত উপলব্ধির প্রকাশ দেখেছি, 'মেঘদূত' কাব্যে সে-দিব্য উপলব্ধিরই প্রতিচ্ছায়া দেখলেন রবীন্দ্রনাথ—

... ... সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী অমর-ভুবনে।

এ-স্তবকের শেষে সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেখি—

লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

অবচেতনে সক্রিয় 'ধ্যান'-এর অনুভূতিই রূপ নিল বিরহিণী প্রিয়ার মূর্তিকল্পনায়। সে-অনুভূতি 'অনন্ত প্রেম'-এ দেখা দিয়েছিল প্রেমের আদিউৎস হয়ে; 'মেঘদূত'-এ মূর্ত হল 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি' হয়ে।

অন্তিম স্তবকটি আরও গভীর অর্থময়; সেখানে পেলাম এ-কল্পনার চরম পরিণতি। সম্মোহ কাটতেই কবি বুঝলেন 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি'র এ-দর্শন, 'বিরহের স্বর্গলোকে' এ-উত্তরণ একান্ত ক্ষণিকের। ক্ষণপ্রভার চকিত

আলোকের মতো তা উদ্‌ভাসিত হয়েই আবার বিলুপ্ত হল ঘনায়মান আঁধারে। 'ব্যবধান' দুস্তর হল—

আবার হারায়ে যায়—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকুল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?

'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?' এ-অভিশাপে সৌন্দর্য-তৃষিত কবির বেদনাঘন, গৌরবময় অধিকার ; এ-'ব্যবধান' মানসীকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। এই অভিশপ্ত ব্যবধান রয়েছে রোম্যান্টিক কল্পনার অন্তর্মূলে ; রোম্যান্টিক কাব্যে বারবার দেখা দিয়েছে এই দিব্যদৃষ্টির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান। এই আক্ষেপই রয়েছে কবি ওয়র্ডস্বর্থের 'Immortality Ode'এ—

Whither is fled the visionary gleam ?
Where is it now, the glory and the dream ?

রয়েছে কোলরিজের 'Dejection' Odeএ পরিকীর্ণ হয়ে, কবির আর্ত-স্বীকৃতি ফুটে উঠেছে সে কবিতায়—সমস্ত দিব্য কল্পনার মূলে আনন্দ-উৎসকে তিনি হারিয়েছেন ; তাই তাঁর চোখ থেকে মুছে গেছে দিব্য আলোকের দ্যুতি—

This light, this glory, this fair luminous mist,
This beautiful and beauty-making power !

এই বিলাপই প্রসারিত শেলীর 'Alastor' কবিতায়। 'Alastor'এর কবি অসীম একাকিত্বে খুঁজে ফিরল তার স্বপ্নে-দেখা আদর্শ-প্রতিমা, 'whose voice was as the voice of his own soul'—

He eagerly pursues
Beyond the realms of dream that fleeting shade ;
.........Lost, lost, for ever lost,
In the wide pathless desert of dim sleep
That Beautiful shape.........

এই সন্ধান ও উপলব্ধির আবির্ভাব ও বিলুপ্তির আরও পরিণত মননসমৃদ্ধ প্রকাশ শেলীর 'Hymn to Intellectual Beauty.' সেখানে সুস্পষ্ট রেখায়

ফুটে উঠেছে সৌন্দর্যসত্তার পলাতকা দীপ্তি, তার 'inconsistent wing', তার 'inconstant glance.' দ্বিতীয় স্তবকে এল কবির ক্ষোভ ও বেদনা—

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form—where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast vale of tears, vacant and desolate?

এই 'হারিয়ে যাওয়াই' সৌন্দর্য-সন্ধানী রোম্যান্টিক কল্পনার অন্তরের কথা, "Lost, lost, for ever lost."

এই 'নিরন্তর হারানো'র খেদ রয়েছে কীট্সের কাব্যেও। তাঁর 'Nightingale' কবিতায় রয়েছে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মন্ত্রে সৌন্দর্যের উৎস কল্পনা। সেখানেও ক্ষণিকের সম্মোহ জাগিয়েছিল দিব্য অনুভূতি; সৃষ্টি করেছিল বিস্ময়কর দুটি লাইন বিশ্বসাহিত্যে যার তুলনা বেশি নেই—

.........the same that oft-times hath
Charmed magic casements opening on the foam
Of perilous seas in faery lands forlorn.

তার পর কল্পনার ইন্দ্রজাল যখন ছিন্ন হল তখন কীট্সের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের এই বেদনাঘন আক্ষেপই শুনি—

'Was it a vision or a waking dream?
Fled is that music—do I wake or sleep?'

'মেঘদূত' রচনার চারদিন পরে পেলাম 'অহল্যার প্রতি' (১২ জ্যৈষ্ঠ)।

'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে কবিমানসের প্রতীক-প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি। পূর্বে বলেছি, আত্মমুখ অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ কবিচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা। কবি যখন তাঁর বেদনা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ-অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেন, তখন পূর্ণতর-প্রকাশ-বাসনায় মন ঝোঁকে প্রতীকের দিকে। অব্যক্ত অনুভূতির বেদনা প্রতীককে সৃষ্টি করে; প্রতীক আনে সীমাহীন ব্যঞ্জনা। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় প্রতীকাশ্রয়ী কল্পনার প্রথম সার্থক রূপায়ণ দেখেছি। তার পর 'ধ্যান'-এর উপলব্ধির অভিক্ষেপ লক্ষ্য করেছি 'পূর্বকালে'-তে ও 'অনন্ত প্রেম'-এ। 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'-তে কল্পনা বিষয়মুখ হল, প্রতীকের আশ্রয় পেল।

'অহল্যার প্রতি'-তে 'মেঘদূত'-এর মূলভাব অব্যাহত, কিন্তু কল্পনা সম্পূর্ণ বিপরীতগামী। 'মেঘদূত'-এ দেখেছি সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি কল্পনা; সে-কল্পনা প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য পরিক্রমণ করে উত্তীর্ণ হল 'কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে'। কিন্তু 'অহল্যার প্রতি'-তে কল্পনা নিবদ্ধ হল ধরাতলে; অহল্যা হলেন ধরিত্রীর অঙ্কশায়িনী অনন্ত-সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। 'মেঘদূতে' পেলাম অমর্তলোকে বিরহিণী সৌন্দর্যকল্পনার প্রতীক; 'অহল্যার প্রতি'-তে দেখি সে সৌন্দর্য-কল্পনার মর্তলোকব্যাপী কল্পরূপ। 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' সৌন্দর্যের দুই আপাতবিরুদ্ধ কল্পনা।

প্রথম পদগুচ্ছে দেখি ভূমিগর্ভে অহল্যার অভিশাপ-নিদ্রা—

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য, মৌনমূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা মাঝে?

তার পর শাপ-সুপ্তি কাটলে 'অহল্যা' জেগে উঠলেন—

·········দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র; ·········

'মুক্তকৃষ্ণকেশপাশলুণ্ঠিতা', 'নগ্নগৌরদেহা' অহল্যা ধরণীর বক্ষে আবির্ভূত হলেন—

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশি উঠিয়াছে ফুটে

একবৃন্তে। বিস্মৃতিসাগর-নীল-নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।

অহল্যার এ-বর্ণনা মানসীর প্রথম মূর্ত, বিষয়াশ্রিত রূপকল্পনা। ধরিত্রী-কুমারী অহল্যার জাগরণ ধরিত্রীর অঙ্কশায়িনী সৌন্দর্যমূর্তিরই জাগরণ। মানসীর দিব্য-অনুভূতি, তার রূপ ও রেখা সুস্পষ্ট কল্পনায় দেখা দিল অহল্যার মূর্তিতে।

সুতরাং মানসীকল্পনার ক্রমপরিণতির ইতিহাসে 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি মূল্যবান। 'মেঘদূত' পর্যন্ত সে-কল্পনা ছিল ধ্যানগম্য অনুভূতিতে, বিরহের স্বর্গলোকে। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় তার সূচনা, 'ধ্যান'-এ তার আবেগস্তম্ভিত প্রকাশ, 'মেঘদূত'-এ তার উত্তুঙ্গ প্রসার। 'অহল্যার প্রতি'-ই প্রথম কবিতা যেখানে এ-বোধ প্রথম জাগছে যে মানসীর আসন শুধু হৃদয়ের গহনলোকেই নয়; 'সৌন্দর্যের সে-আদিসৃষ্টি' শুধু ঊর্ধ্বলোকে অলকার বিলাসপুরীতেও নয়; ধরণীর অঙ্কে সে লীনা, বিশ্বের মাঝে তার আবির্ভাব, বিশ্বের সাথে তার চিরপরিচয়—যে-পরিচয় এতকাল ছিল সুপ্ত; যে-পরিচয় বিস্ময়ে আজ জেগে উঠেছে। শেষ স্তবকের শেষ ক'টি চরণে এই বিস্মিত জাগরণের কথাই বলেছেন কবি—

······বিস্মৃতিসাগর-নীল-নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্বমাঝে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি! অপার রহস্যতীরে
চিরপরিচয় মাঝে নব পরিচয়!

'অহল্যার প্রতি' মানসীর আত্মগত, বাস্তববিরুদ্ধ কল্পনাকে জগৎ ও জীবন-প্রবাহে মিলিত করার প্রথম প্রয়াস। কঠোর জীবনবোধের সংঘাত পরে এ-প্রয়াসকেই পূর্ণপরিণত করবে চিত্রাকাব্যে; দেখব এক সংহত, সমাকলিত উপলব্ধির প্রকাশ—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী,
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

'অহল্যার প্রতি'-তে মানসীকল্পনা আরও একটি স্তর অতিক্রান্ত হয়ে পৌঁছল চতুর্থ স্তরে।

কবিতাটির প্রথমেই কবির বাস্তবদৃষ্টিপ্রবণতার দেখা মেলে বহুকাল পরে। 'সহস্র পথে, সহস্র আকারে' উৎসারিত জীবনপ্রবাহের দীর্ঘ বর্ণবহুল কল্পনা দেখি। বাস্তবচেতনায় জেগে উঠেছে 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা', সহস্রধারায় উৎসারিত জীবনকল্লোলধ্বনি। কবির কুতূহলী প্রশ্ন, তার অশান্ত স্পন্দন কি অহল্যার অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে অন্তরে প্রবিষ্ট হত ?—

………দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন-কলহ
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন গর্জন
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণে ?

ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ?……

এই জীবননিষ্ঠ চেতনার মধ্য দিয়ে নভোচারিণী, নন্দনবাসিনী মানসীকল্পনা ধরণীর বুকে পুনর্জন্ম নিল। এই অনুভূতিই কবিচিত্তে উদিত হল, যে-সৌন্দর্যসত্তা আবির্ভূত হয়েছিল ধ্যানের বিজনতায়, কল্পিত হয়েছিল সৌন্দর্যের অলোকধামে, তা সুপ্ত ধরণীরই অঙ্কে, বাস্তবের মাঝে। অনন্তসৌন্দর্যের সন্ধান ও অনুধ্যান মানসীকাব্যে এনেছিল জীবনবিরুদ্ধ কল্পনা ; শ্রান্তি ও হতাশার মধ্য দিয়েও বার বার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে এ-কাব্যে। 'অহল্যার প্রতি' এই জীবন-বিরোধিতাকে জয় করে জীবন ও বাস্তবের সঙ্গে মানসী-কল্পনাকে সমন্বিত করার প্রথম প্রয়াস। এ-প্রয়াসের সূচনা মাত্র এ-কবিতায় ; তার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটবে উত্তরকাব্যে। আমাদের আলোচ্য, কাব্যত্রয়ীর মূলতম দ্বন্দ্ব—সৌন্দর্যকল্পনার সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের বিরোধ। সে-বিরোধের সমন্বয়প্রয়াস প্রথম ক্ষণিক স্বাক্ষর রেখেছে 'অহল্যার প্রতি'-তে। ক্ষণিক, কারণ এ-প্রয়াস ও উপলব্ধি দীর্ঘস্থায়ী নয় ; 'মানসী'র কোন প্রয়াস ও কোন উপলব্ধিই নয়।

সুতরাং দেখা গেল, 'সুরদাসের প্রার্থনা' থেকে 'মেঘদূত' পর্যন্ত মানসী-কল্পনা যখন মানসলোকের চরম স্তরে পৌঁছেছিল তখন সে-নিভৃতমানসের ধ্যান-মূর্তি বিষয়াশ্রয়প্রবণ হয়ে দেখা দিল। 'মেঘদূত'-এ সে-প্রবণতা মধ্যপথে —প্রকৃতির রূপলোক কাব্যে ফিরে এল, কিন্তু সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি কল্পিত হল 'অমর ভুবনে'। তার পর বস্তুনিষ্ঠ বিষয়াশ্রয়-প্রবণতার পূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল 'অহল্যার প্রতি'-তে। সৌন্দর্য-কল্পনাও নেমে এল ধরিত্রীর বুকে; সহস্রধারায় উৎসারিত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে অন্বিত হবার প্রতিশ্রুতি আনল।

সে-প্রতিশ্রুতি মানসী কাব্যে সার্থক হবে না। 'অহল্যার প্রতি'র পরই সে-কল্পনা মিলিয়ে যাবে। কাব্য ফিরে যাবে যথারীতি আর্ত, ক্লিষ্ট সন্ধানে। মানসীর শেষ কয়টি কবিতা পূর্ব-ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।

'অহল্যার প্রতি'র পর দীর্ঘ আড়াই মাস কোন কবিতা নেই। তৃপ্তিহীন, পরিশ্রান্ত কবি ভ্রাম্যমাণ,—বোলপুরে, শিলাইদহে, কলকাতায়। ১২৯৭ সালের শ্রাবণের শেষে কবি আবার এলেন সোলাপুরে, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। ক'দিনের মধ্যে লিখলেন তিনটি কবিতা—'গোধূলি', 'উচ্ছৃঙ্খল' ও 'আগন্তুক' (১ ভাদ্র, ৫ ভাদ্র, ৫ ভাদ্র, ১৮৯০)। ঘূর্ণায়মান চক্রের অনিবার্যতা নিয়ে কাব্যে আবার দেখা দিল অতিপুরাতন শ্রান্তি, বেদনা ও ব্যর্থতার সুর। স্পষ্টকণ্ঠে উদ্ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন, দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের ইতিহাসে বহু ও বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ পেয়েও মানসীর সনাতন সুর আজও কেন অপরিবর্তিত এর পূর্ণ সঙ্গত কারণ আমাদের জানা নেই। তত্ত্ব অজ্ঞাত; কিন্তু তথ্যটা এই যে শেষ ক'টি কবিতায় আবার দেখি শৃঙ্খল-ছেঁড়া সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথার পুনরুল্লেখ; দেখি সৌন্দর্যের 'তীব্রপিপাসা-কাতর' কবির চিরঅতৃপ্ত, চিরপুরাতন অন্বেষণা—

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কানন-শেষে;
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুল বাসনা-সঙ্গীত গাই,
অসীম কালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।
শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,

তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যকুলতা।

কবিতাটি রচনার দুইদিন পরে কবি বিদেশযাত্রা করলেন। ঠিক এক মাস ছিলেন ইংলণ্ডে; রচিত হয় একটি মাত্র কবিতা—'বিদায়' (আশ্বিন, ১২৯৭)। ফেরার পথে—রবীন্দ্রজীবনীতে দেখি যাত্রা যেমন আকস্মিক, ফিরে আসাও তেমনি আকস্মিক—সমুদ্রবক্ষে লেখা হল 'মানসী'র শেষ চারটি কবিতা—'সন্ধ্যায়' (৭ কার্তিক), 'শেষ উপহার' (৯ কার্তিক), 'মৌনভাষা' (১০ কার্তিক) এবং 'আমার সুখ' (১১ কার্তিক)।

'উচ্ছৃঙ্খল' থেকে 'আমার সুখ'—'মানসী'র এই শেষ সাতটি কবিতার মধ্যে আবার ফিরে এল উৎকণ্ঠ প্রেম। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'চিরদিবসের চিরমনোব্যাকুলতা'! তবু এ-কবিতাগুচ্ছের প্রেমকল্পনার স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে 'বিদায়', 'সন্ধ্যা' ও 'শেষ উপহার'-কে আচ্ছন্ন করেছে এক নিবিড়, বিষণ্ন প্রশান্তির সুর। তিনটি কবিতাতেই সন্ধ্যা অথবা রাত্রির চিত্রকল্প এসেছে; মনে হয় যেন কাব্যের শেষে সন্ধ্যার অতলস্পর্শ নিস্তব্ধতা তার ছায়া মেলেছে কবির অন্তরে। দ্বিতীয়ত, চোখে পড়ে 'বিদায়' কথাটির বারবার উল্লেখ এ-তিনটি কবিতায়। কবির অন্তরে জেগেছে এ-বোধ যে এ-চিরব্যাকুলতা উত্তীর্ণ হয়ে মানসীকে বিদায় দেবার কাল আসন্ন। তাই সন্ধ্যার কল্পনা ইঙ্গিতপূর্ণ; দিনাবসান 'মানসী'-কল্পনার অবসানকে সূচিত করল। এই সন্ধ্যার নিঃসীমতা ও বিদায়ের বেদনা মিশে গিয়ে একটা স্তব্ধ প্রশান্তির সুর এনেছে এ-কবিতাগুচ্ছে। সে-সুরেরই অপূর্ব পরিণতি 'শেষ উপহার'।

বিস্ময় জাগায় এই কবিতাটি। এ'কে মানসীর কবিতা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। 'জীবনী'-তে পাই 'শেষ উপহার' বন্ধু লোকেন পালিতের কোন ইংরেজী কবিতার ছায়ায় রচিত। কিন্তু কোন ছায়ারই রেখামাত্র নেই এ-কবিতায়। এর স্ফটিকস্বচ্ছ সরলতা, এর স্তম্ভিত আবেগ ও প্রগাঢ় কল্পনা উত্তরকাব্যের বহু পরিণত কবিতাকে লজ্জা দেবে। এর শৈল্পিক উৎকর্ষ বহু-সাধনা-লভ্য—

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে;

যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন গুন মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখি, বহে বায়ু ; প্রমোদহিল্লোল-ধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে ; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

'শেষ উপহার'-এই মানসীকাব্য বিচারের যবনিকা টানা যাক।

মানসীকাব্যের শেষে একটি গুরুত্বময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নটি গভীর, জটিল ও ব্যাপক ; তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। শুধু মূল রেখা ও তাদের বিশিষ্টতার সংক্ষিপ্ত নির্দেশই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হল : মানসীকল্পনা কাব্যে কি কি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে ক্রমাভিব্যক্ত হয়েছে ?

কাব্যে চিত্রকল্পকে কবিমানসের দর্পণ বলা যেতে পারে। গহন মনের নানা ছায়া সেখানে পড়ে। কবির কল্পনা ও অনুভূতি অন্তর ও বাহিরের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ; অচিন্তনীয় পথে বাঁক নেয়। সে-কল্পনা ও অনুভূতির ছায়াপাত ঘটে চিত্রকল্পে ; তারাই অন্তরে সযত্নে বহন করে অগ্রস্থত মানসের ইতিহাস, নির্দেশ দেয় পথের বাঁকের। কবির মন গতিশীল, তাই চিত্রকল্পও গতিময়—কবিতা থেকে কবিতান্তরে তার রং বদলায়, তার রূপ বদলায়।

'কড়ি ও কোমল' থেকেই দেখি 'আকাশ' ও 'গগন' শব্দ দুটির একাধিক উল্লেখ। কবি যে-সত্তার স্পর্শ-ব্যাকুল, তা 'আকাশ' ছেয়ে আছে—

কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

(যৌবনস্বপ্ন)

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হতে।
(ক্ষণিক মিলন)

'ক্ষণিক মিলন'-এ আর একটি কথার উল্লেখ দেখি যা পরে বিশেষ গুরুত্ব পাবে, বারবার দেখা দেবে—'সন্ধ্যা'। কবিতাটির অর্থব্যঞ্জনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে; মানসীকল্পনার উৎসমুখে রয়েছে এ-কবিতাটি। সপ্তম চরণে পাই—

কোন্ **সন্ধ্যা**-সাগরের কূলে দু-জনের ছিল আনাগোনা।

একান্ত অস্পষ্ট দু-একটি ইঙ্গিত নিয়ে 'কড়ি ও কোমল' থেকে আমরা 'মানসী'তে আসি। শব্দের ইঙ্গিত অর্থময় হয়ে ওঠে যখন তাদের বারবার দেখি। 'নিষ্ফল কামনা'য় এই অর্থময় পুনরাবৃত্তি শুরু হল :

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার **আকাশে**তে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত **সন্ধ্যার** বাতাস।

সবথেকে লক্ষণীয় হল, সন্ধ্যার এ-আকাশের চিত্র কবির মানসী-অন্বেষণেরই পটভূমি—

খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায়।

তার পর আবার ফিরে পেলাম সন্ধ্যার আকাশের কল্পনা—

অন্ধকার **সন্ধ্যার আকাশে**
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন—
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম······

'মানসী'র আর্তসন্ধানের পথে এ-দুটি চিত্রকল্প একাধিকবার দেখা দেবে—

নাই, নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই **আকাশ** ছাঁকিয়া। (হৃদয়ের ধন)

'নিভৃত আশ্রম'এর 'হৃদয়-আসনে' 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি' স্থাপনার প্রশান্ত বাসনা '**সন্ধ্যায়** একেলা বসি বিজন ভবনে'; 'পুরুষের উক্তি'-তে

মানসী মূর্তি জেগে উঠল—'গ্রহতারা-ভরা নীলাম্বরের মাঝে' ; 'বিচ্ছেদ'-এ তা দেখা দিল '**সায়াহ্ন**'-মেঘাবনত পশ্চিম **গগনে**' ; পরের স্তবকে দেখি—

সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম **আকাশ**।

'সুরদাসের প্রার্থনা'য় 'দেবীর প্রতিমা সম' মানসী এসে দাঁড়ালেন—

বাতায়ন হ'তে **সন্ধ্যা**-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে।

শান্তি-রূপিণী সে-মূর্তি,

অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে,
অনন্ত নিশি মাঝে।

'অনন্ত নিশি' সন্ধ্যার আকাশেরই নিবিড়তম রূপ। 'ধ্যান' কবিতায় প্রত্যক্ষ উপমায় পেলাম 'আকাশ'—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার ;

মানসীর ধ্যানমূর্তি স্পষ্টভাবেই 'আকাশে'র উপমা নিয়ে এল। কাব্যের শেষে 'বিদায়' কবিতায় মানসী মূর্তি উদিত হল,

আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারা সম ;

পরের কবিতা 'সন্ধ্যায়'-তে দেখি 'মানসী'র মূল চিত্রকল্প ক'টি একত্রে গ্রথিত হচ্ছে। চিত্রকল্পে সচেতন মনেরই রেখা : কবি স্পষ্টতই মানসী-মূর্তিকে সন্ধ্যার আকাশের সঙ্গে তুলনা করছেন—

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশ তলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে আমার জীবন-তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।

সমালোচকের অনেক কাজ কবি নিজেই সহজ করে দেন; 'সন্ধ্যা'র চিত্রকল্প মানসী-কল্পনায় দেখা দেবার মূল কারণটা ইঙ্গিতে বলা হয়ে গেল।

এ ছাড়া আরও দুটি চিত্রকল্প পাই। গৌণ হলেও তাদের ব্যঞ্জনা গভীর। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'তুমি' কবিতায় বোধ করি প্রথম পাই 'তারা'র উল্লেখ :

তুমি কোন্ কাননের ফুল
তুমি কোন্ গগনের 'তারা',

'মানসী'-তে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় 'অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে বিজন তারা', 'ওই নয়নের নিবিড় তিমির'-এর সঙ্গে তুলনীয় হল। তার পর 'অনন্ত প্রেম'-এ দেখি বহুকাল পরে 'তারা'র চিত্রকল্পটি ফিরে এল : 'কালের তিমির রজনী' ভেদ করে মানসী দেখা দিলেন 'চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে'। কাব্যে প্রশান্ত অথচ উজ্জ্বল অনুভূতির প্রতীক হয়ে দেখা দিল 'তারা'। পরে 'অনন্ত প্রেম'-এ তারার সঙ্গে যুক্ত হল ধ্রুবতারকার নিত্যতা : জন্মজন্মান্তরের মানসী ধ্রুবতারার মতোই স্থির ও অচঞ্চল, শাশ্বত ও সমুজ্জ্বল। কাব্যের শেষে 'বিদায়' কবিতায় মানসীর নয়ন অস্তাচলে সেই 'স্থির ধ্রুবতারাসম' জেগে রইল।

কিন্তু অপর চিত্রকল্পটি এ-কাব্যে গৌণ হলেও উত্তরকাব্যের অন্যতম মুখ্য কল্পনা হয়ে দেখা দেবে। পূর্বে দেখেছি, 'ধ্যান' কবিতায় মানসীকে কবি বরণ করলেন 'বিশ্ববিহীন বিজনে' ব'সে; প্রত্যক্ষ না হলেও, ইঙ্গিত পেলাম মানসীর নিঃসঙ্গ একাকিনী রূপের আভাস। 'মেঘদূত'-এ এ-ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হল : বোধ করি প্রথম পেলাম কবির সৌন্দর্যকল্পনা সম্পর্কে 'একাকিনী' শব্দের প্রয়োগ—

মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে **একাকিনী** বিরহবেদনা।
… … …
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে **একাকী** জাগিয়া।

'বিদায়' কবিতায় কবির প্রার্থনায় জেগে উঠল এই 'একাকী'—

ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন

পাঠায়ো পশ্চিম পানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দুর তীরদেশে আনিমেষ আঁখি।

তার পর 'সন্ধ্যায়' কবিতায় সমস্ত চিত্রকল্প সমাহৃত হবার পর শেষে পেলাম 'একাকিনী'কে। স্তবকটি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

চিত্রা-কাব্যে এই 'একাকিনী'ই নানা ব্যঞ্জনায় 'অন্তরব্যাপিনী'র কল্পনায় উন্নীত হবে।

সুতরাং মানসীকল্পনা সম্পর্কে কাব্যে দুটি মুখ্য এবং দুটি গৌণ চিত্রকল্প আমরা দেখলাম। এদের বারবার আবির্ভাব ঘটেছে অন্তরেরই তাগিদে, গহন মনের প্রয়োজনে। কী সে-প্রয়োজন? কী আলোকপাত করে এই চারটি চিত্রকল্প?

বাল্য থেকে যে অনুভূতি কবিকে আচ্ছন্ন করেছিল তা তীব্র হলেও অস্পষ্ট; সে-অনুভূতি ছিল বিমূর্ত, কবির অন্তরে পরিব্যাপ্ত। তাই মানসীকল্পনার উন্মেষে পাই 'আকাশে'র চিত্রকল্পটি: নিরবয়ব অথচ পরিব্যাপ্ত অনুভূতি আকাশকেই অন্তর্জ্ঞানে বেছে নিল তার প্রতীকরূপে। তার পর 'ক্ষণিক মিলন' কবিতায় স্মৃতির অস্পষ্টতা 'সন্ধ্যা'র রূপটিকে প্রথম আশ্রয় করল। মানসীকাব্যে সন্ধ্যার চিত্রকল্পটি নিবিড় হল তার কারণ সন্ধ্যার আঁধার, সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, সন্ধ্যার রহস্যময়তা কবির অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল। মানসীর শ্রান্ত অন্বেষণ, তার বেদনা ও নিষ্ফলতা সন্ধ্যার রূপেরই সমধর্মী। বিষাদ, শ্রান্তি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য অবচেতনে 'সন্ধ্যা'কেই পূর্ণ প্রতীকরূপে বরণ করে নিল।

'তারা' ও 'ধ্রুবতারা'র ব্যঞ্জনার সার্থকতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ ও শেষ চিত্রকল্প 'একাকিনী'র কল্পনা। অনন্ত আকাশে যার ব্যাপ্তি, নিঃসীম শূন্যে যার প্রকাশ, সে-সত্তাকে 'একাকিনী' কল্পনা করাই একান্ত স্বাভাবিক। শেলীর কাব্যেও দেখি এই lonely spirit-এর কল্পনা। কিন্তু বিশেষ কৌতূহল জাগায় কাব্যে এই 'একাকিনী'র প্রকাশবৈচিত্র্য। 'মানসী'তে একাকিনীর প্রকাশ সৌন্দর্যের অলোকধামে, 'সুদূর পশ্চিমাচলে, কনক-আকাশতলে'। বহির্লোকেই তার প্রকাশ। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে দেখব সৌন্দর্যসত্তা 'মর্মের গেহিনী' হবার পরে এই একাকিনীর কল্পনা হবে অন্তর্মুখী; পরিশেষে দেখা দেবে অন্তরাকাশে অন্তরব্যাপিনী হয়ে। সে-ইতিহাস সুপ্ত রইল উত্তরকাব্যে।

॥ ৫ ॥

আমাদের এ দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত অনুস্মৃতি প্রয়োজন হবে।

মানসীকাব্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা গেল। প্রথম পর্বে দেখলাম অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের দিব্য অনুভূতি নিয়ে কবি কল্পলোকের আদর্শকে খুঁজছেন মানবীপ্রিয়ার প্রেমে; এ-তৃষাতুর কামনার ব্যর্থতা গভীর রেখাপাত করল 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায়। বেদনাচ্ছন্ন মন বিচ্ছেদের শান্তি চাইল, খুঁজল 'নূতন আশ্রয় ঠাঁই'। 'নিভৃত আশ্রম'-এ সে শান্তি ও আশ্রয়ের আভাস পাওয়া গেল: মানসীর 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি' 'হৃদয়-আসনে স্থাপনা'র বাসনা জাগল। ক্ষণিক প্রশান্তি কবিকে নিয়ে গেল লিরিকের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে নাটকীয় আঙ্গিকে—'পুরুষের উক্তি'-তে সুস্পষ্ট রেখায় চিত্রিত হল কবির গহন মনের ক্রমোন্তিন্ন ইতিহাস—কি ভাবে প্রেমের ও সৌন্দর্যের দিব্য-কল্পনা জাগল, মানবীয় প্রেমে তার সন্ধান ব্যর্থ হল। 'সিন্ধু-তরঙ্গে' এই বেদনা ও নৈরাশ্য প্রবল আবেগে প্রতিফলিত হল প্রকৃতির অন্তরে—পেলাম অন্ধ ও নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির রূঢ় কল্পনা।

দ্বিতীয় পর্বে উন্মুক্ত হল 'অতলস্পর্শ অন্ধকার'। এ-পর্বের প্রারম্ভে দেখি জীবনবোধ ও প্রকৃতিচেতনা নিবিড়কালিমালিপ্ত। 'শূন্যগৃহে' থেকে সন্তত হল মানবীয়-প্রেমের সুতীব্র বিরহ-কামনা। মানসিক বিক্ষোভ আবার কাব্যে প্রতিস্হত হল—'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'-তে ফিরে পেলাম 'সিন্ধুতরঙ্গে'র প্রকৃতি-দৃষ্টি—নিষ্ঠুর প্রকৃতির রুদ্র কল্পনা। তবু বিক্ষুব্ধ, শ্রান্ত মন 'জীবনমধ্যাহ্নে' অনু-তাপ নিয়ে প্রকৃতির কোলেই শরণ চাইল: প্রকৃতির 'অগাধ শান্তি ও অসীম সৌন্দর্য' একান্ত কাম্য হল। নতুন প্রকৃতি-চেতনার ছায়াপাত ঘটল পরবর্তী কয়েকটি কবিতায়—প্রকৃতির স্পর্শে অন্তর্বিক্ষোভ স্তিমিত হল, কিন্তু মানবী-প্রিয়ার জন্য কামনা অনবচ্ছিন্ন রইল। সে মায়াস্পর্শে 'বিচ্ছেদ' কবিতায় পুনঃসৃষ্ট হল মানসীর 'মোহিনী প্রতিমা'; সে-মূর্তি 'মানসিক অভিসার'-এ ধরা দিল কামনারই আলিঙ্গনে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল তৃষার্ত প্রেমকামনার মধ্যে; দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হল মানসীর পুনরাবির্ভাবে। কিন্তু সে-আবির্ভাব ঘটল ইন্দ্রিয়পথে, আনল ইন্দ্রিয়জ কামনা।

তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হল ব্যক্তিনিরপেক্ষ নাট্যভঙ্গিতে—'বধূ', 'ব্যক্তপ্রেম' ও 'গুপ্তপ্রেম'-এ দেখলাম মানবীয় প্রেমের অসহায়, সকরুণ বেদনা। প্রেমের ব্যর্থতা ও রিক্ততার চিত্র কাব্যের মূল সন্ধানকেই পুনরুচ্চারিত করল। তার পর শীঘ্রই কাব্যের ঋতুবদল ঘটল: 'দুরন্ত আশা'য় ফিরে এল বিপুল জীবন-তৃষ্ণা; প্রখর বিদ্রূপে ঘোষিত হল বিদ্রোহ ও পূর্ণতর জীবন কামনা। সুরদাসের প্রার্থনায় উদ্‌ঘাটিত হল এতকালের অন্তর্দাহের হেতু: অসহ পরিতাপে কবি স্বীকার করলেন মানসীর দিব্যমূর্তিকে তিনি কামনা করেছেন লুব্ধ দৃষ্টিতে; স্বীকার করলেন প্রকৃতির রূপসম্ভার তার মায়াপাশে কবিকে বিভ্রান্ত করেছে, কামনার ইন্ধন এনেছে, মানসীর জ্যোতির্মূর্তিকে ম্লান করেছে। কবি প্রার্থনা করলেন প্রকৃতিমুক্ত, রূপবিচ্ছিন্ন দেবীপ্রতিমাকে। 'জীবনমধ্যাহ্নে' অনুতাপদগ্ধ কবি শরণ চেয়েছিলেন প্রকৃতির শান্তি ও সৌন্দর্যের মাঝে; সে-বাসনা ব্যর্থ করে 'সুরদাসে' দেখা দিল সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রার্থনা। রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম দেখি সৌন্দর্যকল্পনা ও প্রকৃতিকল্পনার বিরোধ। এ-প্রসঙ্গে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ও প্লেটোর সৌন্দর্যকল্পনার সাদৃশ্য ও বৈষম্য। পরের কয়েকটি কবিতায় ভাবালুতার স্পর্শ এল কাব্যে; তারই মাঝে 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ ও 'ভৈরবীগানে' পেলাম সংকটময় জীবনের বাসনা, সুখদুঃখসঙ্কুল নূতন জগৎ-এর কল্পনা। তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত হল অন্তর্লোকে, চিরবাঞ্ছিত মানসীর জন্য শিরায় শিরায় হাহাকার তুলে।

চতুর্থ ও অন্তিম পর্বের প্রথমেই পাই সমাহিত ধ্যানকল্পনায় 'মানসী'কে। সুরদাসের প্রার্থনা পূর্ণ করে কবি তাকে উপলব্ধি করলেন 'বিশ্ববিহীন বিজনে'। অন্তরে নামল প্রশান্তি। 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'-এ মানসী-কল্পনা প্রক্ষিপ্ত হল অসীমকালের পটভূমিতে, অনন্ত-জন্ম-প্রবাহিত প্রেম-লীলায়। বাল্যের ও প্রথম যৌবনের সৌন্দর্যানুভূতি ক্রমবিবর্তিত হয়ে পৌঁছল তৃতীয় স্তরে। চিত্তভূমিতে প্রচ্ছন্ন হল উত্তরকাব্যের 'জীবনদেবতা'-কল্পনার বীজ।

'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'-এ দেখলাম মানসী-কল্পনার তিনটি বৈশিষ্ট্য —আত্মমুখ অনুভূতি সার্বজনীনতায় প্রক্ষিপ্ত হল; মানসী কল্পিত হল সমস্ত বিশ্বের প্রেমের আদিউৎস রূপে; 'ধ্যান'-এর প্রকৃতি-বিশ্লিষ্ট কল্পনাই প্রোচ্চারিত হল। তার পরেই 'আশঙ্কা' কবিতায় কবিচিত্তে সন্দেহ জাগল এই প্রকৃতি-বিমুখ কল্পনা সম্বন্ধে। 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'-তে প্রকৃতির

সঙ্গে মানসীকল্পনার বিরোধ শেষ হল; সেখানে মানসীর আত্মিক অনুভূতি বিষয়াশ্রিত হল, প্রতীকের মাঝে রূপ নিল। 'মেঘদূত'-এ বিশ্বের রূপলোক পরিক্রমণ করে কবি 'ধ্যান'-লব্ধ অনুভূতিকে কল্পনা করলেন অমর্তলোকে, 'সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি' রূপে; 'অহল্যার প্রতি'-তে মানসী কল্পনা প্রথম জগৎ ও জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত হল; পৌঁছল চতুর্থ স্তরে। 'অহল্যার প্রতি'ই মানসী কাব্যের পরাকাষ্ঠা। এর পর কাব্যে আবার দেখি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি —অতৃপ্ত কামনা, তৃষ্ণার্ত প্রেম। তবু শেষের কয়টি কবিতায় পেলাম স্তব্ধ প্রশান্তি, বিষণ্ণ অন্তরে মানসীকে বিদায় দেবার প্রস্তুতি।

মানসীকাব্যের দীর্ঘ আলোচনা শেষ হল। সবার উপরে একটি কথা বোধ হয় সুপরিস্ফুট: 'মানসী' শুধুমাত্র 'প্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা' নয়। বস্তুত সুচিন্তিত বিচারের পর সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ বিপরীত। 'মানসী' মহৎকাব্য-গোত্রীয় নয়। এর বহু কবিতা রসাসুত্তীর্ণ; তাদের শিল্পোৎকর্ষ মাধ্যমিক, তাদের কাব্যধ্বনি ক্ষীণ। কিন্তু কবিমানসের এত বহুবিচিত্র প্রকাশ, তার ক্রমাভিব্যক্তির এত বিস্ময়কর সঙ্কেত, তার ভাঙা-গড়ার এত কৌতূহলাবহ ইতিহাস, এত বহুধারায় উৎসারিত, বিরুদ্ধ, সংঘাতবিক্ষুব্ধ অনুভূতি ও কল্পনা, কবির—এ-উক্তির পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলা যাক—আর কোন কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। আর কোন কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য এত গভীর, এত বহুধা-প্রসারিত কিনা সন্দেহ। পুনরুক্তি করা প্রয়োজন, মানসীই সর্বপ্রথম কাব্য যেখানে সৌন্দর্যকামনা অনুভূতি থেকে পরিপূর্ণ কল্পনার স্তরে এল, সুস্পষ্ট মূর্তি নিল; মানুষ ও জীবনের আহ্বান ধ্বনিত করে জীবনে ও কাব্যে প্রবল বিরোধ আনল; যেখানে দিব্যকল্পনার সন্ধান প্রকৃতিচেতনার সঙ্গেও সংঘাত বাধাল; যেখানে কবির দেশহিতৈষণা জাগ্রত হয়ে কবিকে বিদ্রোহী করল, ব্যঙ্গমুখর করল; যেখানে রোম্যান্টিক অনুভূতি ও কল্পনার বহুমুখী প্রকাশ ঘটল; পরিশেষত, যেখানে প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল 'জীবনস্মৃতি'র অন্তিম উক্তির নিবিড় ইঙ্গিত ও তাৎপর্য— 'এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন'। 'সেই আশ্চর্য পরম রহস্যে'র প্রথম অধ্যায় উন্মুক্ত হল মানসী কাব্যে। 'মানসী' একান্ত অনুপেক্ষণীয় কাব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

সোনার তরী

"All things uncomely and broken,
all things worn-out and old:
The cry of a child by the roadway,
the creak of a lumbering cart;
The heavy steps of the ploughman,
splashing the wintry mould :
Are wronging your image that blossoms
a rose in the deeps of my heart."

Yeats : 'Rose in the Heart.'

তৃতীয় অধ্যায়

সোনার তরী

'সোনার তরী' রচিত 'আর এক পরিপ্রেক্ষিতে'। নির্জনধ্যানসাধনার ইতিবৃত্ত দেখেছি 'মানসী'তে। মানুষের জীবনধারার পটভূমিতে এবার দেখব 'নির্জন-সজনের নিত্যসংগম', দেখব বহুবিচিত্র অনুভূতির 'স্রোতের পটে প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি'। 'মানসী'তে দেখেছি সেই 'আশ্চর্য পরমরহস্যে'র প্রথম তোরণ রচনা; সোনার তরী কাব্যে সৃষ্ট হবে নানা বাধা, বিরোধ ও বক্রতার মধ্য দিয়ে সে রহস্যের দ্বিতীয় তোরণ।

'মানসী'র শেষকবিতার রচনাকাল কার্তিক ১২৯৭। 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতার রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৮। দীর্ঘ ষোলমাস কাব্যবীণা স্তব্ধ। এর কারণ দ্বিধারা-বিভক্ত—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহিরের কারণের বিবরণ মেলে সমসাময়িক জীবন-ইতিহাসে। ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসে ইংলণ্ড থেকে ফিরে কবিকে পিতার আদেশে জমিদারির গুরুদায়িত্ব নিতে হল। মানসীর কল্পজগৎ থেকে হঠাৎ এলেন বাস্তবনিষ্ঠ জীবনের সংস্পর্শে; এলেন বাংলার গ্রামে ও নদীতে, যার 'পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা'। কবিজীবনে প্রথম উন্মুক্ত হল বাংলার সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয়, প্রসারিত হল পদ্মার বিশাল মায়া, জলে-স্থলে-আকাশে প্রকৃতির অবারিত স্পর্শ।

লেখনীর দায়িত্বও সমধিক। এই সময়ে লিখিত হল য়ুরোপভ্রমণকালে রচিত 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী'র ভূমিকা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ ও সার্থকতা সম্পর্কে নানাপ্রশ্নের আলোচনা। তার পর নতুন বৎসরে এল 'হিতবাদী' পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮)। সাহিত্য-সম্পাদক রূপে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনা। জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়ের মধ্যে ছয়টি ছোটগল্প প্রকাশিত হল—দেনাপাওনা, গিন্নী, পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান ও রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা—রবীন্দ্রনাথের প্রথম মানবতান্ত্রিক, বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণমূলক ছোটগল্প যার অন্তরালে সক্রিয় ছিল পদ্মার পারে 'অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব'।

গল্প ছাড়া প্রবন্ধ লিখলেন 'অকাল-বিবাহ'। কর্মাইনী গল্প সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে হিতবাদীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিন্ন হয় তিনমাসের মধ্যে। শ্লেষের মাধ্যমে সে-প্রতিবাদ প্রকাশ পেল সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায়: লিখলেন 'লেখার নমুনা', 'সারবান সাহিত্য'।

১২৯৮ সালের বর্ষা ও শরৎ কাটল উত্তরবঙ্গের নদীতে নদীতে; সাহাজাদপুরের কুঠিতে; শিলাইদহের ঘাটে, পাণ্ডুয়ার জলপথে। প্রকৃতির নিত্যসচল নিমন্ত্রণ, জীবনবৈচিত্র্যের নানা অভিঘাত কবির মনকে নানা ভাবনায় উদ্‌বোধিত করেছিল। তার স্বাক্ষর পড়েছে 'ছিন্নপত্রে'। তার পর অগ্রহায়ণ (১২৯৮) থেকে প্রকাশিত হল 'সাধনা' পত্রিকা; ঠাকুরবাড়িরই পত্রিকা—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ল। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"নূতন পত্রিকা নূতন প্রেমের স্থায়ই তাঁকে টানে, এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা এই নূতন আকর্ষণে শতদল পদ্মের স্থায় ফুটিয়া ওঠে। 'সাধনা'র প্রথম সংখ্যা হইতে ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সাময়িক সারসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাময়িক-সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি বিচিত্র রচনাসম্ভারে উহা পূর্ণ হইল।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৬)

কবির সমসাময়িক কর্মজীবনবৃত্তান্ত কাব্যবিরতির বাহিরের কারণের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু মনে হয় প্রকৃত কারণ আরও গভীরে; তা অন্তরের। মানসীর দীর্ঘবিলম্বিত সন্ধান, তার জীবনবিরোধী আত্মকেন্দ্রিকতা যখন কবিকে ক্লান্ত করেছিল তখন নানাদিক থেকে এল জীবননিষ্ঠ সৃষ্টি ও কর্মের ডাক। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হল জীবনের পরিবেশ—এলেন বাংলার গ্রামে ও নদীতে। একদিকে প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য মনকে উদ্বেলিত করেছিল, অন্যদিকে 'মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে মনকে জাগিয়ে রেখেছিল'। 'সোনার তরী'র সূচনায় সুস্পষ্টভাষায় এই দুই ধারার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সমগ্র অনুচ্ছেদটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা-বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের

নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানাসংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। **সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ করল আমার জীবনে।** আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল **এইসময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।**" (রচনাবলী : ৩য় খণ্ড, 'সোনার তরী'র সূচনা)

'সোনার তরী' কাব্যের পরিপ্রেক্ষিত এই দুই বিরুদ্ধ প্রবর্তনার সম্মিলনে সৃষ্ট, 'মানসী' পর্যন্ত যে সৌন্দর্যসাধনা চলেছিল তার অন্তরালে এই 'নিত্যসচল অভিজ্ঞতা'র কোন প্রবর্তনাই ছিল না। তাই সে-অন্বেষণ যখন কবিকে শ্রান্ত করেছিল তখন হঠাৎ উন্মুক্ত হল আর এক জগৎ,—প্রকৃতির পটভূমিকায় খুব কাছ থেকে দেখলেন মানুষকে ; দেখলেন সুখদুঃখের তুফান তুলে ছুটে চলেছে তার জীবনধারা ; দেখলেন দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত সে-মানুষ কোমল, দুর্বল, অসহায়। তার কথা বারবার পাব 'ছিন্নপত্রে', আর সে-যুগের ছোটগল্পে।

সুতরাং কাব্যবিরতির গভীর হেতু যে অন্তরের তা হয়তো এবার সুস্পষ্ট হবে। বস্তুত 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্যের দীর্ঘ ব্যবধানকাল কবি-মানসের এক গুরুত্বময় সন্ধিক্ষণ। নতুন কর্মজীবন, নতুন পরিবেশ ও পরিচয়ের অভিজ্ঞতা কবিজীবনে এক নব-অধ্যায়ের সূচনা আনল। সে অধ্যায়, প্রারম্ভে, পূর্ব-অধ্যায়ের পরিপন্থী হয়েই উন্মুক্ত হবে। কবির গহন অন্তরে যখন নিঃশব্দে পুরাতন ও নূতনের ভাঙাগড়া চলেছে তখন কাব্যবীণা স্বভাবতই নিস্তব্ধ।

'মানসী' ও 'সোনার তরী'র অন্তরালের উপর সেতুস্বরূপ রয়েছে 'ছিন্নপত্রে'র কিছুটা অংশ (পৃ ৩৯-১১৮ ; জানুয়ারি ১৮৯০ থেকে জানুয়ারি ১৮৯২)। মানসীর পর, কাব্যে যখন কবিমানসের পদাঙ্ক বিলুপ্ত, পথরেখা দুর্জ্ঞেয়, তখন 'ছিন্নপত্র'ই দেখায় পথের প্রান্তে কবি-মানসের পদচিহ্ন। মানসী কাব্য থেকেই অন্তরালে যে ভাঙন চলেছিল তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে 'ছিন্নপত্রে'র কয়েকটি চিঠিতে।

ছিন্নপত্রে মানসী-উত্তর ও সোনারতরী-পূর্ব পত্রগুচ্ছের প্রথম চিঠিটি আমাদের আলোচনায় বিশেষ মূল্যবান। চিঠিটিকে (পতিসর ১৮৯১ ;

ছিন্নপত্র, পৃ ৪৫-৪৬) কবিমানসের সন্ধিকাল বলা যেতে পারে ; বলা যেতে পারে নূতন ও পুরাতনের কৌতুকাবহ সম্মেলনক্ষেত্র। তার প্রারম্ভে আছে হেমন্তের রিক্তশস্য ধূসর মাঠের প্রান্তে সূর্যাস্তের একটি বর্ণনা—

"সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারিদিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব। বহুদূরে একেবারে দিগন্তের শেষপ্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হোলো ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে……তারার মালা গাঁথে এবং গুন গুন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে —একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুসজল নয়—একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল ছল ভাবের মতো।"……

এ বর্ণনায় প্রচ্ছন্ন মানসী কাব্যের মূলতম কল্পনা ; এর মাঝে মানসীর কবিকেই খুঁজে পাই। সন্ধ্যারূপিণীর এ স্তব্ধ, বিষণ্ন মূর্তি স্মরণ করাবে 'বিচ্ছেদ'-এর 'সায়াহ্ন-মেঘাবনত' পশ্চিম গগনের বর্ণনা ; 'সুরদাসের প্রার্থনা'র 'সন্ধ্যাকিরণে' নিবিড়কুন্তলা শান্তিরূপিণীর কল্পনা ; 'বিদায়' কবিতার 'আসন্ন আঁধারমাঝে স্থিরধ্রুবতারাসম' নয়নের কল্পনা ; 'সন্ধ্যায়' কবিতার 'কনক-আকাশতলে' 'সুন্দর, শান্ত, উদাসিনী'র কল্পনা। ছিন্নপত্রের সন্ধ্যাবর্ণনায় 'মানসী' কাব্যের অন্তিম কবিতাগুলির অন্তরের সুরটুকু গদ্যে প্রাতধ্বনিত। তারা একই সুরে বাঁধা। মানসীর দিব্য অনুভূতি অজ্ঞাতেই প্রতিফলিত সূর্যাস্তের বর্ণনায় ; যেন সন্ধ্যারূপিণীর বর্ণাভায় ধরা দিল স্তিমিতদীপ্তি সৌন্দর্যকল্পনার অন্তিম আভা।

কিন্তু সেই সঙ্গেই এ চিঠিরই শেষে আর একটি কল্পনা-ভঙ্গী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; তা সোনার তরীর অন্যতম প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী—সুখদুঃখপীড়িত অসহায় বিষণ্ন ধরিত্রীর কল্পনা—

"এমন মনে করা যেতে পারে—মা পৃথিবীর লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলে-পুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকন্নার কাজ নিয়ে থাকে, যেখানে একটু

ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে, সেইখানেই তার গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।"

এ-কল্পনা অভিনব। তবু সম্পূর্ণ নয়। পূর্বে দেখেছি মানসী কাব্যের শেষে কিভাবে 'অহল্যার প্রতি'-তে "জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা" কাব্যে দেখা দিয়েছিল। সে কবিতায় কবির মনে প্রশ্ন জেগেছিল 'বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে' বিলীন সৌন্দর্যসত্তার প্রতিমূর্তি 'অহল্যা' কি সুপ্ত আত্মায় নিয়ত অনুভব করেছিল—

'মাতৃধৈর্য মৌন মূক সুখদুঃখ যত'?

'অহল্যার প্রতি'-তেই কবিচিত্তে এ-বোধ দেখা দিয়েছিল যে সৌন্দর্যসত্তা 'বিশ্ববিহীন বিজনে' বা 'কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে'ই বিরাজ করে না; তার বিস্মিত প্রকাশ ধরণীর অঙ্কে, 'ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক-প্রবাহ স্পর্শ' করে। 'অহল্যার' প্রতি'-র গভীর ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে: সে-কবিতায় প্রথম সূচিত হল 'সোনার তরী' কাব্যের একটি বিশিষ্ট ভাবধারা।

তার পর সে-ভাবধারার বিস্তৃত প্রকাশ ঘটল 'ছিন্নপত্রে'র আলোচ্য চিঠিতে। কবির মন উন্মুখ হল বিষাদ-ও-বৈরাগ্যময় ধরিত্রীর অন্তরবেদনায়, তার 'নিত্য-নিদ্রাহীন ব্যথা'র কল্পনায়। 'মানসী'র অন্তিম অনুভূতিই 'ছিন্ন-পত্রে'র চিঠিতে রূপান্তরিত হল বৈরাগ্য-বিষাদক্লিষ্ট ধরণীর কল্পনায়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল এই অসহায় পৃথিবীর বুকে আরও 'অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ মানুষের প্রতি', তাদের 'কোমলতা-দুর্বলতাময় সকরুণ আশঙ্কাভরা জীবনধারার প্রতি'। তাই এ-কথা স্মরণীয় যে 'সোনার তরী' কাব্যের দৃষ্টি ও জীবনবোধ সম্পূর্ণ অভিনব নয়। তার অঙ্কুর রয়েছে 'অহল্যার প্রতি'-তে; তার আলোকিত প্রকাশ রয়েছে মানসী-উত্তর ও 'সোনার-তরী'-পূর্ব 'ছিন্নপত্রে'।

সুতরাং পতিসরের চিঠিটি কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে যুগসন্ধির মর্যাদা পাবে। তার প্রারম্ভে দেখলাম পিছনের দ্যুলোকব্যাপী কল্পনা; তার পরেই দেখলাম সামনে প্রসারিত 'সোনার তরী'র অন্যতম প্রধান ভাব-ধারা—বিষণ্ণ, উদাসীন পৃথিবী, তার বুকে নিঃসহায় মানুষগুলো। প্রকৃতি ও মানুষের এ বিশিষ্ট সমন্বয় 'সোনার তরী'র পটভূমি।

একটি কথা বোধ করি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে: মানসীর মরীচিকা-সন্ধান পরিহার করে কবির দৃষ্টি, অনুভূতি ও কল্পনা সন্নিবিষ্ট এই ধরণীর বুকে,

মানুষের জীবনধারার মাঝে। শ্রান্ত-অন্বেষণা কবিকে নিয়ে এসেছে 'সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা'র জগতে ; 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' আজ স্তিমিত।

দৃষ্টি ও অনুভূতির এ-সন্নিবেশ 'ছিন্নপত্রে' দেখা দিয়েছে বিস্তীর্ণ, পুঙ্খ বাস্তব-বোধের মধ্যে। সে-বোধ ও দৃষ্টি প্রসারিত মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে। ছিন্নপত্রের একাধিক চিঠিতে এ সমন্বিত দৃষ্টির স্বাক্ষর পড়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

"একটা ছোট্ট নদী আছে বটে কিন্তু কানাকড়ির স্রোত নেই, সে যেন আপন শৈবালদলের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গবিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কি। জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সে-গুলো সমস্তদিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা ছটা বড়ো বড়ো নৌকা সারি সারি বাঁধা আছে—তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে আর একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধবৃদ্ধ লোক অনাবৃতগাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে রয়েছে ; ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাঁতিহাসের ওরি মধ্যে একটু ব্যস্তভাব দেখা যাচ্ছে, তারা ভারি কলরব করছে এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নীচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে, "কিছুই না, কিছুই না।"······('ছিন্নপত্র'—কালিগ্রাম, ৫ই মাঘ, ১৮৯১, বাং ১২৯৭ ; পৃ ৪৮-৪৯)

অথবা,—"এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি—এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে।······মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্ খস্ শব্দ

হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোট ছোট কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা একটা ছোট ছোট গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটাতিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—নদী পর্যন্ত একটি গড়ানো কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে, কোন কোন লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে ......”(‘ছিন্নপত্র’, ৫ মাঘ ১৮৯১, পৃ ৫০-৫১)।

এ-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, নৈর্ব্যক্তিক, বাস্তবনিষ্ঠ। চেতন ও অচেতন প্রকৃতিলোক এ-দৃষ্টির পরিধিতে সমন্বিত। ‘সোনার তরী’ কাব্যে এ সমন্বিত দৃষ্টি বিশ্বকে নতুন করে আবিষ্কার করল। মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের বিস্ময় জাগাল ধরণীর প্রতি নিবিড় ভালবাসা। ছিন্নপত্রের ঠিক পরের চিঠিতে এই সমন্বিত-পরিচয়-জাত ‘ভালবাসা’র কথাই রয়েছে—

“ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম! **স্বর্গ আর কি দিত জানি না, কিন্তু এমন কোমলতাদুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত।** আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহ-শালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময়, ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে, এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।...........আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে —‘আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে,

জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" **এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালবাসি ;** এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায়, সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।" (ছিন্নপত্র'—জানুয়ারি ১৮৯১, পৃ ৫৪-৫৫)

একান্ত কৌতূহল জাগায় এই 'স্বর্গের উপর আড়ি করে' কথাটি। সত্য হোক বা না-হোক, ভাবতে ভাল লাগে যে মানসীর দিব্যকল্পনার প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন এই ক'টি শব্দের অন্তরালে। সঙ্গত অনুমান যদি সমালোচকের অধিকারভুক্ত হয় তবে এ-অনুমান করব যে 'মানসী'-কল্পনারই ইঙ্গিত রয়েছে, তার শ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর পড়েছে এই শব্দগুলির মাঝে। সোনার তরী রচনার অব্যবহিত পূর্বে কবিমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই চারটি শব্দ বিশেষ আলোকপাত করেছে এ-অনুমান বিরোধসাপেক্ষ হলেও অসঙ্গত হবে না।

এ-অনুমানের পরোক্ষ প্রমাণও মেলে ছিন্নপত্রের আর একটি চিঠিতে—শেষোক্ত চিঠির আট মাস পরে লেখা (অক্টোবর ১৮৯১)। চিঠিটির শেষে কবি বলছেন—

"……হঠাৎ মনে হোলো, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই। আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়—**এবার তাকে আর শুষ্ক অতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিইনে**—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে ; আপনাকেও একবার জানান্ দিই, অন্যকেও একবার জানি ;………**উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে সর্বদা মনে মনে পৃথিবী এবং মনুষ্যহৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত করে স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে** এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। (ছিন্নপত্র, অক্টোবর ১৮৯১, পৃ ১০৪-৫)

চিঠিটি 'সোনার তরী' কাব্যের চার মাস পূর্বে লেখা। কবি-মানসের পূর্ব-ইতিহাসের সঙ্গে যার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে তার কাছে এ-উদ্ধৃতি বিশেষ কৌতুকাবহ। বড় হরফে মুদ্রিত উক্তিগুলি সুস্পষ্টত এই সাক্ষ্যই বহন করে যে 'মানসী'র 'শুষ্ক অতৃপ্ত' কল্পলোক-অভিসার, তার 'স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষ"

কবিকে ক্লান্ত করেছে; তাঁর মন আজ সৌন্দর্য-মরীচিকাসন্ধানবিমুখ। তাঁর সামনে আজ প্রসারিত 'আশ্চর্য সুন্দরী' এই 'জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী', 'এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত নিরুদ্দেশ প্রকৃতি' যার অন্তরে কম্পিত 'কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম, করুণাপূর্ণ বিষাদ'; যার অন্তরে অবগাহন করে কবি অনুভব করছেন 'এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ'। এবং এই 'আশ্চর্য সুন্দরী' পৃথিবী আরও সুন্দর, আরও মধুর হয়েছে কারণ তার মুখে দেখেছেন সুগভীর বিষাদের ছায়া, তার বুকে দেখেছেন 'এমন কোমলতা-দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত' মানুষকে, 'যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।'

'সোনার তরী'র মানসিক পটভূমিকা এই নতুন অভিজ্ঞতা; 'সোনার তরী' রচিত এই পরিবর্তিত 'পরিপ্রেক্ষিতে'। এই সময়কার প্রবর্তনার—'বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা'র—প্রকৃত অর্থ ও স্বরূপ এই।

কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এই 'নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা' ছিন্নপত্রে বাস্তবজীবন সম্পর্কে যে-বিস্তারিত, সূক্ষ্ম দৃষ্টির ঐশ্বর্য এনেছে, কাব্য তার প্রতিচ্ছায়া নিয়েই শুরু হয়েছিল। সে-দৃষ্টি চক্ষে নিয়েই 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় কবি দাঁড়ালেন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় 'নির্জন মাঠের মাঝে'; কল্পনায় দেখলেন গৃহে গৃহে 'নব হাসিমুখ'; দেখলেন—

কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস।

এ-জীবনবোধ ও বাস্তবদৃষ্টি ক্রমান্বয়ে দেখা যাবে, রূপকথাগুলি ছাড়া, 'শৈশবসন্ধ্যা' থেকে 'যেতে নাহি দিব' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিতায়। কবির দৃষ্টি ও কল্পনার প্রবণতা জীবনেরই দিকে তার সাক্ষ্য দেবে একাধিক কবিতা। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি দাঁড়িয়ে আছে কবিমানসের সন্ধিপথে; তার পরেই দেখব কবিমানস বাস্তব থেকে সরে আসবে; তার উন্মুখ অভিসার হবে অনন্তলোকে ও আত্মলোকে। কাব্য তার বাস্তবমুখীনতা হারাবে; নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষাই কাব্যে প্রবল হয়ে দেখা দেবে।

কাব্যে এ-বাস্তবনিষ্ঠ, মানবীয় দৃষ্টিকে হারানোর কারণটা রয়েছে কবি-চিত্তের ক্রমোন্নত ইতিহাসে, কিছুটা কবির স্বভাবপ্রবণতায়। রবীন্দ্রমানস মূলত রোম্যান্টিকধর্মী। একদিকে কল্পনা ও অনুভূতির মুক্তপক্ষে অনন্তের স্বরূপ-সন্ধান, ইন্দ্রিয়-যবনিকা ভেদ করে লোকাতীতের স্পর্শলাভ; অন্যদিকে আত্মার রহস্যসন্ধান—দুইধারাবিভক্ত এই আবিষ্কারপ্রয়াস রোম্যান্টিক কল্পনার অন্তর্নিহিত ধর্ম। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মানসী' পর্যন্ত কবিচিত্তের এ রোম্যান্টিক-ধর্মিতা একান্ত সুস্পষ্ট। তাই 'ছবি ও গানে'র এবং 'কড়ি ও কোমলে'র ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও তথাকথিত 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রমণ কোন কাব্যেই ঘটল না। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অন্তঃসারশূন্য দুঃখবিলাস; 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস; 'ছবি ও গানে'র স্বপ্নাবেশময় বাস্তবদৃষ্টি; 'কড়ি ও কোমলে'র ইন্দ্রিয়গত ও ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের যৌবনস্বপ্নমুগ্ধ দৃষ্টি; 'মানসী'র অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপানুসন্ধান—সমগ্র কাব্যধারা কবি-মানসের ব্যক্তিতান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক রোম্যান্টিক কল্পনারই সাক্ষ্য বহন করে।

'সোনার তরী'-তে সে-কল্পনা প্রথম বাস্তবজগতের একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রেরণা পেল; সে-প্রেরণার নিবিড় স্বাক্ষর দেখি 'ছিন্নপত্রে' এবং সমকালীন ছোট-গল্পে—'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা'র বহু বর্ণনায় ও কাহিনীতে। সেখানে বহির্লোক ও বাস্তবজগতের বলিষ্ঠ প্রাধান্য। কিন্তু কাব্য এল অতল মনের গভীরতম আকূতিকে বহন করে; 'প্রবল নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' কবিকে ডেকে নিয়ে গেল সৌন্দর্যের সন্ধানে। 'সোনার তরী'-তে তাই বিশ্বজীবন বা মানবজীবনের দূর-কল্পিত আভাসমাত্র আছে; ভাবলোকাবিষ্ট দৃষ্টি সে-জীবনকে স্পর্শ করে গেছে, তার অন্তরে প্রবেশ করে নি। সে-দৃষ্টি 'শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে' 'মুগ্ধ নয়নে'ই চেয়ে দেখেছে; দেখেছে ভরে-আসা আঁখিজলের বাষ্পকুহেলির মধ্য দিয়ে—

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখেদুখে আঁকা
লক্ষযুগের সংগীত মাখা
সুন্দর ধরাতল।

মানবজীবন সম্পর্কে এই দূর-কল্পিত, সাধারণিক দৃষ্টির হেতু কবির অন্তঃপ্রবেশ-অক্ষমতা নয়—সে ক্ষমতার প্রভূত দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত; তার প্রকৃত কারণ

কাব্যে কবিমানসের গভীরতম আকূতি,—যার নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চরণ বিশ্বজীবনকে স্পর্শ করে চলে গেছে নিরুদ্দিষ্ট লোকের সন্ধানে।

সুতরাং 'সোনার তরী'-তে দেখব মূলত দুটি বিরুদ্ধ কাব্যধারা—যার সূচনা দেখেছি পূর্ব-উদ্ধৃত চিঠিতে—"আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" 'সোনার তরী'র একদিকে দেখব এই সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানুষের প্রতি ভালবাসা—সে-ভালবাসা 'এই দুঃখদৈন্যে ভরা মানবের' গৃহকে, 'দীনমর্তবাসী এই নরনারীদের তপ্ত প্রেম-তৃষ্ণা'কে, 'মরণ-পীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম'কে, 'কী গভীর দুঃখে মগ্ন' 'উদাসী বসুন্ধরা'-কে সহসা 'দ্বিগুণ মধুর' করে দেখতে পেল। মধুময় হয়ে উঠল এই শ্যামল ধরণী আর এই নিঃসহায় মানুষগুলো। স্বভাবতই মন বিমুখ হল পূর্বের জীবনধর্ম-বিরোধী, কল্পলোকবিলাসী 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'র প্রতি। এই আসক্তি ও এই বিমুখতা 'পরশ-পাথর' থেকে 'প্রতীক্ষা' পর্যন্ত কবিতাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু এটা হল 'সোনার তরী'র কবির একদিকের মানসিক ইতিবৃত্ত। অন্যদিকে দেখব—সমস্ত চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন করে, নতুন প্রবর্তনা ও অভিজ্ঞতার প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করে, হঠাৎ কবির অন্তর্জীবনের নিবিড়তম আকুলতার প্রকাশ—দেখব 'সব কাজ ফেলে দিয়ে' 'আজন্ম-সাধন-ধন' 'মানস-সুন্দরী'র আবির্ভাব। 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' আবার 'প্রবল' হবে। শুধু নিরুদ্দেশ্যতা সীমিত হবে 'মানস-সুন্দরী'র রূপান্তরিত কল্পনায়। সে-ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক। তার পূর্বে 'সোনার তরী'র কাব্যধারাকে উৎস থেকে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

'সোনার তরী' কাব্যের প্রবেশপথে কাব্যেরই নামাঙ্কিত কবিতাটি বহু ব্যাখ্যায় কণ্টকিত। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে আর কোন রচনাই এত বিপুল বাক্যজালের সৃষ্টি করে নি। সে কণ্টকিত পথে নতুন অর্থ-মরীচিকার সন্ধান হয়তো বিপজ্জনক। তবু 'সোনার তরী' কাব্যের নতুন 'পরিপ্রেক্ষিতে', এবং

পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে, কবিতাটি পুনরালোচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কবিতাটির পূর্ণ অর্থ ও তার ব্যঞ্জনা আজও অস্পষ্ট, বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলেই আমাদের বিশ্বাস। সে-অর্থ ও ব্যঞ্জনার সন্ধানে ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য হবে।

কবিতাটি সম্পর্কে সব থেকে কৌতুকাবহ কথা এই যে কবিতাটিকে কবি নিজে একাধিকবার আলোচনা করেছেন, সুস্পষ্ট ভাষায় তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তথাপি বহু সমালোচকই সে-অর্থকে সম্পূর্ণ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ প্রধানত চারটি। প্রথমত, অবচেতনের নানা রেখা কবির অজ্ঞাতেই কাব্যে ধরা পড়ে; গহনমনের অনুভূতি দুর্জ্ঞেয় পথে কাব্যে তাদের চিহ্ন রেখে চলে। সুতরাং কবিতা সম্পর্কে কবির ব্যাখ্যা সব সময়ে শেষ কথা নয়। দ্বিতীয়ত, যৌবনে রচিত কবিতা যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় আলোচিত হয়, তখন স্বভাবতই বিশেষ পরিবেশে সৃষ্ট বিশেষ ভাবরূপ তার ব্যঞ্জনা হারায়; সুতরাং কবিতার অর্থেরও রূপান্তর সম্ভব। তৃতীয়ত, কবিতার বাহিরের এক অর্থের অন্তরালে যে-ভাবকল্পনার ছায়া পড়েছে, তা সৌন্দর্যমূর্তির ছায়া—কবিচিত্তের নিভৃত ইতিহাসের ছায়া; সে-সম্পর্কে প্রকাশ্য নগ্ন আলোচনা কবির সঙ্কোচকে জাগ্রত করেছে। এ-সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবির মানসীকাব্যের সমালোচনা (মানসীকাব্যপাঠের ভূমিকা: প্রবাসী, ১৩৪৭, আশ্বিন; এবং 'মানসী'র 'সূচনা': রচনাবলী, ২য় খণ্ড)। যে-অনন্ত প্রেম- ও সৌন্দর্যকামনা সে-কাব্যে উৎসারিত সে-কামনা সম্পর্কে কবির উক্তি একান্ত বিরল। সে-বিরলতা অর্থপূর্ণ।

চতুর্থ কারণটি রয়েছে কবির অর্থব্যাখ্যানের মধ্যেই। সুতরাং কবির বক্তব্য আগে শোনা প্রয়োজন। তা আজ একান্ত পরিচিত; তবুও কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক—

"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃতকর্ম কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্যকালে, এক দেশ হইতে অন্যদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহ করুণা করে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিতেছে, কিন্তু সে এইসব কীর্তিমানদের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।”

মনে রাখা প্রয়োজন, এটা কবি-**লিখিত** ব্যাখ্যা নয়। ১৩১৫ সালের চৈত্রসন্ধ্যায় কবি-**কথিত** উক্তি ; ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত রবি-রশ্মিতে স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সে-উক্তিকে প্রায় তিরিশ বছর পরে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং কবি যা বলেছিলেন তার ভ্রান্ত উদ্‌ব্যক্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট।

অথচ 'সোনার তরী' কবিতার অর্থসন্ধানে এই ব্যাখ্যাই, যতদূর জানি, সব থেকে বেশি চলে এসেছে, প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছে। চিন্তা করলেই দেখা যাবে ব্যাখ্যাটি যুক্তিপূর্ণ নয় এবং তাতে মন পরিতুষ্ট হয় না। চারুবাবু-বিবৃত কবিকথিত ব্যাখ্যাটি হল : মহাকাল কীর্তিমানদের রক্ষা করে নি কিন্তু তাঁদের কীর্তিকে রক্ষা করেছে ; অর্থাৎ তাঁদের কীর্তি ও নাম বেঁচে রইল কিন্তু তাঁরা বেঁচে নেই। স্থূল অমরত্বের প্রশ্ন ছাড়া কথাটির যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, শেক্‌স্পীয়র—এঁরা কোন্ অর্থে মহাকালের দ্বারা অরক্ষিত? তাঁদের কীর্তির মধ্যেই কি তাঁরা বেঁচে নেই? এ যুক্তির ত্রুটি রয়েছে।

কিন্তু অযৌক্তিকতা আরও সুস্পষ্ট হয় বিবৃতির শেষ বাক্যটিতে। অগ্নি ও তন্ত্র আবিষ্কারকদের প্রসঙ্গে দেখি, 'কীর্তিমান'দের নয়, ব্যক্তিকে নয়, তাঁদের '**নাম**'-কে ইতিহাস রক্ষা করে নি! কিন্তু হোমার-বাল্মীকি-ব্যাসের 'নাম' ইতিহাস রক্ষা করেছে। এঁদের ক্ষেত্রে, 'নাম' (ও কীর্তি) রক্ষিত, তাঁরা (কীর্তিমানরা) অরক্ষিত ; কিন্তু অগ্নি ও তন্ত্র আবিষ্কারকদের ক্ষেত্রে, 'নাম'ও অরক্ষিত। একদিকের দৃষ্টান্তে পেলাম ব্যক্তির অমরত্বের প্রশ্ন, অন্য দৃষ্টান্তে পেলাম, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিনামের অমরত্ব-প্রশ্ন।

সুতরাং চারুবাবুর বিবৃতিকে গভীরভাবে বিচার করলে এই দুই অযৌক্তিকতা সহজেই চোখে পড়ে।

কৌতূহল জাগে যখন দেখি কবির স্বলিখিত ব্যাখ্যা অনেক বেশি সতর্ক ; এ-ধরনের অযৌক্তিকতা সেখানে স্থান পায় নি। কবির নিজের ব্যাখ্যা যুক্তি-হীন নয়, কিন্তু তাতেও আমাদের মন সম্পূর্ণ সায় দেয় না। 'শান্তিনিকেতন' সপ্তম খণ্ডে কবি বলছেন—

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার সমস্ত জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটু-খানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।······যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হোলো—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য-ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।···" ('শান্তিনিকেতন' ৪ঠা চৈত্র, ১৩১৫)

প্রথমেই লক্ষণীয়, এখানে 'কীর্তিমান মানুষে'র উল্লেখ নেই, 'নাম' শব্দটিরও স্থান নেই। সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে 'অহং' শব্দটির—'কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।'

এ-অর্থ অনেকাংশে গ্রাহ্য ; কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। আবার যুক্তিতে আসা যাক। কীর্তির সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিমানদের 'অহং'ও কি কিছুটা চিরন্তন হয়ে থাকছে না? মহাকাল শুধু কীর্তিমানদের কীর্তিই রক্ষা করে না ; তাঁদের জন্যেও সসম্ভ্রমে সিংহাসন রচনা করে সুউচ্চ আসনে। কীর্তি রক্ষিত হয়, তারই সঙ্গে কীর্তি-মানও রক্ষিত হয় ; সুতরাং কীর্তিমানদের অহংও রক্ষিত হয়। স্বয়ং কবির এ-উক্তি, সুতরাং সসঙ্কোচেই বলতে হবে, এ-ব্যাখ্যাতেও মন সম্পূর্ণ ভরে না। মনে হয়, কবিতার অন্তরের কথাটিকে তার মর্ম-আখ্যানকে আচ্ছন্ন

করে রয়েছে বাহিরের এক অর্থ। সে-অর্থ অনেকখানি সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়।

সৌভাগ্যক্রমে ছিন্নপত্রই সেখানে পথ দেখায়। সে অর্থের গূঢ় সঙ্কেত মেলে ছিন্নপত্রেরই সাজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠিতে। (ছিন্নপত্র—পৃ ৭৬-৭৮)। যতদূর জানি, চিঠিটির 'মহৎ গুরুত্ব' আজও বিস্ময়কর ভাবেই অজ্ঞাত। কবিতাটির আলোচনায় তাকে নিঃসন্দেহে ভূমিগর্ভের অঙ্কুরের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে, কারণ 'সোনার তরী' কবিতার ভাবমূল রয়েছে সেখানে। চিঠিটির রচনাকাল আষাঢ় ১২৯৮, (২৩ জুন ১৮৯৬) ; 'সোনার তরী' কবিতার (ফাল্গুন, ১২৯৮) প্রায় আট মাস পূর্বে লেখা।

চিঠিটির প্রথমে পাই নদীবক্ষে নিস্তব্ধ দুপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ—"ছোট নদীটি এবং দুইপারের দুই ছোট গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় এই একটু-খানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলছে।" তার পরেই পাই কবির মনের খবর—"আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে। তার কারণ এই মনে হোলো আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত ; মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে ; এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে—···কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদু গুঞ্জন, সেই একটু আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য-পূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সতত সচেষ্ট, পীড়িত, জর্জরিত, ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়।······

······মানুষ সেখানে আপনার সকল কাজকে সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে—আপনার সকল ইচ্ছা চিহ্নিত করে রেখে দেয়—পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরী করে, জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চির-

স্মরণগৃহ নির্মাণ করে—তার পর অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয় কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারো খেয়ালে আসে না।"

ছিন্নপত্রের এ-চিঠির সঙ্গে 'সোনার তরী' কবিতার ভাবসাদৃশ্য একান্ত লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয়, চিঠিটির মাঝে প্রকৃতির 'বৃহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি' কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবকে ধরা দিয়েছে; এবং চিঠিটির শেষে 'মানুষের আপনার সকল কাজ, ও সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী' করবার প্রয়াস কবিতাটির শেষদুটি স্তবকে প্রতিফলিত হয়েছে। চিঠি এবং কবিতার মধ্যে ভাবের সাধর্ম্য সুগভীর। সুতরাং এ-অনুমান যুক্তিগ্রাহ্য যে, কবির সাজাদ-পুরের চিঠির মূলভাবনাই 'অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতি'র পুনরাবৃত্ত পরিবেশে একাধিকবার মনে এসেছে। তার পর কোন এক ফাল্গুনের দিনে সেই আষাঢ়ের—(২৩শে জুন, ১৮৯১)—দ্বিপ্রহরের স্মৃতিই কালের ব্যবধানে রূপান্তরিত হয়ে 'সোনার তরী' কবিতাটি সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং এ-সিদ্ধান্তে আসা যাক যে 'সোনার তরী' কাব্যের পূর্বে, 'ছিন্নপত্র' লেখার সময়ে, 'নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত প্রকৃতির মধ্যে' নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের মাঝে কবির মনে এ-চিন্তা জেগেছিল যে এই 'নির্বিকার উদার শান্তি'র পটভূমিকায় মানুষের আপন কীর্তিকে, সকল কাজ ও চেষ্টাকে চিরস্থায়ী করবার প্রয়াস 'নিষ্ফল, কাতরতাপূর্ণ'। এ-চিন্তাটির বীজ রইল অন্তরে সুপ্ত।

কিন্তু সাজাদপুরের চিঠিটির প্রায় আটমাস পরে যখন কবিতাটি রচিত হল, বিশেষ ভাবচিন্তার বীজ সময়ের ব্যবধানে যখন কবিতায় পল্লবিত হল—তখন তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটল। পস্টারিটির চিন্তা, মানুষের সকল কাজকে ও চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করার চিন্তা, অনেক নাম বিস্মৃত হওয়ার চিন্তা কবিতায় রূপ নিল তরীচালক মহাকালের কল্পনায়, মানুষের জীবনসাধনাকে গ্রহণ করার এবং মানুষের অহংকে গ্রহণ না করার কল্পনায়। কবির ব্যাখ্যায় এই অর্থই ফুটে উঠল তার কারণ এ-চিন্তারই বীজ এসেছিল সে-যুগের কবির মনে।

কিন্তু সে-চিন্তা ও কল্পনা কবিতায় রূপায়িত হবার সময়ে তাদের অন্তরালে কবির মানস-ইতিহাস এসে দাঁড়াল; তরীচালক মহাকালের কল্পনায় প্রক্ষিপ্ত হল কবির মানসীমূর্তি, আর এক সত্তা জেগে উঠল মহাকালের কল্পনারই অন্তরালে। দীর্ঘসাধনার কল্পমূর্তি, কবির মানসীই আচ্ছন্ন করল মহাকালের

ভাবচিন্তাকে, পরিব্যাপ্ত হল সমগ্র কবিতায়, ছাপিয়ে উঠল অন্য সব ভাব ও কল্পনাকে। আর এক কল্পনার ধারা প্রবাহিত হল কবিতার মধ্যে। কবির নানা ব্যাখ্যায় সে-ভাবধারার কোন আভাসই মেলে না। সে-সব ব্যাখ্যার বীজের ইতিহাস—পস্টারিটির চিন্তা—মহাকালে রূপান্তরিত হয়ে স্থান পেয়েছে, কিন্তু অতীতের ভূমিগর্ভের কাহিনী, মানসীকল্পনা, স্থান পায় নি। ঠিক এই কারণেই কবির অর্থনির্দেশ অসম্পূর্ণ; তাতে আমাদের মন সায় দেয় না।

অতীতের ভূমিগর্ভের ইতিহাসই 'সোনার তরী' কবিতাটিকে ব্যঞ্জনাময়, রহস্যনিবিড় করে তুলেছে। কিন্তু কবিতার অর্থ বোধহয় এবার সুস্পষ্ট হবে। মানসী সত্তা আজ নিরাসক্ত তরীচালক হয়ে দেখা দিলেন; প্রচ্ছন্ন রইলেন মহাকালের কল্পনার অন্তরালে। একাগ্র, উৎকণ্ঠ কামনা থেকে, সৌন্দর্যসত্তার এ-নিরাসক্ত কল্পনা কবিমানসের দীর্ঘ ষোলমাসের ইতিহাসকে হঠাৎ উন্মুক্ত করল: 'মানসী'র আবিষ্ট কল্পনা থেকে আজ অনেক দূরে সরে গেছেন কবি; তাই একদা 'জীবন-মরণ-হরণকারিণী' আজ সুদূরবর্তিনী; অস্পষ্ট তাঁর মুখচ্ছবি; তবু যেন পরিচিত—

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

আজ মন্থর, উদাসীন তাঁর গতি—

ভরা পালে চলে যায়,
কোনদিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু'ধারে।

কবি তাঁর নির্জনজীবন-সাধনার সোনার ফসল ফলিয়ে তুলেছেন। আজ তাঁর মানসলক্ষ্মীর কাছে আবেদন 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'র আবেগোচ্ছল কণ্ঠে নয়; 'নিভৃত আশ্রম'-এর 'মাধুরীমূর্তি' স্থাপনবাসনার সুরে নয়, 'সুরদাসের প্রার্থনা'র অনুতাপদগ্ধ কণ্ঠে নয়। আজ দেখি শুধু এই কামনা—

যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
তুমি শুধু নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

সুতরাং আমরা দেখলাম, মানসীর দীর্ঘ সন্ধানের পর কবি তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। সে-সন্ধান ব্যর্থ, নিবিড় মিলনকামনা নিষ্ফল; ধরণীর ঐশ্বর্যে, মানুষের দুঃখসুখের তরঙ্গে অবগাহন একান্ত কাম্য—এই প্রতীতি নিয়েই কবির দৃষ্টি জীবনের দিকে নিক্ষিপ্ত হল। সে-দৃষ্টির প্রকাশ দেখেছি কাব্যরচনার পূর্বে ছিন্নপত্রের চিঠিতে। তার পর কিছুকাল পূর্বের পস্টারিটি-চিন্তাটি যখন কাব্যে রূপ নিল তখন সে ভাবচিন্তায় মানসীকল্পনার ছায়া এসে পড়ল; সে-কল্পনা রূপান্তরিত উদাসীন নিরাসক্ত তরীচালকের কল্পনায়। কবির বেদনাঘন অভিজ্ঞতা—তাঁর মানসীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটবে না; তিনি দুর্লভ, উদাসীন, দূরবর্তিনী। কবিও নতুন জীবনের প্রবর্তনায় অনেকদূরে সরে এসেছেন, তাই ঝাপ্‌সা তাঁর মূর্তি। কবির এখন একমাত্র কামনা: 'তুমি যেখানে খুশি যেতে চাও, যাও; তোমার প্রসন্ন প্রসাদ যারে খুশি তারে দাও! আমাকে নাও বা না নাও, আমার জীবনসাধনার ফসল তুমি গ্রহণ কর।'

অন্তিম-পূর্ব স্তবকের প্রথমে দেখি কবির সঞ্চিত সাধনা তাঁর সোনার ধান মানসী নিঃশেষে গ্রহণ করলেন—

সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে···।

তখন জাগ্রত হল কবির বহুকালসুপ্ত আকাঙ্ক্ষা—সমগ্র মানসীকাব্যের আকাঙ্ক্ষা—নিবিড় মিলনের আকাঙ্ক্ষা। কবি বলে উঠলেন—

এখন আমারে লহ করুণা করে!

এ-কথাটি কবিতার আলোচনায় বিস্ময়কর ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে যে এর আগেই, চতুর্থস্তবকের শেষে, কবির 'শুধু' মাত্র প্রার্থনা ছিল—

তুমি শুধু নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

কিন্তু অন্তিমপূর্ব স্তবকে সোনার ধান 'থরে বিথরে' তরীতে তুলে দেবার পরেই কবির প্রার্থনা ভিন্নরূপ নিল, আরও ব্যাকুল হল—

এখন আমারে লহ করুণা করে।

কবির শেষ মিনতি নিষ্ফল হল। ছোট তরী কবির সাধনসম্পদে ভরে উঠল, সৌন্দর্যলক্ষ্মী তা গ্রহণ করলেন, কিন্তু কবির স্থান হল না—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,—ছোট সে তরী,
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

কবির 'সোনার ধান'কে গ্রহণ করে, তাঁর অন্তিম প্রার্থনাকে ব্যর্থ করে, 'মানসী' নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

'সোনার তরী' কবিতায় এই নিভৃত ইতিহাসের স্বাক্ষর রয়েছে; রয়েছে মানসী কাব্যের দীর্ঘ, অশান্ত অন্তরাখ্যানের পরিণতি। 'সোনার তরী' কবিতায় ষোল মাস পরে মানসী কাব্যেরই অন্তিম যবনিকা নেমে এল।

নতুন অধ্যায় সূচিত হল কয়েকটি রূপক কবিতায়। পূর্বে দেখেছি কোন আত্মমুখ ভাবকল্পনা থেকে যখন কবি মুক্তিলাভ করেন, তখনই দেখা দিয়েছে বিষয়াশ্রিত, নৈর্ব্যক্তিক কবিতা। তারা অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির জয়পতাকা। সে-মুক্তিচেতনার লঘুসৃষ্টি 'সোনার তরী'র রূপক কবিতা ক'টি। তাদের রচনার মানসিক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার কথা আছে 'ছিন্নপত্রে', রূপক কবিতাগুচ্ছের প্রায় আটমাস পূর্বে লেখা— "কাল সন্ধ্যাবেলায় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম—নদীটি ছোট্ট—যমুনার একটি শাখা—এক পারে বহুদূর পর্যন্ত সাদা বালি ধূ ধূ করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই, আরএক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম।······ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল,······এবং গাছপালা কুটীর সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপ্‌সা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল —তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলার রূপকথার অপরূপ জগৎ— যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি—অল্পদিন হোলো সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম্‌ছম্‌ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্রে তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।······"(ছিন্নপত্র, ১৬ই জুন, ১৮৯১, পৃ ৬৭-৬৮)

পরে আর একটি চিঠিতে লিখছেন—"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণবকবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলায় যদি কতকগুলি ভালো ভলো মেয়েলি রূপকথা জানতুম, এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হোত।" (ছিন্নপত্র—শিলাইদহ, ৮ই এপ্রিল, ১৮৯২)। সম্ভবত এ চিঠির পরেই রচিত 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (চৈত্র ১২৯৮); আরও পরে 'নিদ্রিতা' (১৪ জ্যৈষ্ঠ) ও 'সুপ্তোত্থিতা' (১৫ জ্যৈষ্ঠ)। এরা সাধারণ গতানুগত রূপকথা। তবু চমক লাগায় 'নিদ্রিতা' কবিতাটির প্রথম স্তবকটি—

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার,
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
... ...
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে।
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।

এ কি নিতান্তই রূপকথা, না রূপকের মাধ্যমে কবিরই আত্ম-কাহিনী? মনে পড়ে সদ্য-উদ্ধৃত ছিন্নপত্রের শেষ লাইন—'...এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' এ-সিদ্ধান্ত অসংগত হবে না যে 'নিদ্রিতা' কবিরই আত্মকাহিনী—'স্মৃতি'টা ছেলেবেলাকার এবং যৌবনের; 'মোহাচ্ছন্ন, মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগৎ'টা অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ; 'এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে' কবির সে কল্পজগৎভ্রমণেরই ইঙ্গিত, এবং 'অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে' ঘুমন্ত 'রাজবালা' কবির মানসলক্ষ্মী, যাকে বরমাল্যে ভূষিত করেছেন 'একদা রাতে নবীন যৌবনে'।

'নিদ্রিতা' রূপকের বেশে কবির আবাল্যসৌন্দর্যসাধনার কাহিনী; সৌন্দর্যের বেদীমূলে আত্মসমর্পণের নিভৃত উপাখ্যান—

ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।"

ছিন্নপত্রের সূচনা নিয়ে, সোনার তরী কাব্যে শুরু হয়েছিল আত্মগত, অধ্যাত্মীয় কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে বহির্লোকে আসার প্রয়াস। কিন্তু তার প্রথম প্রকাশেই দেখি আত্মরত অনুচিন্তনের ছায়া। বস্তুত সোনার তরী কাব্যের একদিকের ব্যর্থতা এই যে, যে জীবননিষ্ঠ বাস্তবদৃষ্টি নতুন পথে আশার আলোক বহন করেছিল, যে অন্তর্মুক্তির সূচনা এনেছিল, তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, তা অন্তর্দ্বন্দ্বের আবর্তে মুছে গেল। এ-ব্যর্থতা সোনার তরী কাব্যের গভীর ত্রুটি নয়, এ-ব্যর্থতা কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

রূপকথা ক'টির মাঝে রয়েছে সোনার তরী কাব্যের মূলগত সুরটিকে ব্যক্ত করে 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটি (ফাল্গুন ১২৯৮)। রূপক কবিতায় কাব্যের ভাবান্তরের যদি ইঙ্গিত থাকে, 'শৈশবসন্ধ্যা'য় তার অভ্রান্ত উল্লেখ রয়েছে। ছিন্নপত্রের মানবীয় সুর প্রথম উচ্চারিত এই কবিতায়, যেখানে সহসা-গেয়ে-ওঠা বালক-পথিকের

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তমসুরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দুখান।

বালকের কণ্ঠস্বর শুধু সন্ধ্যার আঁধারকে কাটল না, তার তীব্র আঘাত দ্বিখণ্ডিত করল অন্তরলোকাবিষ্ট চিত্তের পুঞ্জীভূত অন্ধকার। সোনার তরী কাব্যের প্রথম অরুণোদয় এই কবিতায়; প্রথম কাব্যপথে উন্মুক্ত হল ছিন্নপত্রের মানবীয় দৃষ্টি; প্রথম প্রসারিত হল সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ জীবনধারা—

শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে,
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,

কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস।……

সোনার তরী কাব্যে এই প্রথম ধ্বনিত হল 'সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব'; প্রথম সূচিত হল ছিন্নপত্রের মানবচেতনা ও দৃষ্টি—এই 'জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী'র কোলে আকাঙ্ক্ষা-অভিহত মানুষের সুস্পষ্ট উল্লেখ। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে 'শৈশবসন্ধ্যা'র এই মানবীয় দৃষ্টি ও অনুভূতির বিবরণ মেলে। কবি যেন অন্তরে অন্তরে বিরাট জীবনের স্পন্দন অনুভব করছেন, জীবনতরঙ্গের প্রতিটি বিক্ষোভ নাড়ীতে নাড়ীতে বোধ করছেন—

"অন্ধকারের আবরণের মধ্য দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শতসহস্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল।

আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।" (ছিন্নপত্র, জুলাই ১৮৯৪)

'সোনার তরী' এবং 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতার রচনাকাল ফাল্গুন, ১২৯৮। কবিতাদুটির মাঝে সময়ের ব্যবধান সামান্য এবং এদের পারম্পর্য অর্থপূর্ণ। 'শূন্যনদীর তীরে পরিত্যক্ত' রিক্ত কবি জীবনের পথসন্ধিতে এসে দাঁড়ালেন। তরীর কর্ণধার অকূলের পথে নিরুদ্দেশ হল; অপসৃত হল কল্পলোকের দিব্যমূর্তি। সামনে প্রসারিত হল দুঃখদৈন্যে ভরা মানবগৃহ, হৃদয়ে এসে প্রবেশ করল তার 'চিরন্তন কলধ্বনি'। এ দৃষ্টি ও চেতনা নানা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেল ছিন্নপত্রে; ছোটগল্পে তার সুবিস্তীর্ণ আলোকসম্পাত ঘটল; কিন্তু কাব্যে ঘটল সে চেতনা ও প্রবর্তনার সাধারণিক উল্লেখমাত্র।

এ-প্রসঙ্গেও কীট্‌সের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য চিত্তাকর্ষক। জীবন-প্রাঙ্গণে মানবহৃদয়ের বিক্ষোভ—'the agony and strife of human

hearts'—কীট্‌সের কাব্যজীবনের একান্ত কামনা ছিল এ কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 'কড়ি ও কোমল' থেকে তা রবীন্দ্রকাব্যেরও কামনা হয়েছিল, আমরা পূর্বে তা দেখেছি। 'সোনার তরী'তে সে-কামনা সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার প্রবল, বিরুদ্ধ আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে আবার জীবনের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু কীট্‌সের মতই রবীন্দ্রনাথ 'agony and strife of human hearts'কে, মানুষ ও জীবনকে, কাব্যের মূলতম প্রেরণারূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। কীট্‌স্ পারেন নি, কারণ তাঁর ইন্দ্রিয়সম্ভোগী, সৌন্দর্যপিপাসু মনের প্রবণতা ছিল ভিন্ন দিকে। রবীন্দ্রনাথ পারেন নি—পুনরুক্তি প্রয়োজন, শুধু কাব্যে—কারণ তাঁর কাব্যকে বারবার অন্তর-লোকাভিমুখী করেছে—ইন্দ্রিয়গত নয়—ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের অনন্ত পিপাসা। কীট্‌স্‌কে ভুলিয়েছিল দুর্লভ মুহূর্তের নিমন্ত্রণ ; রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়েছিল দুর্লভ মুহূর্তে অসীমের স্পর্শ, অপরূপের নিমন্ত্রণ।

নিজের এই স্বভাবপ্রবণতার কথা কীট্‌স্ কিছুটা জানতেন ; তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ আদর্শ শেক্‌স্‌পীয়র—এবং শেক্‌স্‌পীয়রের সেই সুদুর্লভ ক্ষমতা, কীট্‌স্ যাকে বলেছিলেন 'Negative capability'. এই 'নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তি' কীট্‌সের পঁচিশ বছরের দুঃখব্যাধিপীড়িত জীবনের শেষভাগে দেখা দিয়েছিল তাঁর অসমাপ্ত 'Hyperion'এ, তাঁর 'Odes'-এ। রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছরের কাব্যজীবনে তার কিছু রেখা পরিস্ফুট—কিন্তু কাব্যে নয়, ছোটগল্পে। কাব্য রইল অন্তরের নিবিড়তম আকুতির প্রকাশক্ষেত্র হয়ে।

রূপকথার মন্থর রোম্যান্টিক পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে কবি লিখলেন 'তোমরা ও আমরা' (১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)—সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের কবিতা। রূপকথার কবি ফিরে এলেন বাস্তবে। নরনারীর প্রেমের প্রকাশবিভিন্নতা কৌতুকোচ্ছল দৃষ্টিতে, লঘুছন্দের মাধুর্যে, ফুটে উঠল। সাবলীল, পরিহাস-তরল কাব্য রবীন্দ্রমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেবে 'ক্ষণিকা' কাব্যে। তার প্রথম আভাস রয়েছে 'তোমরা ও আমরা'য়—

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও,
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।'

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।

প্রশান্ত কৌতুক, মধুর পরিহাস, দীপ্ত ব্যঙ্গ—কাব্যে এমন সার্থক সমন্বয় পূর্বে পাই নি। অন্তর্বিক্ষোভমুক্ত, বাস্তবজীবনোন্মুখ দৃষ্টিই কাব্যে সৃষ্টি করল এ সহজ সৌন্দর্য।

তবু এই কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিই শেষ কথা নয়। লাস্যময়ী নারীর অন্তরে রয়েছে 'স্নেহ-প্রেম-করুণা'য় বদ্ধ গৃহলক্ষ্মী—এ-কথাটি ব্যক্ত হল ঠিক পরদিন রচিত 'সোনার বাঁধন' কবিতায় (১৭ই জ্যৈষ্ঠ)। নারীর কঙ্কণশোভিত বাহু নিখিলের শুভচিহ্ন ; মানুষের সেবায় ও কর্মে তা নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের ভাবতন্ত্রী কল্পনা চটুল ব্যঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে স্বধর্ম ফিরে পেল।

সেইদিনই রচিত হল পরের কবিতা 'বর্ষাযাপন'। বর্ষার তিমিরঘন পরিবেশে কবি কল্পনায় উপলব্ধি করছেন যক্ষবধূর নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, রাধার ব্যাকুল নিশীথ-অভিসার। কবিতাটির শেষে দেখি মানুষের জীবনধারার, তার 'ছোটো প্রাণ' ও 'ছোটো ব্যথা'র অন্তরঙ্গ চেতনা ফুটে উঠেছে ; তাদের 'ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি' কবির কানে অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে—

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশ দিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মতো—

'কড়ি ও কোমল' থেকে অনবচ্ছিন্ন এ-চেতনা 'সোনার তরী'তে আরও গভীর ও সূক্ষ্ম। 'শৈশবসন্ধ্যা'য় বালকের 'তীব্র উচ্চতান' যে-কথা নতুন করে স্মরণ করালো, তার বিচিত্র প্রকাশ দেখব এ-কাব্যে।

রূপকের আশ্রয়ে শ্লেষতীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টি আবার পেলাম 'হিং টিং ছট্' কবিতায় (১৮ জ্যৈষ্ঠ)। সেকালের কিছু নব্যহিন্দুর অর্থহীন বাগাড়ম্বর তীব্র বিদ্রূপে উপহসিত হল। এর পিছনে রয়েছে কবির সহজ বাস্তবদৃষ্টি, সহজ সত্যানুরাগ। 'হিং টিং ছট্' সেই জীবনবোধেরই পরোক্ষ, কৌতুকোচ্ছল প্রকাশ।

এই জীবনাশ্রয়ী সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও বোধের ত্রিধারাপ্রকাশ দেখি পত্রের তিনটি কবিতায়, 'পরশ-পাথর', 'দুই পাখি' ও 'আকাশের চাঁদ'। 'পরশ-পাথর'-এ (১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) ক্ষ্যাপার জীবনবিরুদ্ধ সন্ধান চলেছে পরশ-পাথরের জন্যে। সে রয়েছে অবাস্তব দুর্লভের প্রত্যাশায়। সামনে প্রসারিত আপাততুচ্ছ জীবন; ক্ষ্যাপার কাছে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। তার পর হঠাৎ কোন্ অজ্ঞাত শুভক্ষণে একদিন সেই পরশ-পাথরেরই ছোঁওয়া লেগে তার লোহার শিকল সোনা হয়ে গেছে তা সে জানতেও পারে নি; শুধু অভ্যাসমত সে নুড়ি কুড়িয়েছে, লোহার শিকলে ঠেকিয়েছে, আবার দূরে ফেলেছে। অতি সহজ ও সাধারণের চিরসম্পদ্‌কে তুচ্ছ করে, জীবনকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়ে, দুর্লভ ও অসাধারণের পিছু ছুটে ক্ষ্যাপার জীবন ব্যর্থ হল—

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল-ভর,
বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

রূপকের মাধ্যমে কাব্যে প্রথম উদ্ব্যক্ত হল পূর্বজীবনের অসার্থকতা। আজ কবির এ-উপলব্ধি—অনন্ত সৌন্দর্যের কামনা ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজার মতই অবাস্তব, জীবনবিরোধী। পরশ-পাথরের দুর্লভ স্পর্শ জীবনের আপাত-তুচ্ছতায় লুকিয়ে রয়েছে। অসীম সৌন্দর্য পরিকীর্ণ জীবনের পথে পথে। অসম্ভবের প্রত্যাশায় ক্ষ্যাপা এ-সত্যকে ভুলেছিল; অনন্ত সৌন্দর্যের আকুলতায় কবিও এ সহজ সত্যকে ভুলেছিলেন।

একটি কথা বারবার ভারি কৌতূহল জাগায়। 'নিদ্রিতা' কবিতায়, একটু পূর্বে দেখেছি, রূপকথার মাঝে আভাসে ধরা পড়েছে 'মানসী'র অনুসন্ধান। 'পরশ-পাথর'-এও সে আন্তর ইতিহাস আবার ফুটে উঠল, হয়তো কবির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। যে-'চিরমনোব্যাকুলতা' অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল, তার স্মৃতি আভাসে ইঙ্গিতে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, বারবার ফিরে ফিরে দেখা দিচ্ছে। মনোবিজ্ঞানী হয়তো বলবেন 'সোনার তরী'র জীবননিষ্ঠ দৃষ্টি সত্ত্বেও অবচেতন মনে এখনও সক্রিয় মানসীর সৌন্দর্যকামনা; তাই সে-কামনা বারবার আভাসে জেগে উঠছে। এ অনুমান খুব ভুল হবে না। অন্তর্জ্ঞানের এই সৌন্দর্যচেতনা ও কামনাই দেখা দেবে অদূরে 'মানসসুন্দরী' কবিতায়।

'পরশ-পাথর'এর এই অবচেতন-ইঙ্গিতে ফিরে আসা যাক। সমুদ্রতীরে ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর সন্ধানের পর তৃতীয় স্তবকে পাই সমুদ্রের আদিম ইতিহাস —সুরাসুরের সিন্ধুমন্থন—

মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।
অতলের পানে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে।

তার পরের লাইন ক'টি ভারি কৌতূহল জাগায়—

বহুকাল স্তব্ধ থাকি, শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।

প্রশ্ন জাগে, এ কার ইতিহাস ? স্তব্ধ হৃদয়ে মহাসমুদ্রের চিরন্তন গীতি শুনে, অতলজলে ঝাঁপ দিয়ে 'অতুলসুন্দর লক্ষ্মীদেবী'র দর্শন—একি কবিরই আত্ম-ইতিহাস নয় ?

কিন্তু উপস্থিত কবিদৃষ্টিতে সে ইতিহাস জীবনবিরোধী প্রয়াসের ইতিহাস।

কালানুক্রমে ভঙ্গ করে মাসাধিক পরে রচিত 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটি (২২ আষাঢ়, ১২৯৯) আগে নেওয়া যাক। রূপকে যে-কথা বলা হল 'পরশ-পাথর'-এ, আরও সুস্পষ্ট করে সেই কথাই ব্যক্ত হল 'আকাশের চাঁদ'-এ। রূপকের আবরণ এখানে স্বচ্ছ ; জীবনপ্রীতি ও নিষ্ঠা এখানে নিবিড়—

এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।

দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন
আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি
কহে ম্রিয়মাণ মন,
"শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।"

প্রকৃতি ও বাস্তবচেতনায়, মানুষের জীবনধারার নিত্যসচল 'অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা'য়, 'আকাশের চাঁদ' 'ছিন্নপত্র' ও 'সোনার তরী'র নতুন উপলব্ধির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

'পরশ-পাথর' ও 'আকাশের চাঁদ'-এর মধ্যে রয়েছে দুটি কবিতা—'বৈষ্ণব-কবিতা' (১৮ আষাঢ়, ১২৯৯) এবং 'দুই পাখি' (১৯ আষাঢ়, ১২৯৯)।

'পরশ-পাথর'-এর পর ঠিক একমাস কোন কবিতা পাই না। তার পর দেখি ভিন্ন সুরে 'বৈষ্ণব-কবিতা'—দেখি তার দেববিমুখ, অবাধ্য মানবতা। (বৈষ্ণব-কবির বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমগাথা শুধু বৈকুণ্ঠের দেবতার জন্যই নয়, শুধু ভক্তের নির্জননিবেদিত অর্ঘ্য নয়। তা মানুষের সৃষ্টি, মানবপ্রেমের প্রবর্তনা তার অন্তরালে ; মানুষের 'তপ্ত প্রেম-তৃষা' নিবারণেই তার চরম সার্থকতা। বৈষ্ণবের গান দেবতার জন্য হোক ক্ষতি নেই। কিন্তু সে-গান যদি দীনমর্তবাসী এই নরনারীদের হৃদয় আপ্লুত করে, যদি—

শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা ; মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে-নদীটি ছুটে,
মোদের কুটির-প্রান্তে যে-কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে.........

তাতে, 'তোমার কি তাঁর বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?' মনে পড়বে ছিন্নপত্রের গভীরব্যঞ্জনাময় উক্তিটি—"এইজন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি।" এই 'স্বর্গের উপর আড়ি' 'বৈষ্ণব-কবিতা' থেকেই কাব্যে একাধিক বার ফুটে উঠবে।

একটি তথ্য বিশেষ লক্ষণীয়: 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় একটি বিরোধের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন হল। একদিকে রয়েছে সংরক্ত মানবধর্ম, অন্যদিকে রয়েছে বৈষ্ণবকবি-সৃষ্ট বৈকুণ্ঠে প্রেমলোকের কল্পনা। প্রথম স্তবকেই এ-বিরোধের আভাস ফুটেছে—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা··· ··· ··· ··· ···
··· ··· ··· ···একি শুধু দেবতার।

বিরোধী ভাবকল্পনা এল তার পরেই—

এ সংগীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?

এ-কবিতায় মানবতন্ত্রেরই জয়গান ঘোষিত হল বটে; কিন্তু মনে হয় কবিকল্পনায় বৈকুণ্ঠের প্রেমলোক এক সূক্ষ্ম বিরোধের আভাস আনল। সেই বিরোধই সুস্পষ্ট হল পরদিন রচিত 'দুই পাখি' কবিতায়। কল্পজগৎ ও বাস্তবজগতের দুই প্রতীক হয়ে এল বনের পাখি ও খাঁচার পাখি। দুই বিরুদ্ধলোকের আকৃতি নিয়ে এল তারা।

সে-প্রসঙ্গে আসার পূর্বে 'জীবনস্মৃতি'-তে কবির উক্তি শোনা যাক। কবি বলেছেন বালক-বয়সে বদ্ধ ঘরের ভিতর থেকে বিশ্বপ্রকৃতিকে 'আড়াল আবড়াল' হতে দেখতেন—

"বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত···। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।···বড় হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে···।"

কিন্তু এ-কবিতার অন্তরের কথা কবি বলেন নি। 'দুই পাখি' একদিক থেকে 'পরশ-পাথর' ও 'আকাশের চাঁদ'-এর পরোক্ষ প্রতিবাদ; এবং সে প্রতিবাদের ইঙ্গিত সুগভীর। জীবনকে উপেক্ষা করে কল্পলোকে পরশ-পাথর অন্বেষণ ব্যর্থ, জীবনের তুচ্ছতায় লুকিয়ে আছে সোনার স্পর্শ—এই

কথাই বলা হয়েছিল সে-কবিতায়। 'দুই পাখি'তে সে শঙ্কাহীন নিশ্চয়তা নেই। এখানে একান্ত হয়ে উঠেছে ভাবলোক ও বাস্তবলোকের অন্তর্লীন বিরোধ—যেন কবির কাছে এ-দু'টি বিরুদ্ধ জগতের সমান অস্তিত্ব অধিকার ;- কিন্তু এদের মধ্যে কোথাও সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন না কবি—

বনের পাখি বলে— আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখি বলে— খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখি বলে— আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখি বলে— নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।

একদিকে কবির 'নিরুদ্দেশ, গৃহত্যাগী সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষা'র প্রতীক বনের পাখির মুক্তপক্ষ সঞ্চলন, অন্যদিকে 'বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা'র প্রতীক খাঁচার পাখির নিরুদ্বেগ জীবনাসক্তি। 'দুই পাখি' স্মরণ করাবে পূর্ব-উদ্ধৃত প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কিছুকাল পূর্বের চিঠিটি (১৭ মাঘ, ১২৯৭)—"এখন এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে…।" এই দ্বন্দ্বই হবে 'সোনার তরী'র মধ্য-ইতিহাস ; তার বিচিত্র প্রকাশই কাব্যের মূলতম আখ্যান।

('বৈষ্ণব-কবিতা' এবং 'দুই পাখি' 'পরশ-পাথর'-এর জীবনধর্মী কামনার পর কাব্যে আনল বিরুদ্ধ সুর। কিন্তু তিনদিন পরে রচিত 'আকাশের চাঁদ'-এ জীবনধর্মী কবির প্রত্যয়ই আবার প্রোচ্চারিত হল। বিরোধের অঙ্কুর রইল ভূমিগর্ভে সুপ্ত।

প্রায় চার মাস পরে পাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি (১৪ কার্তিক, ১২৯৯)। ছিন্নপত্রের জীবনকামী দৃষ্টি ও অনুভূতি দেখেছি 'পরশ-পাথর' ও 'আকাশের চাঁদ'-এ ; মানবধর্মী দৃষ্টি পেয়েছি 'বৈষ্ণব-কবিতা'য়। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় দেখি ছিন্নপত্রের এবং সোনার তরীর মূলতম প্রকৃতিকল্পনা : অসহায়, বেদনাক্লিষ্ট ধরিত্রী—'সর্বশক্তি মরণের' সঙ্গে তার নিরন্তর সংগ্রাম

চলেছে ; তার 'বিশাল হৃদয়ে অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য এবং বিষাদ' ; তার 'দরিদ্র মর্ত্য-হৃদয়ের অশ্রুধনগুলিকে কোলে করে' তার অনন্ত শঙ্কাতুরতা। *

প্রকৃতির এই নিঃসহায় মূর্তির প্রতীক হয়ে দেখা দিল চার বছরের 'বিষণ্ণ-নয়ন' মেয়েটি ; প্রকৃতির 'বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দন' ধ্বনিত হল কন্যার মৃদু-উচ্চারিত কয়টি শব্দে—'যেতে আমি দিব না তোমায়'—

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।'···
··· ··· হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।

সোনার তরী কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতি সমাচ্ছন্ন এই ভাবকল্পনায়।

অনন্তকাল বিশ্বের অন্তরে চলেছে এই চিরগর্বিত সঙ্কল্প, চিরব্যাকুল প্রয়াস, চিরলাঞ্ছিত পরাজয়। কবিতাটির শেষে এ-ভাবকল্পনার অসামান্য প্রকাশ দেখি অনুভূতির প্রগাঢ়তায়, সংরাগের সংযত ব্যঞ্জনায় ; যেন অনুপ্রাণিত

*'যেতে নাহি দিব' সম্পর্কে কবির একটি উক্তি সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্তিটি বহুকাল অপ্রকাশিত ছিল। সমুদ্রপথে জাহাজ থেকে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখছেন, ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে—

"······আমার বুদ্ধি প্রমাণকে অস্বীকার করে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষ-বোধকেও শ্রদ্ধা করে। দুইয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধও ঘটে, তখনি রহস্য বড় কঠিন ও বড় দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের চরমবোধ কিছুতেই তাকে চরম বলে মানতে চায় না—কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এত দুঃসহ বেদনা। আমার 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা।"

('দেশ' পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৫৭)

কবির দৃষ্টিসম্মুখে সহসা উন্মুক্ত হল বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্থল, সহসা উদ্ভাসিত হল উদাসী বসুন্ধরার অন্তর্বেদনা—

মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন 'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর।

ছিন্নপত্রের বাস্তবদৃষ্টি, ছিন্নপত্রের নিঃসহায় বিষণ্ণ-উদাসীন ধরিত্রীর কল্পনা—দুটি দিকই কবিতায় প্রতিফলিত হল। কিন্তু কাব্যে কবিমানসের বিশিষ্টতা ও প্রবণতা প্রণিধানযোগ্য। ছিন্নপত্রের বাস্তবদৃষ্টি,—'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা' কাব্যে রূপান্তরিত হল ক্ষুদ্র ও বিশেষ থেকে বিশাল ও সার্বভৌম কল্পনায়। চার বছরের মেয়ের স্পর্ধিত 'যেতে আমি দিব না তোমায়' 'ছোটো প্রাণ' ও 'ছোটো ব্যথা'কেই কাব্যে প্রথমে স্থান দিল; কবিতার উৎসই সে স্পর্ধিত বাক্যে। কিন্তু ছোট প্রাণের ছোট ব্যথার কল্পনায় কবিতা শেষ হল না; সে বেদনা প্রক্ষিপ্ত হল 'অনন্ত সংসারে', সমগ্র বিশ্বের অন্তরে। কাব্যে এল সার্বিক কল্পনার বিরাটত্ব। বিশেষ ও সার্বভৌমের অপূর্ব সমন্বয়ে 'যেতে নাহি দিব' সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বাস্তবদৃষ্টি ও বৃহৎ প্রকৃতিকল্পনার এ সমন্বয় ছিন্নপত্রেই সূচিত হয়েছিল। কাব্যে 'শৈশবসন্ধ্যা'য় ও 'যেতে নাহি দিব'তে সে সমন্বিত দৃষ্টিরই বিভিন্ন প্রকাশ পেলাম। কিন্তু 'যেতে নাহি দিব'ই অন্তিম কবিতা। এর পরেই এ সমৃদ্ধ দৃষ্টি কাব্য হারাবে। বাস্তবের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাব্য ফিরে যাবে মানসলোকে। রবীন্দ্রকাব্যে এক মহৎ প্রতিশ্রুতি বিলুপ্ত হবে।

'যেতে নাহি দিব'র অন্তিম কল্পনা মহার্ঘ। সে-কল্পনা যেন হঠাৎ উত্তীর্ণ হয়েছে অন্তর্দৃষ্টির পর্যায়ে। সে-দৃষ্টি মূর্ত হল বসুন্ধরার রূপকল্পনায়। শ্রেষ্ঠ

প্রকৃতিকাব্যে সুতীব্র অনুভূতি ও কল্পনা দুর্লভ মুহূর্তে 'vision' হয়ে দেখা দেয়, তার ভাস্বরতা পায়। 'যেতে নাহি দিব'-তে সে-দৃষ্টির স্বাক্ষর অভ্রান্ত।

কবিতাটির শেষে সৃষ্টিপ্রবাহের উপর 'সর্বশক্তি মরণের' করাল ছায়া পড়েছে। পরের কবিতা 'প্রতীক্ষা'য়* সে-ছায়াই ঘনীভূত হল। 'অনন্ত সংসার আচ্ছন্ন-করা' 'মরণ-পীড়িত সেই চিরজীবী প্রেমের' ব্যর্থতা কবির চিন্তাধারাকে নিয়ে এল বাস্তবলোক থেকে অন্তর্লোকে। কাব্য তার জীবননিষ্ঠ বহির্মুখিতা ধীরে ধীরে হারাবে; ফিরে যাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বসঙ্কুল অন্তররাজ্যে; তার তরঙ্গবিক্ষোভ দেখব দীর্ঘকাল।

'প্রতীক্ষা'য় মৃত্যু প্রথমে দেখা দিল সদ্য-আবিষ্কৃত ধরিত্রীর প্রাণপ্রবাহ ও জীবনচাঞ্চল্যের শত্রু ও বিনাশক হয়ে। সমস্ত স্নেহপ্রীতি, দুঃখসুখ, 'চির-দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা বাসনা-সাধনা'—তার অন্তরালে মৃত্যুর আসন যেমন অটল, জীবনের প্রাণপ্রবাহের মাঝে তার ঘননিবিড় পক্ষচ্ছায়া তেমনি অচঞ্চল—

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা
জীবন চঞ্চল।
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি
যত পান্থদল;

তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি,—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি।

প্রথম দুটি স্তবকে দেখি মৃত্যুর আসন প্রসারিত অন্তরে ও বাহিরে। তার পরে, ভাব ও কল্পনা ধীরে ধীরে বাঁক নিল: তৃতীয় স্তবকে দেখি, মৃত্যু আনল 'সুদূর সমুদ্রের পরপার' হতে 'অনন্তের ঢেউ', আনল 'দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব'।

---

* 'রচনাবলী'তে কবিতাটির তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১২৯৯। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেটা সংশোধন করেছেন, ১৭ কার্তিক, ১২৯৯ (দ্রঃ 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড, পৃ ২৬১)। প্রভাতকুমারের প্রামাণিক নির্দেশ মেনে নিলে 'প্রতীক্ষা' 'যেতে নাহি দিব' কবিতার তিন দিন পরে রচিত। ভাবানুষঙ্গ এই অব্যবহিত রচনারই সাক্ষ্য দেবে।

কবিতাটির মধ্যপথে মৃত্যু এল প্রেমিকরূপে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দীপ্তি ও গাম্ভীর্যে ভাবকল্পনা এবার নিবিড় হল—মৃত্যুপক্ষী হল রুদ্রসাধক প্রেমিক, প্রেয়সী হয়ে ধরা দিল কবির বক্ষোবাসী পরাণ-পক্ষী। সে প্রেয়সী পরাভূত হল, বশীভূত হল,—'অন্ধকার রথে' পার হল মৃত্যুর 'অনাদি রাত্রি'। কল্পনার প্রসার ও অনুভূতির দীপ্তি আনল উন্নত কাব্যসম্পদ্—

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে,
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে ?
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী,—
আলোক-পরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে,
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

কল্পনার ক্ষিপ্রসঞ্চলিত পক্ষ যেন অকস্মাৎ নতুন নভোমণ্ডল আবিষ্কার করেছে ; কল্পনার এ-উত্তুঙ্গতা, অনুভূতির এ-দীপ্তি সোনার তরী কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বস্তুত, 'যেতে নাহি দিব' এবং 'প্রতীক্ষা'য় সোনার তরীর কাব্যস্তর হঠাৎ উন্নততর, বিস্তীর্ণতর ; যেন কবির কল্পনা ও অনুভূতি সহসা অনাবিষ্কৃত আবহমণ্ডলে এসে পৌঁছেছে ; যেন তাঁর কাব্যলেখনী সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেয়েছে নতুন উল্লাস ও শক্তি। তাই কল্পনা আরও প্রগাঢ়, শব্দসম্ভার আরও আত্মপ্রতিষ্ঠ, চিত্রকল্প আরও ব্যঞ্জনাময়, কাব্যাভাস আরও অন্তর্মাধুর্যপূর্ণ।

'প্রতীক্ষা'র প্রায় দেড় মাস পরে পাই 'মানস-সুন্দরী' (৪ পৌষ, ১২৯৯)। আমরা দেখেছি, 'বৈষ্ণব-কবিতা' ও 'দুই পাখি'তে বিরোধের যে ক্ষীণ আভাস ছিল তা ধীরে ধীরে কবিকে নিয়ে এল বাস্তবজীবন থেকে অন্তর্লোকে। 'প্রতীক্ষা'য় দেখলাম সেই অন্তর্লোকাবিষ্ট মৃত্যুকল্পনা। তার পর 'মানস-সুন্দরী'তে সোনার তরী কাব্যের সমস্ত জীবননিষ্ঠ, মানবলোকাভিমুখী অভিপ্রায়কে ছিন্নভিন্ন করে বহুকাল পরে বন্যাপ্রবাহের মত ছুটে এল কবির আবাল্যসাধিত প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনা। সমস্ত সঙ্কল্পকে স্তিমিত করে অন্তরের দুর্দমনীয় আকুতি কাব্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠ হল।

আপাতদৃষ্টিতে এ-কল্পনার পুনরাবির্ভাব বিস্ময়কর। 'মানসী'-কাব্য সমাপ্ত হয়েছিল 'মানসী'-কল্পনাকে বিদায় দিয়ে; 'সোনার তরী' শুরু হয়েছিল নতুন চেতনা, নতুন প্রবর্তনা নিয়ে। তারা কাব্যে এনেছিল কল্পলোকবিমুখ, বহির্মুখী দৃষ্টি; নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যকামনা ত্যাগ করে কবি ফিরে এসেছিলেন 'জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণীর বুকে'। 'জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি'ই আবার কাব্যের মূলমন্ত্র হয়ে দেখা দিল। 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় ও 'দুই পাখি'তে কল্পনা ও বাস্তবের মাঝে সূক্ষ্ম বিরোধের ছায়া পড়ল; তা কিছুকালের জন্যে সরে গেল 'আকাশের চাঁদ'-এর পুনর্বার জীবন-স্বীকৃতিতে, 'যেতে নাহি দিব'র মানবতন্ত্রী কল্পনায়। কিন্তু ধরণীর বুকে মরণ-পীড়িত নিঃসহায় প্রেমের কল্পনা কাব্যকে আবার অন্তর্জগতেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল—পেলাম 'প্রতীক্ষা'। তার পর 'মানস-সুন্দরী'তে 'সোনার তরী'র দৃষ্টির ও প্রবর্তনার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটল।

সে-ব্যতিক্রম আকস্মিক হলেও অকারণ নয়, এবং সে কারণের গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে। একদিকে রয়েছে কবির মানসলোকের ইতিহাস যার নিবিড় স্বাক্ষর ছিন্নপত্রের সমসাময়িক তিনটি চিঠিতে।* চার মাসের মধ্যে এই তিনটি চিঠি কবির গহনমনের পথরেখা আলোকিত করে; স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত করে 'মানস-সুন্দরী' রচনার আন্তর

*১। **শিলাইদহ**, ২০শে অগাস্ট, ১৮৯২—আনুমানিক ৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৯—ছিন্নপত্র: পৃ ১৬৩-৬৪।

২। **নাটোর**, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৯২—ছিন্নপত্র: পৃ ১৬৭-৬৮।

৩। **শিলাইদহ**, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯২—ছিন্নপত্র: পৃ ১৬৯-৭১।

ইতিহাস। অন্যদিকে রয়েছে আভ্যন্তরিক ইঙ্গিত—কবিতারই প্রারম্ভে, তার সম্বোধনে। দুই জাতীয় কারণই যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ব্যঞ্জনাময়।

মানস-ইতিহাসের প্রথম সুস্পষ্ট আভাস পাই আমাদের প্রথমোক্ত চিঠিতে। ছিন্নপত্রে এ-যাবৎ প্রকৃতি-অনুরাগ ও কল্পনার নানা সুর পেয়েছি; কিন্তু হঠাৎ চমক লাগায় ছিন্নপত্রের ২০শে অগাস্টের এই চিঠিটি; এ-অনুভূতি একান্ত অভিনব। চিঠিটি আজ অতি-পরিচিত এবং অতি-উদ্ধৃত। তবু কল্পনার ও অনুভূতির অভিনবত্ব পুনরুদ্ধৃতি দাবী করবে—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে, উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত, অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" (ছিন্নপত্র, পৃ ১৬৩-৬৪)

অনাদিকাল ধরে, যুগে যুগে, জন্মে জন্মে, মাটি-আলো, তৃণ-তরু-লতার সঙ্গে, জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে এই শিরায়-শিরায়-প্রবাহিত একাত্মতার অনুভূতি সম্পূর্ণ অভিনব। এ দুঃসাহসিক অনুভূতি আবার পাই ছিন্নপত্রে প্রায় চার মাস পরে লেখা আর একটি চিঠিতে—আমাদের তৃতীয় চিঠিতে—

"এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। 'তখন পৃথিবীতে জীব-জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ

মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলাম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলাম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

(ছিন্নপত্র, পৃ ১৬৯-৭০)

প্রথম চিঠিটির তারিখ আনুমানিক ৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৯; শেষের চিঠিটির ইংরেজী তারিখ ৯ ডিসেম্বর, ১৮৯২,—অর্থাৎ আনুমানিক ২৩ থেকে ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৯। 'মানস-সুন্দরী' রচিত ৪ পৌষ ১২৯৯—শেষের চিঠিটির দশ-বারো দিনের মধ্যে। প্রশ্ন ওঠে, চিঠি এবং কবিতার মধ্যে কোন গভীর সংযোগ রয়েছে কি? এ-প্রশ্নের গুরুত্ব অনেকখানি; যদি সংযোগ থাকে, তাহলে 'মানস-সুন্দরী' কবিতা হয়তো নতুন আলোকে সমুজ্জ্বল হবে।

এ-প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে কিছু পূর্বানুস্মৃতি প্রয়োজন; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন কী ভাবপরম্পরার মধ্য দিয়ে ছিন্নপত্রের এই তিনটি চিঠি পাওয়া গেল। মানসীকাব্যের আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম কিভাবে স্তরে স্তরে বাল্যের 'অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গ' যৌবনে এনেছিল—কড়ি ও কোমলের 'ক্ষণিক মিলন' কবিতায়—বিস্মৃতক্ষণের ক্ষীণালোক-পরিচয়াভাস, এনেছিল কমলাসনার স্বপ্নমূর্তি। তার পর এ-জন্মপূর্ব চেতনা সংহত কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল 'মানসী'তে, 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম' কবিতায়। কবির সৌন্দর্যকল্পনা এই বিশেষ স্তরে পৌঁছে এনেছিল অনন্তজীবনের পটভূমিকায় অনাদিকালের প্রেমকল্পনা। এ-জন্মজন্মান্তর-প্রবাহিত চেতনা প্রথম আভাসিত হল মানসীকাব্যের এই দু'টি কবিতায়।

তার পর নব প্রবর্তনা নিয়ে এল সোনার তরী কাব্য। দিন কাটছিল নির্জনে পদ্মার বুকে, প্রকৃতির বিশাল শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে, এবং তারই কোলে 'কোমল, দুর্বল, অসহায়' মানুষগুলোকে দেখে। 'সোনার তরী'তে,

এবং তার ভূমিকাস্বরূপ ছিন্নপত্রে, কল্পলোক-নিমগ্ন বাস্তববিরুদ্ধ জীবনের ব্যর্থতা উচ্চারিত হল।

তার পর উদ্ধৃত প্রথম চিঠিতে (ভাদ্র, ১২৯৯), অকস্মাৎ দেখি কোন এক আলোকোজ্জ্বল শরৎপ্রভাতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের প্লাবনে কবিচিত্ত কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কবি নতুন করে আবিষ্কার করলেন 'বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান।' সে নাড়ীর টান জাগাল এক অপূর্ব অনুভূতি— বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে, বহুযুগের ও বহুজন্মের নিবিড় ও আদিম একাত্মতা। এ বোধ অভিনব, কিন্তু আকস্মিক নয়। এ বোধেরই অঙ্কুর ছিল ভূমিগর্ভে, বাল্যের অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গে'; তার একান্ত অস্পষ্ট আভাস ছিল 'কড়ি ও কোমলে'র 'ক্ষণিকের মিলন'-এ; তার স্পষ্টতর প্রকাশ ছিল 'মানসী'র 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'এর জন্মজন্মান্তর-স্মৃতি কল্পনায়। 'ছিন্নপত্রে', ২০ অগাস্টের চিঠিতে, পৃথিবীর সঙ্গে অনন্তকালের নিগূঢ়তম একাত্মতার উপলব্ধিতে সেই বোধই স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে সুস্পষ্ট-চেতনায় দেখা দিল।

ছিন্নপত্রের এ-চিঠি লেখার পূর্বে ও পরে দীর্ঘকাল কবিতা পাই না। 'আকাশের চাঁদ'এর (২২ আষাঢ় ১২৯৯)প্রায় দেড় মাস পরে পেলাম এ-চিঠি। প্রায় চার মাস পরে পেলাম 'যেতে নাহি দিব' (১৪ কার্তিক)। জীবনীতে দেখি কবি 'সাধনা' পত্রিকা নিয়ে বিশেষ ব্যাপৃত। তাছাড়া সম্ভবত আষাঢ় মাস থেকেই শুরু হল 'সংগীত-সমাজে'র উৎসাহী সদস্যদের আগ্রহে 'গোড়ায় গলদ' রচনা। ভাদ্র মাসের শেষে 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হল। নাটকটি অভিনীত হবার পর দেখি কর্ম-কোলাহল থেকে কবি ধীরে ধীরে অন্তরলোকে ফিরে আসছেন। কার্তিক মাসে 'সাধনা'য় প্রকাশিত হল 'জয়-পরাজয়' গল্প। অনন্যচিত্ত সেবকের প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ ঘোষিত হল গল্পটিতে। শেখর কবির ভাগ্যে জুটল পুণ্ডরীকের পরুষ কণ্ঠের লাঞ্ছনা, কিন্তু রাজকন্যার কমল-নিন্দিত হস্ত হতে শেখর পেলেন পুষ্পিত বরমাল্য। বাস্তবে পরাজিত কবি কাব্যলক্ষ্মীর জয়টীকায় ভূষিত হলেন। তার পর কাব্য ফিরে এল চার মাস পরে : কার্তিকের মাঝামাঝি কয়েক দিনের ব্যবধানে পেলাম দুটি কবিতা— 'যেতে নাহি দিব' এবং 'প্রতীক্ষা'। সম্ভবত কার্তিকের শেষে কবি গেলেন রাজসাহীতে লোকেন পালিতের কাছে। সেখানে রচিত হল শিক্ষা সম্বন্ধে যুগান্তকারী রচনা 'শিক্ষার হেরফের'।

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি এলেন নাটোরে, মহারাজের নিমন্ত্রণে। সেখান থেকে ২রা ডিসেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে—আমাদের দ্বিতীয় চিঠি—দেখি কবির সৌন্দর্যপিপাসু মন টলমল করে উঠেছে। চিঠিটি একান্ত অর্থময়; তার মাঝে পাই 'মানস-সুন্দরী' কবিতার অভ্রান্ত সূচনাভাস—

"আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটা স্নেহভারাবনত মৌন ম্লান মিলন। অন্তরের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যাবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী একটা উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়, সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটা ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা। অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচরব্যাপ্ত নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তাহলে কী একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়।" (ছিন্নপত্র, পৃ ১৬৭-৬৮)

চিঠিটির রচনাকাল ২রা ডিসেম্বর,—'মানস-সুন্দরী' রচনার পক্ষাধিক কাল পূর্বে। চিঠিটির অন্তস্তলে যে ইঙ্গিত সুপ্ত রয়েছে তা পূর্ণ উপলব্ধি করলে এ সত্য সহজ হবে যে 'জগতের সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনি'র নিঃশব্দ 'বিপুল সংগীত', 'জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পনধ্বনি'—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির অন্তরতম প্রেরণা, সৌন্দর্য-কল্পনার অন্যতম মূল উৎস। সেই 'বৃহৎ হার্মনি'কে 'বিপুল সংগীতে' তর্জমা করে নেবার পর, সেই 'অবিশ্রাম কম্পনধ্বনি'কে 'মনের কান' দিয়ে শুনবার পর, অনুভূতি ও কল্পনার ইন্দ্রজালে কবির মানসপটে যে-মূর্তি বারবার উদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'মানসী', 'মানস-সুন্দরী'। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'প্রতিধ্বনি' কবিতায়, এবং 'জীবনস্মৃতি'তে তার ব্যাখ্যায় আমরা প্রথম পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-কল্পনার উৎসমুখ ও উৎসরেখা; 'মানসী'র 'উপহার' কবিতায় কাব্যে পেয়েছিলাম তার

স্তরবিন্যস্ত প্রকাশ; 'ছিন্নপত্রে'র এ-চিঠিতে গদ্যে পেলাম সৌন্দর্য অনুভূতি ও কল্পনার অব্যবহিত পূর্ব উপলব্ধি। মানস-সুন্দরীর আবির্ভাবের সুপ্রশস্ত তোরণ—তোরণ ইঙ্গিতে রচিত হল কবিতার পক্ষকাল পূর্বে, ছিন্নপত্রের ২রা ডিসেম্বরের এই চিঠিতে।

তার পর অসুস্থ দেহে কবি ফিরলেন শিলাইদহে। কয়েকদিনের মধ্যে পেলাম পূর্বোদ্ধৃত ছিন্নপত্রের ৯ই ডিসেম্বরের তৃতীয় চিঠিটি, কবিতার আনুমানিক দশ দিন আগে লেখা। চিঠিটির দ্বিতীয়ার্ধ উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু প্রথম অংশে রয়েছে মানসিক পরিবেশের আভাস। সেটা জানাও একান্ত প্রয়োজন। কবি লিখছেন—

"এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলেছে, তার উপর পাল পেয়েছে—...পদ্মায় নৌকো নেই—শূন্য বালির চর, হলদে রং, একদিকে নদীর নীল আর একদিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে। ...অনেকদিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময়ে প্রকৃতির এই ধীর, স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারি মধুর লাগছে।......প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে—কিন্তু যখনি বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুল কুল করে ওঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে যায়।" ('ছিন্নপত্র'—পৃ ১৬৯)

'মানস-সুন্দরী' কবিতার প্রস্তুতি ছত্রে ছত্রে নিঃশ্বসিত হল এ-চিঠিতে। যেন কবির অবচেতন মানস অধীর প্রতীক্ষায় রইল কখন সেই 'বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্য' ইন্দ্রিয়-যবনিকা ভেদ করে সহসা উদ্‌ঘাটিত করবে সেই 'আজন্ম-সাধন-ধন' সুন্দরীর মানস-মূর্তি।

এর পরেই এ-চিঠিতে পেলাম পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি, পেলাম এই পৃথিবীর সঙ্গে কবির অনেকদিনকার, অনেকজন্মকার ভালবাসার কথা; পেলাম কবির নূতনতর বিশ্বানুভূতি—বহু যুগ যুগ পূর্বে সিন্ধুস্নান-নবীনা পৃথিবীর মাটিতে 'প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত' হওয়ার কথা,

'সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান' করার কথা, 'অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত' হবার কথা।

ছিন্নপত্রের তিনটি চিঠিকে কেন্দ্র করে এ-দীর্ঘ অনুস্মৃতি কবির অন্তর্গূঢ় মানস-ইতিহাসকে সুপরিস্ফুট করবে। 'আকাশের চাঁদ'-এর জীবন-অঙ্গীকারের পর কাব্যে এল দীর্ঘ বিরতি। অন্তরে সক্রিয় ছিল এ-যুগের ব্যথাতুর, বিষণ্ন প্রকৃতির কল্পনা। সে-কল্পনাই ধীরে ধীরে কবিকে নিয়ে এল পূর্ব-অনুভূত জন্মান্তরপূর্ব-চেতনায়। শিলাইদহের ২০ অগাস্টের চিঠিতে সে-চেতনা প্রথম সুস্পষ্ট রূপ নিল গদ্যে,—কবি অনুভব করলেন এই আদিম পৃথিবীর সঙ্গে আদিমতম একাত্মতা। মাস দেড়েক পরে 'যেতে নাহি দিব'-তে নিঃসহায় প্রকৃতির ম্লানচ্ছবি কাব্যে রূপ নিল। যুগযুগান্তরের অতি-প্রাচীন একাত্মকতার অনুভূতি রইল অন্তরে সঞ্চিত। তার পর ২রা ডিসেম্বরের নাটোর থেকে লেখা চিঠিতে দেখি প্রকৃতির 'বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা' পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 'গভীর, গম্ভীর, শান্ত-সুন্দর সকরুণ সংগীত' কবিকে আবিষ্ট করেছে।

তার পর ৯ই ডিসেম্বর শিলাইদহের চিঠিতে শ্রান্ত দেহমনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল, পদ্মার বুকে 'বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের নিত্য উৎসব'। আবার নতুন করে কবিহৃদয় অভিভূত হল। আবার ফিরে এল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের একাত্মতার অনুভূতি; মনে পড়ল এই পৃথিবীর সঙ্গে 'অনেকদিনকার অনেকজন্মকার' ভালবাসার কথা; মনে পড়ল সেই অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে উৎসারিত 'অতি-পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা'; মনে পড়ল তাকে, যাকে ভালবেসেছেন,

শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের নিবিড়তম সান্নিধ্য, যুগযুগান্তরের আদিমতম একাত্মকতা—এই দুই প্রবল অনুভূতির সম্মিলনে অনিবার্য হয়ে দেখা দিল 'মানস-সুন্দরী' কবিতা। সমস্ত অনুভূতির স্তরে স্তরে এই মানস-মূর্তির ধ্যানকল্পনাই ছিল প্রচ্ছন্ন; অবচেতনে চলেছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি—তার ক্রমোন্নত ইতিহাস সুপ্ত রয়েছে ছিন্নপত্রের তিনটি চিঠির মাঝে।

'মানস-সুন্দরী'-কল্পনার একদিকের মানসিক ইতিহাস পাওয়া গেল 'ছিন্নপত্রে'। অন্যদিকে গূঢ় ইঙ্গিত মেলে কবিতাটির প্রথমেই, তার সম্ভাষণের মাঝে—

আজ কোনো কাজ নয় ;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থ-গীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা।......

সমস্ত 'মানসী'কাব্যের তৃষ্ণার্ত সন্ধানের মধ্যে, বহুবিচিত্র অনুভূতির মধ্যে এ-সম্বোধন খুঁজে পাব না। 'উদাসীন, গৃহত্যাগী' মানসী-কল্পনা ছিল 'একাকী অসীমভরা' ; ছিল 'বিশ্ববিহীন বিজনে' পরিকীর্ণ। তার শেষ মূর্তি-পরিগ্রহ দেখেছিলাম 'অহল্যার প্রতি'-তে। তার পর 'চিরদিবসের চিরমনো-ব্যাকুলতা'য় মানসীকাব্যের যবনিকা নেমেছিল ; 'উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াস' অতৃপ্ত রেখেই 'সোনার তরী' আরম্ভ হয়েছিল 'আর এক পরিপ্রেক্ষিতে'।

তার পর বহুদিন পরে হঠাৎ দেখি মানসীর মূর্তিহীন ধ্যানকল্পনা প্রাণস্পর্শে উদ্দীপ্ত, তার তিলোত্তমা মূর্তি কবির মানসপটে আবার উদ্ভাসিত। কিন্তু সে-মূর্তি আজ রূপান্তরিত—'মানসী' রূপান্তরিত 'মানস-সুন্দরী'তে, রূপান্তরিত 'আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা'য়।

এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কবির সৌন্দর্য-কল্পনা আর একটি বিশিষ্ট স্তরে পৌঁছল। যে-কল্পনার অবাস্তবতা ও জীবনবিরোধিতা কবিকে একদিন ক্লান্ত করেছিল, যাকে বিদায় দিয়ে জেনেছিলেন জীবনের মহার্ঘতা, শুনেছিলেন মানুষের জীবনকল্লোল, সে-কল্পনাই আজ নতুন শক্তি ও প্রেরণায় সঞ্জীবিত হল ; এ-বোধ জাগল, যে-সত্তা ছিল শুধুমাত্র ধ্যানগম্য, আজ অন্তরে তিনিই কাব্যরূপিণী ; আজ কবি তাঁকে আবিষ্কার করলেন কাব্যসাধনার অন্তর্মূলে ; তাকে দেখলেন 'আজন্ম-সাধন-ধন কবিতা-সুন্দরী' রূপে।

কবিমানসের অভিব্যক্তির ইতিহাসে তাই 'মানস-সুন্দরী' কবিতা গুরুত্বপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যময়। 'মানসী'র সৌন্দর্যকল্পনা এই প্রথম প্রাতিস্বিক স্বীকৃতি পেল, কবির আবাল্য-অনুস্যূত সৌন্দর্যসত্তা তাঁর কাব্যসত্তার সঙ্গে প্রথম সম্মিলিত হল। প্রথম জাগ্রত হল এ-চেতনা—আকৈশোর যে-কাব্যসত্তার সাধনা করেছেন এবং আবাল্য যে-সৌন্দর্যসত্তার সন্ধানে ফিরেছেন—তারা মূলত একই সত্তা। কবির 'মানসী' আরও ব্যাপক, আরও গভীর কল্পনা হয়ে দেখা দিল ; তাকে আজ উপলব্ধি করলেন, 'অন্তরে, বাহিরে, বিশ্বে, শূন্যে জলে স্থলে। এ-বোধের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এক নিবিড় প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি

কবিকে আচ্ছন্ন করল। সে-অনুভূতির উদ্দাম প্রকাশ 'মানস-সুন্দরী'*। কবিতাটির প্রথম দুই স্তবকে ফুটে উঠেছে এই প্রেমের দুঃসহ আবেগ, তার নিবিড় কামনা। 'কড়ি ও কোমলে'র যৌবনচঞ্চল কবির পক্ষেও আবেগের এ-অধীর উন্মত্ততা কল্পনাতীত ছিল; তা সম্ভব হত না যদি না এক অভিনব উপলব্ধি কবিকে আবিষ্ট করত। সদ্যোলব্ধ সে-উপলব্ধির রোমাঞ্চিত প্রকাশ দেখি দ্বিতীয় স্তবকে—

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে ;—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

লক্ষণীয় এ-উদ্ধৃতির প্রথম চরণটি -'বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী'। 'মানসী' আজ এক বিশিষ্ট রূপে কবির অন্তরে উদ্‌ভাসিত—সে-রূপ বীণাপাণির রূপ। সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল, 'মানসী' আজ আবির্ভূত কাব্যলক্ষ্মীর

* 'মানস-সুন্দরী' রচনার প্রায় পাঁচ মাস পরে 'ছিন্নপত্রে' 'বহুকালের প্রেয়সী কবিতা' সম্পর্কে একটি চিঠি পাই। চিঠিটি (৮ই মে, ১৮৯৩; বৈশাখ, ১৩০০) অত্যন্ত কৌতূহল জাগায়—"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়িভিতরের বাগান, বাড়িভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরী করেছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত—কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কবিকল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল।.........

......কিন্তু আমার অলস জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান।" (ছিন্নপত্র, পৃ ১৯৭-৯৮)

বেশে, বীণানন্দিত হস্তে। তবু সে-কাব্যলক্ষ্মী কবির মানস-সুন্দরী, অন্তর-প্রিয়া। তাই তো কবির মিনতি—"তুমি বীণা ফেলে এস, 'দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি কণ্ঠে জড়াইয়া দাও'—"। আট মাস পরে 'পুরস্কার' কবিতায় এই কাব্যলক্ষ্মীর কল্পনাই ফিরে আসবে 'বীণাপাণি'র দীর্ঘবর্ণনায়; কিন্তু প্রিয়ার মূর্তিতে নয়, শাস্ত্রসম্মত জননীর মূর্তিতে।

কিন্তু এ-প্রেমকল্পনার পূর্বে প্রথম স্তবকের কয়েকটি চরণ আমাদের দৃষ্টি টানে। সেখানে সুতীব্র ইঙ্গিতে হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠেছে কবির অতীতের মানস-ইতিহাস; হঠাৎ পরিস্ফুট হয়েছে 'মানসী' কাব্যের অন্তিম ইতিহাস, 'মানসী'কে বিদায় দেবার গূঢ় হেতু—

……ভুলে যাই সব
কী আশা মেটেনি প্রাণে, কী সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।…

মানসীর ব্যর্থ সন্ধানের ইতিহাস সংরক্ষিত এই ক'টি চরণে। আজ সুবর্ণ-সন্ধ্যায় কবি ভুলতে চান সে-ইতিহাস—কীভাবে মানবীয় প্রেমে মানসীকে খুঁজে পাবার দুরাশা মেটে নি; কীভাবে ক্ষণিক মিলনের 'আনন্দসুধা' 'অন্তরের ক্ষুধা' অতৃপ্ত রেখে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে; কী করে সে গানের ধারা নিঃশেষ হয়ে গেছে। 'মানসী'ও 'সোনার তরী'র মধ্যকালের অধ্যাত্ম-ইতিহাস সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখল এই ক'টি চরণে। একমাত্র এইখানেই দেখি মৌনযবনিকা ছিন্ন করে মুহূর্তের আলোকে উদ্ভাসিত কবির গহন অন্তর। সে-আলোক শুধু অতীতের ইতিহাসকেই উন্মুক্ত করল না; 'সোনার তরী'র ঋতুবদলের মানসিক পটভূমিকে ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল: প্রেম ও সৌন্দর্য সাধনার 'সংগীতরব' নীরব হয়েছিল, 'সে-আনন্দসুধা' শুকিয়ে ছিল, তাইতো কবিকে 'জীবনধারার বিচিত্র কলরব' আরও প্রবল ভাবে টানল।

সুতরাং দেখা গেল, 'মানস-সুন্দরী'তে এক বিপুলতর, সমৃদ্ধতর চেতনা কবিকে সমাচ্ছন্ন করল—'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' প্রথম কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হল; কবিচিত্তে জাগল অসীম বিস্ময়; উদ্বেল হল যুগযুগান্তের প্রেমস্মৃতি। এ-বোধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না; কবির প্রাণ আবার জেগে উঠবে

অশান্ত বাসনায়; ছুটে যাবে 'নিখিলের সাথে মহা রাজপথে', প্রবৃত্ত হবে সুখদুঃখজাগ্রত 'প্রাণের সাথে' ভীষণ 'মরণ-খেলায়'। কিন্তু আজ সমস্ত 'শিরা-উপশিরা লাবণ্য-প্রবাহে' ভরে তুলে আবির্ভূত হলেন অনন্তসৌন্দর্যমূর্তি, অন্তর-অনুভূত সৃষ্টিশক্তিমূর্তি, কাব্যলক্ষ্মীপ্রতিম 'মানস-সুন্দরী'। এই অন্তর-ব্যাপিনী সৃজনীশক্তির কথা উত্তরকাব্যে বারবার পাব। অদূরে 'চিত্রা'কাব্যে 'অন্তর্যামী' কবিতায় পাব—

অন্তরমাঝে বসি অহরহ,
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

সুদূরে 'পূরবী' কাব্যে 'আহ্বান' কবিতায় পাব—

তাইতো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল,
বেদনার বেগে,
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সংগীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।

এ-উপলব্ধির প্রথম আবির্ভাব 'মানস-সুন্দরী'তে।

এ-অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যেন চম্‌কে জেগে উঠল কবির 'নিদ্রিত অতীত'; মনে পড়ল বহু বাল্যকথা—

অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনা শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্তি……

তার পর, অতীত ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে কবির প্রথম যৌবনে, এই চঞ্চল-নবীনা বালিকা-মূর্তিই কখন বসন্তের মলয়-নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী-রূপে দেখা দিল—

চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো।.........
............ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।.........
............স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো;...

ভারি কৌতূহল জাগায় কবির এই স্তরে স্তরে উন্মীলিত ইতিহাস, এই স্তবকে স্তবকে উন্মুক্ত মানসপট। বাল্যের 'দেখা হত দুই জনে আধো-চেনাশোনা' শব্দক'টি কৌতুকাবহ; বহু পূর্ব-স্মৃতি জড়িত রয়েছে এদের মাঝে। এদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে বাল্যকালের 'বৃহৎ অর্ধ-পরিচিত প্রাণীর সঙ্গ'; সুপ্ত রয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'ক্ষণিক মিলন' কবিতার পূর্ব-উদ্ধৃত চরণটি—'ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা'।

কিন্তু সব থেকে কৌতূহল জাগায়—শুধু কৌতূহল কেন, রবীন্দ্রকাব্য ও মানস সম্পর্কে একটি দুরূহ প্রশ্নও জাগায়—দ্বিতীয় পর্বের একান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—এবং কিছুটা ভ্রান্ত বর্ণনা। কথাটি সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তর, অর্থাৎ প্রথম যৌবনের পর্যায়ে এসে কবি বলছেন,

তার পর একদিন—কীজানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয়বায়ু ফেলেছে নিঃশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ
সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মতো।...

যৌবন-বসন্তের প্রথম মলয়-নিঃশ্বাস—'ছবি ও গান'কে বাদই দেওয়া যাক—'কড়ি ও কোমলে', 'মানসীতে'। কিন্তু তাদের ইতিহাস তো পূর্ণ ও সত্য ভাবে প্রতিফলিত হল না এই ক'টি চরণে! মুকুলিত 'শত নব আশ' এবং সগৌরবে অন্তঃপুর-মহিষীর প্রকাশের মাঝে মস্ত একটি অধ্যায়—মানসীর অনন্তব্যাকুলতার অধ্যায়—তৃষার্ত, ব্যর্থ অন্বেষণের অধ্যায়—সুস্পষ্টভাবেই এ-বর্ণনায় পরিত্যক্ত হল। বোধ হয় সে-শ্রান্তিকর অধ্যায় কবি সত্যিই ভুলতে চান—

ভুলে যাই সব
কী আশা মেটে নি প্রাণে; কী সংগীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে,······

এ-ভ্রান্তি ঐতিহাসিক-মনোবিজ্ঞানী দৃষ্টির কাছে গভীর অর্থপূর্ণ। আজ নতুন উপলব্ধির আনন্দে সদ্য-অতীতের মর্মান্তিক ইতিহাস কবি ভুলতে চান; তাই 'খেলাক্ষেত্র হতে' 'খেলার সঙ্গিনী'কে পরমুহূর্তে দেখলেন 'মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী' রূপে। এ-দৃষ্টি সদ্য-উপলব্ধ চেতনার দৃষ্টি, 'মানস-সুন্দরী'র দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে অতীতের আর্তসন্ধানের কাহিনী। তাই মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেল কবির আত্মকাহিনীর বর্ণনায়।

আরও একটি শব্দগুচ্ছ গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে: 'সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে চমকিয়া হেরিলাম'। কী অর্থ এই 'আপন সংগীতে চমকিয়া' শব্দ ক'টির? অন্তরে 'আপন সংগীতে'র অর্থাৎ আপন কাব্যসৃষ্টির অন্তর্গূঢ় প্রেরণার মধ্য দিয়েই কবি আবিষ্কার করেছেন তাঁর 'অন্তর-লক্ষ্মী'কে; আবিষ্কার করেছেন এই সত্যকে যে, যে ছিল তাঁর খেলার সঙ্গিনী, যার ব্যাকুল সন্ধান করেছেন প্রথম যৌবনে সে-সত্তাই তাঁর 'কাব্য-লক্ষ্মী', তাঁর কাব্যজীবনের ও সাধনার 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী'। এ-উপলব্ধির পর—

সে-অবধি প্রিয়ে
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই সীমা।

পরিশেষে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'মানসী'র আলোচনায় 'পূর্বকালে' ও 'অনন্তপ্রেম' কবিতায় কবির 'জীবনদেবতা' কল্পনার প্রথম আভাস দেখেছিলাম। কবির সৌন্দর্য-কল্পনাকে জীবনদেবতার দিকে আরও এক স্তর এগিয়ে নিয়ে গেল এই 'মানস-সুন্দরী' কবিতা। গহন অন্তরে কাব্য-

সত্তার উপলব্ধিই সুপ্রশস্ত করল 'জীবনদেবতা' কল্পনার পথ। সে-কথা পরে আলোচিত হবে।

কবিতায় ফিরে আসা যাক। কবি আজ বিস্ময়ে চেয়ে আছেন অন্তর-লক্ষ্মীর দিকে; তাঁর মন-তরী ছুটে চলেছে অকূল রূপসাগরে; সে-তরীর কর্ণধার 'মানস-সুন্দরী'—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী; দশদিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চিরদিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোন কূল আছে?

আবার বিস্ময় জাগায় এই 'হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ সুন্দর তরণী' শব্দবন্ধটি; হঠাৎ মনে পড়ে যায় 'সোনার তরী' কবিতার 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে' স্তবকটি। এবার তরীচালকের পরিচয় স্পষ্টতর হল: কুহেলিঘেরা অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত হয়ে এবার স্বরূপে দেখা দিলেন 'তরণীর কর্ণধার'। 'সোনার তরী'র অস্পষ্ট-মূর্তি তরীচালকই দৃষ্ট হল এ-কবিতার 'সুন্দর তরণীর কর্ণধার' হয়ে। 'গান গেয়ে তরী বেয়ে' যে পারে এসেছিল সেই সুদূরকল্পিত মূর্তিই নিকটতর হল 'মানস-সুন্দরী'তে—আবার তাকে দেখলাম 'উদার সমুদ্রের মাঝখানে' সুন্দর তরণীর কর্ণধার রূপে।

মানস-সুন্দরীর ভাবধারাকে সাধারণভাবে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। কবিতাটি শুরু হয়েছিল মানস-সুন্দরীর সাম্প্রতিক নিবিড় প্রেমকল্পনায়। 'বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী'—দ্বিতীয় স্তবকের উৎকণ্ঠ প্রেমের সূচনা এই চরণ থেকে। সুদীর্ঘ আটান্ন চরণ ব্যাপী এই প্রেমকল্পনা কবিতাটির প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে কবি ফিরে গেলেন বহুবাল্যকালের কাহিনীতে; তার শেষভাগে এলেন 'খেলাক্ষেত্র হতে' অন্তঃপুরমহিষীর কল্পনায়—আবার ফিরে এলেন সাম্প্রতিক প্রেমকল্পনায়।

সুদীর্ঘ ষষ্ঠ স্তবকে তৃতীয় স্তর নিয়ে এল অভিনব ভাবধারা : কবিকল্পনা প্রক্ষিপ্ত হল পরজন্মে, ফিরে গেল পূর্বজন্মে। 'মানসী'র 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম', 'ছিন্নপত্রে'র পূর্বোক্ত অসামান্য চিঠিদুটি—এবার কবিতার মাঝে তাদের ছায়ারেখা আনল। এ-স্তবকের প্রথমেই প্রশ্নে ফুটে উঠল এই একাগ্র কামনা—

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমিই কি মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব-গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ?.........

মানসিক অভিব্যক্তির দিক থেকে এ-প্রশ্ন অর্থপূর্ণ। সৌন্দর্যসত্তা যখন অন্তরে কাব্যসৃষ্টির মূর্ত প্রেরণা রূপে অনুভূত, তখন যে-গূঢ় উপলব্ধি কবিকে আচ্ছন্ন করল তার পুলকিত কামনা—'সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা ?' 'মানস-সুন্দরী'র নবলব্ধ অনুভূতি মানসীর অমূর্তসত্তাকে অনিন্দ্যসুন্দর দেহসত্তায় অবলোকন করার বাসনা জাগাল। কল্পনার সৌকুমার্যে, অনুভূতির কমনীয়তায় পরিস্ফুট সে-বাসনা—

কী নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি ? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?

ষষ্ঠ স্তবকে প্রশ্নটির পরেই দেখি কবি ফিরে এলেন আবার বর্তমানে, মানস-সুন্দরীর অধুনা স্বর্গমর্তব্যাপিনী কল্পনায়। মানস-সুন্দরী এখন সমস্ত চরাচরে অভিব্যাপ্ত। নিসর্গলোকে—'বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে, সর্বঠাঁই' তাঁর বিদেহী সত্তা পরিকীর্ণ। দীর্ঘ অনুরাগরক্ত বর্ণনা আনল এই পরিব্যাপ্তির নিঃসীমতা, প্রগাঢ়তা, সমগ্রতা। প্রকৃতির সমস্ত খণ্ডসৌন্দর্যের মধ্যে সে-সত্তার দিব্যস্পর্শ, দিব্যপ্রকাশ দেখছেন কবি—

এখন ভাসিছ তুমি
অন্তরের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে

গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত-বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন ;···

মানস-সুন্দরীর এ-পরিব্যাপ্তি বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন নবীন আলোকে আবিষ্কার করল। কবির প্রকৃতি-অনুরাগ যেন আরও গভীর, অনুভূতি যেন আরও সংবেদনশীল। 'মানসী'-তে সৌন্দর্যসত্তা ছিল নভোনীলিমায় পরিব্যাপ্ত। সে-সত্তাই যখন কাব্যসত্তারূপে আবিষ্কৃত হল তখন দু'য়ের মিলনে বিশ্বপ্রকৃতি কবির চক্ষে অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত হল। 'স্নিগ্ধ দৃষ্টি' হল 'স্বচ্ছ নীলাম্বরসম' ; স্থির হাসিখানি 'অশ্রুশিশিরেতে ধৌত' ; পরিপূর্ণ দেহ 'মঞ্জরিত বল্লরীর মতো'।

কবিতার মধ্য ও শেষভাগে দেখি কবির প্রকৃতিদৃষ্টি ক্রমেই নিবিড়তর, তীব্রতর হয়ে চলেছে। পরিশেষে পেলাম উপমায় এ-অসামান্য দৃষ্টি ও কল্পনা—

কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্র গ্রীবা'পরে
শিরীষ কুসুমসম সমীরণ-ভরে
কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয় নবনীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে। কী সঘন পল্লবের ছায়,
কী সুদীর্ঘ কী নিবিড় তিমির-আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী,······

উদ্ভাসিত দৃষ্টি ও কল্পনা প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবিষ্ট হল। যতদূর জানি, কাব্যে মহাচিত্রকল্প (epic imagery) বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল ; তার নিবিড়তা ও সৌকুমার্য দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

কবিতার সপ্তম স্তবকে কবি ফিরে এলেন মূল প্রশ্নে—

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?

তার পর আবেগে কল্পিত হল 'লাবণ্যের থরে থরে' মুকুলিত, বিকশিত অঙ্গখানি।

চতুর্থ স্তরে কল্পনা প্রসারিত হল 'পরজন্ম-পথে' মিলনের কল্পনায়। হঠাৎ সে পথে যখন দোঁহার চোখোচোখি হবে তখন—

দাঁড়াব থমকি,
নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা সম
চিরপরিচয়ভরা ঐ কালো চোখ।

তার পর পেলাম পরজন্মে মিলনকল্পনা। তার শেষে কবি বলে উঠলেন, এ 'শুধু বাসনার বিফল মিনতি, কল্পনার ছল' নয়—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।

কল্পনার বিপুল আন্দোলনে মানস-সুন্দরী পূর্বজন্মে এবং পরজন্মে দেহরূপিণী প্রিয়া রূপে কল্পিত হল। তার পরেই পাই ভারি সুকুমার একটি ভাবকল্পনা। কবি বলেছেন, পূর্বজন্মে তুমি ছিলে মিলন-বন্ধনে, মূর্তি ধরে; এ-জন্মে সে মিলন-বন্ধন ছিন্ন হয়েছে; তোমাকে হারিয়েছি। তাইতো এই অসীম বিরহ। সে-বিরহ তোমাকে করেছে বিশ্বময় পরিকীর্ণ—

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা

আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

এ-ভাবকল্পনা নিবিড় ব্যঞ্জনাময়। মানসী-কাব্যের দীর্ঘ সন্ধানের ও আকুতির সুস্পষ্ট হেতুনির্দেশ পেলাম এখানে; কেন এত বিরহ-আকুলতা তা পরিস্ফুট হল।

সবশেষে ফিরে এলেন কবি যেখান থেকে শুরু হয়েছিল এই মানস-অভিসার: ফিরে এলেন 'আজন্ম-সাধন-ধন' কবিতা-সুন্দরীর কল্পনায়। উদ্ধৃত চারটি চরণের পরেই দেখি সে কল্পনা—

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারিধার
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—

বিরহে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত সেই নিরবয়ব বিরহমূর্তিই অন্তরে কাব্যরূপিণী।

রবীন্দ্রনাথের মানস-ইতিহাসে 'মানস-সুন্দরী'র একান্ত বিশিষ্ট একটি স্থান আছে। 'মানস-সুন্দরী' নিয়ে এল এক সন্ধিক্ষণের সূচনা যেখানে মানসী-কল্পনা নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তরে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রসারিত হল—অন্তরে আনল আশ্বাস, প্রকৃতিলোকে আনল নবীন সত্তার পরিব্যাপ্তি। সমৃদ্ধতর আত্মানুভূতি ও নিবিড়তর প্রকৃতিচেতনা মানস-সুন্দরীর বিশিষ্ট অবদান।

সোনার তরী কাব্যের পরের ইতিহাস হল কি ভাবে সে আশ্বাস স্তিমিত করে কবিমানসের মূলতম দ্বন্দ্ব ও বিরোধ—কর্মহীন জীবনের গ্লানি ও বিরাট জীবন-অভীপ্সা—কাব্যে আবার দুর্দমনীয় হয়ে দেখা দেবে।

পূর্বে দেখেছি, এ-বিরোধের অঙ্কুর প্রথম সক্রিয় হয়েছিল 'মানসী'র তৃতীয় পর্বে। তার বিক্ষোভ দেখেছিলাম 'দুরন্ত আশা' প্রভৃতি কবিতায়; বারবার দেখেছি আত্মনিবিষ্ট অনুভূতিময় জীবনের অসারতা ও সঙ্কীর্ণতা তীব্র গ্লানিতে ভরে তুলেছে কবিচিত্ত।

বৃহত্তর প্রবর্তনার মধ্যে সোনার তরী কাব্য শুরু হয়েছিল। অন্তর ও বাহির, মানুষ ও প্রকৃতিকে মিলিয়ে, একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছিল এ কাব্যে। কবিচিত্ত উন্মুখ হয়েছিল ধরণীর বেদনাতুর, অশ্রুসজল মাতৃমূর্তির কল্পনায়, তার বুকে কোমল, অসহায় মানুষের কল্পনায়। সুতরাং সোনার তরীর প্রথম পর্যায়ে কবির দৃষ্টিপ্রবণতা ছিল জীবনের মহার্ঘ বৈচিত্র্যের দিকে। তার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি—'দুই পাখি'—'যেতে নাহি দিব'—'প্রতীক্ষা'—'মানস-সুন্দরী'—কল্পনা ও অনুভূতি বাস্তবজগৎকে পরিক্রমণ করে স্তরে স্তরে ফিরে এল অন্তর্লোকে।

এ-বিরোধের প্রথম আভাস পেয়েছিলাম 'দুই পাখি'তে। নিভৃত অন্তর্লোকের কামনা ও বাস্তবের ডাক—সমান্তরালে প্রসারিত হল সে-কবিতায়। এই বিরোধেরই আভাস আবার ফিরে এল, 'মানস-সুন্দরী'র পরে, 'অনাদৃত' কবিতায় (২২ ফাল্গুন, ১২৯৯)। কবিতাটির অর্থ কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'ছিন্নপত্রে' (পৃ ২২৭-২৯)। অতল সমুদ্রে জাল ফেলে, জেলে পেল নানা অপরূপ জিনিস। দিবসের শেষে সে-রত্নগুলি যাকে দেওয়া হল—'কাকে সে-কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে'—সে তাদের অনাদর করে ফিরিয়ে দিল। জেলের মনে তখন এল অনুতাপ—

যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে।

লজ্জায় সে পথে সব উজাড় করে ফেলে দিলে। "পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি……নিয়ে গেল।" তার পর কৌতুক-চ্ছলে কবি বলেছেন কবিতার অর্থটা—সমসাময়িক পাঠক তাঁর কবিতার ভাবগ্রহণ করল না; তারা রইল 'অনাদৃত'; কিন্তু একদিন 'পস্টারিটি' তাদের সমাদর করবে, তাদের কুড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কবির ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট, অর্থও সুসঙ্গত। তথাপি এখানেও দেখি কবির অজ্ঞাতে কবিতার অর্থসঙ্কেত গভীরে চলে গেছে। 'মানস-সুন্দরী'র আবির্ভাবের পর সৌন্দর্যকল্পন-নিমগ্ন আত্মিক জীবন কি সাময়িক সূক্ষ্ম স্বীকৃতি পেল না এ-কবিতায়?

'অনাদৃত' কবিতার প্রথম স্তবকটিতে পড়ি—

সীমাহীন নীল জল

করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জলজল,
কিরণ-মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন-ভালে।

অতল সমুদ্রের এ-বর্ণনা ইঙ্গিতে ভরে ওঠে; মনে পড়ে পূর্বকবিতা 'মানস-সুন্দরী'তে 'সৌন্দর্য-পাথারে'র বর্ণনা। সূক্ষ্ম, অনুভূতিসাপেক্ষ সাদৃশ্য মনে আনে আর এক অর্থ: সৌন্দর্যের রহস্য-পাথারে বিজনে বসে কবির কল্পনার জালে যে-রত্নসমূহ বারবার উঠেছে তা বাস্তববিমুখ হলেও ব্যর্থ নয়; আজ তারা 'অনাদৃত' হলেও কালের দরবারে তারা মূল্য পাবে। 'অনাদৃত' কবিতায় এই বিশ্বাসই কি জেগেছে কবির মনে? মনে পড়ে 'মানস-সুন্দরী'র চরণ ক'টি—

অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে,...

'মানস-সুন্দরী'র অব্যবহিত পরের রচনায় এই 'আশ্বাস'ই জাগল—সৌন্দর্য-সাধনরত কাব্যজীবন নিখিলের জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও নিষ্ফল নয়।

কিন্তু নিখিলের মহাজীবনপ্রবাহ সমস্ত অবলুপ্ত করে প্লাবন আনল পরের দু'টি কবিতায়—'দেউল' ও 'বিশ্বনৃত্য'এ। প্রবল আবেগে আবার উচ্চারিত হল জীবন-আকুতি, পাষাণরাশি চূর্ণ করে ছুটে এল 'সংসারের অশেষ সুর'; জাগ্রত, সচকিত চিত্ত শুনল 'বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে' 'বিশ্ববাজনা'; উন্মুক্ত হল জীবনের মহাতরঙ্গে 'বিঘ্নবিপদ দুঃখ-মরণ' অঙ্গীকার করে ছুটে চলার দুর্বার ব্যাকুলতা।

'দেউল' কবিতার ব্যাখ্যা আছে ছিন্নপত্রে। কবি বলছেন, "যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্ব-জনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন

দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।" (ছিন্নপত্র, পৃ ২২৯)

কিন্তু এটা বাহিরের অর্থ ; কবিতাটির অন্তরের কথাটি আরও গভীরে। 'দেউল' মূলত আবার সৌন্দর্যনিমগ্ন জীবনের প্রতিবাদ, জীবনাকূতির প্রবল স্বীকৃতি। সোনার তরীতে কবিমানসের অন্তর্বিরোধ ভূমিগর্ভ হতে জাগ্রত হয়ে এবার আনল বিক্ষোভ। সমগ্র কাব্যে তার আন্দোলন মাঝে মাঝে শোনা যাবে।

তাই 'দেউল'-এর অন্তরের কথা হল : ভাবলোকাবিষ্ট কবি একদিন যত্নে গড়েছিলেন নীরন্ধ্র আলোকাহীন পাষাণ-দেউল ; বিশ্বভুবন ভুলে একমনে অর্চনা করেছেন দেবতাকে। তার পর বজ্রের মত একদিন এল মানবচেতনা, এল অসীম সংসারের আহ্বান ; চূর্ণবিচূর্ণ হল সযত্নরচিত 'দেউল'—

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর,
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতা প্রসন্ন হলেন ; তাঁর ললাটে দীপ্ত হল নূতন মহিমা, অধরে স্ফুরিত হল 'প্রসাদ হাসি'।

তিনদিন পরে কটক থেকে কলকাতার জলপথে লিখলেন 'বিশ্বনৃত্য' (২৬ ফাল্গুন, ১২৯৯)। অন্তর্গূঢ় বেদনা ও বাসনা এ কবিতায় গম্ভীরমন্দ্র ছন্দে ধ্বনিত হল। 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র দুরন্ত জীবন-অভীপ্সা দীর্ঘকাল ভূমিগর্ভে সুপ্ত ছিল ; 'দেউল' ও 'বিশ্বনৃত্যে' বহুকাল পরে আলোকে তার শীর্ষ দেখা গেল। তারা নিয়ে এল সংঘাতের সুর। কবির ভাষায়, 'মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন ছিল।' সোনার তরীর নবলব্ধ চেতনার দীপ্তিকে স্তিমিত করে বিপুলতর এক আকাঙ্ক্ষা অশান্তছন্দে কেঁপে উঠল 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়। বিক্ষুব্ধ চেতনা জাগল : জীবন সার্থক ও সত্য হবে তখনই যখন নিখিলমানবের সঙ্গে, বিশ্ব-জগতের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে, চিত্ত যুক্ত হবে। প্রশ্ন জাগে, এ চেতনার উৎস কোথায়? কোন্ প্রবল অভিঘাত রয়েছে এ কবিতার অন্তরালে?

উত্তর পেতে হলে কবির জীবনকাহিনীতে ফিরে যেতে হবে। ইং ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারির গোড়ায় (অর্থাৎ ১২৯৯ সালের মাঘের শেষে) কবি এলেন কটকে, সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট জজ্ সম্ভ্রান্ত বাঙালী বিহারীলাল গুপ্তের অতিথি হয়ে। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, "কটকে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের এমন একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, যাহার কথা তিনি জীবনে কখনো ভোলেন নাই ও কয়েকবারই সেই স্মৃতি তাঁর গল্পরচনায় স্থান পাইয়াছে।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭৫)

কটকে বিহারীলালের বাড়িতে এক সান্ধ্য ভোজনসভায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল 'একটা উৎকট ইংরেজ' 'একটা পূর্ণপরিণত জনবৃষ'। সেদিন সন্ধ্যায় যে ঘটনাটি ঘটে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে ছিন্নপত্রে (পৃ ১৭৬-৭৭); বিস্তৃত বিবরণ আছে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত, ছিন্নপত্রে বর্জিত, একটি অসামান্য চিঠিতে (বিশ্বভারতী পত্রিকা—৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—পৃ ১৪৪-১৪৫)। চিঠিটির তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, অর্থাৎ আনুমানিক ২৫ থেকে ২৭ মাঘ, ১২৯৯—'বিশ্বনৃত্য' কবিতার (২৬ ফাল্গুন, ১২৯৯) একমাস পূর্বে লেখা। সেদিনের ঘটনা কবির মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল তার স্বাক্ষর রয়েছে চিঠিটিতে—

"জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে একটা চেয়েছিল বলে চারিদিকে ভারি আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে······তর্ক করতে লাগল। বললে এ-দেশের moral standard low—এখানকার লোকের life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরী হবার যোগ্য নয়। আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব। আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।···একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙালীর মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে।······যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে যেচে মান, কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিণ্ডের মতো আহ্লাদে টল্ টল্ থল্ থল্ করে দুলে ওঠে। উঃ, ওদের কি গর্ব, কি অবজ্ঞা! আর আমাদের কি দৈন্য, কি হীনতা!········আমাদের এই দরিদ্র উপেক্ষিত অপমানিত

ভারতবর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্বলতা যত মালিন্য আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জনা করতে···চেষ্টা করি।················ সাহেবরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে, তবু তো এই না-ছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্মুক্ত করে ফেলতে পারে না। যেখানে জুতো পরে যেতে দেয় না সেখানে জুতো খুলে যাই, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না সেখানে সেলাম করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমার স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশ পরে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বসি, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই···কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ করে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে,·········ওদের একটু সংস্রব পেলে বেঁচে যাই।············তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুকরোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন—তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি্। তাতে আমার জাত যায়।····················কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত্ ঘুমতে পারিনি—কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন, বিষণ্ণ, হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম·········।"

এ-যুগের বহু দৃপ্ত আবেগময় গদ্যেও এ-চিঠির তুলনা মেলে না। ক্ষোভ, বেদনা, দুঃসহ অপমান প্রতিটি ছত্রে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করছে। দেশাত্মবোধের এত নিবিড় পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে এর পূর্বে পাই না এবং এর পরেও বেশি পাব না। নানা দিক থেকে এ-চিঠির গুরুত্ব গভীর। মাত্র সাত মাস পরেই 'সাধনা' পত্রিকায় শুরু হবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধধারা—'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০), 'ইংরেজের আতঙ্ক' (পৌষ, ১৩০০), 'রাজনীতির দ্বিধা' (সাধনা, চৈত্র ১৩০০), 'রাজা ও প্রজা' (শ্রাবণ, ১৩০১) প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ। কটকে সান্ধ্য ভোজের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এ-সব প্রবন্ধে কোথায় কি-ভাবে গোপনে সক্রিয় তা শুধু অনুমান-সাপেক্ষ। প্রায় দেড় বছর পরে (আষাঢ়, ১৩০১) রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

একটি ছোটগল্পে ('মেঘ ও রৌদ্র') এইজাতীয় ঘটনা ও এইজাতীয় দুঃসহ অবমাননার সমাবেশ দেখব ; কয়েকমাস পরেই 'অপমানের প্রতিকার' (সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১) প্রবন্ধের প্রথমেই পাব কটকের এই ঘটনার বিবৃতি।

কটক থেকে কবি সদলবলে যান পুরী এবং পুরী থেকে কয়েকদিন পরে ফিরে এসে মার্চের গোড়ায় যে চিঠি লেখেন, আমাদের কাব্য-আলোচনায় তার ইঙ্গিত সুগভীর। পুরী থেকে কটকে ফিরে এসে কবির অন্তর্বিক্ষোভ বিলুপ্ত, মন অনেকটা শান্ত। কবি লিখছেন—"......তোকে কি লিখেছিলুম কিচ্ছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে **এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস, বিজনবাস আবশ্যক**। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়...। যে সময়টা গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়।...............কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা একবৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন—গুরু গোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন।* আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই.........তাহলে কিছুই হবে না। (বিশ্বভারতী পত্রিকা—৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৪৫-৪৬)

আমাদের বিশ্বাস সোনার তরীর সুতীব্র বিরোধ ও সংঘাতের মূলে রয়েছে এই দুটি চিঠির অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। কাব্যবিচার সূক্ষ্ম অনুভূতি-সাপেক্ষ, অনুমিতিসাপেক্ষ। তাই অনুভূতি-নির্ভর অনুমানই আমরা করব যে কটকে ৯ই ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক সান্ধ্য-অভিজ্ঞতা, এবং আবার কটকে ফিরে এসে দ্বিতীয় চিঠির নির্জনপ্রস্তুতির সঙ্কল্প, দৃঢ়চিত্ততার সঙ্কল্প—'দেউল', 'বিশ্বনৃত্য' এবং 'ঝুলন'-এর অন্তরতম প্রবর্তনা। তারা কাব্যে ঋতুবদল ঘটাল, ফিরিয়ে আনল অন্তর্বিক্ষোভ, বৃহত্তর জীবনের সুস্পষ্ট আকৃতি। কাব্যে ছুটে এল 'সংসারের অশেষ সুর' ; ধ্বনিত হল 'মানব-হৃদয়ে' মিশবার ক্রন্দন ; জাগ্রত হল 'পরানের সাথে' 'মরণ-খেলা'র দুরন্ত বাসনা। অনুমান করব কবির কল্পলোকনিমগ্ন জীবনে রূঢ় আঘাতে জেগেছিল বৃহৎ জীবনের

* 'রাজা ও প্রজা'র প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ ; 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'র উপসংহারে গুরু গোবিন্দের এই নির্জন সাধনার উল্লেখ আছে।

ডাক, অজ্ঞাতবাস ও নির্জনপ্রস্তুতির আকাঙ্ক্ষা ; 'গভীর গম্ভীর নিবিষ্টভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ' করার আকাঙ্ক্ষা। অনুমান করব, পুরী থেকে কবি ফিরেছিলেন সমুদ্রের মহাতরঙ্গের 'বিপুল গভীর' মন্দ্র-ধ্বনি কানে নিয়ে ; অনুমান করব 'বিশ্বনৃত্যে' সে-মন্দ্র-ধ্বনি প্রক্ষিপ্ত হল সেই 'একজন চিন্ময় পুরুষে'র কল্পনায়, 'বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে···সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন'। 'নিখিলের মহারাজ-পথে'র আহ্বান কাব্যে আবার ফিরে এল কিন্তু অন্য রূপে : 'নির্জন-প্রস্তুতির গভীর গম্ভীর নিবিষ্টতা' তার মধ্যে নিঃশ্বসিত ; মহাসাগরের রাগিণী তার মধ্যে ধ্বনিত ; বিরাট চিন্ময় পুরুষের ধ্যানকল্পনা তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

কটক থেকে ছিন্নপত্রের (মার্চের) দ্বিতীয় চিঠিতে একান্ত মানবীয় সুরে যে কথা বলা হল, কিছুটা সেই কথাই অন্যসুরে, অন্যপ্রসঙ্গে কবি বলেছেন পঁচিশ বছর পরে, 'আমার ধর্ম'* প্রবন্ধের একটি অংশে। এ যুগের কাব্যপাঠ, বিশেষ করে সোনার তরীর কাব্যপাঠ, অসম্পূর্ণ থাকবে, সঙ্গে 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধটি না পড়লে। সমালোচকের কাছে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিমেয়। এ-প্রবন্ধে কবি বলছেন—"যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেন না এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই।············

············বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই।······সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয় ;·········

* 'সবুজপত্র'—আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪

এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীত নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ-সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠেছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করেছে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে—

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর-আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে-একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।" (আমার ধর্ম : 'আত্ম-পরিচয়'—পৃ ৪৭-৫০)

বিশ্বমানবের প্রাঙ্গণে এ-আহ্বান কাব্যে দেখা দিয়েছে 'কড়ি ও কোমল' থেকেই। 'মানসী'তে ক্ষণে ক্ষণে তার আন্দোলন আমরা দেখেছি। কিন্তু সোনার তরীতেই তা অপ্রতিরোধ্য বেগে প্রক্ষিপ্ত হল। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তস্তলে ছিল এই অগ্নিগর্ভ গিরি; তার কুণ্ডলিত ধূমাভ শিখা বারবার দেখা দিয়েছে কাব্যে; বারবার শোনা গিয়েছে ভূমিগর্ভের আলোড়ন। কিন্তু সোনার তরীতেই দেখি তার প্রচণ্ড অগ্ন্যদ্গার। তার প্রাথমিক সূচনা 'দেউল' ও 'বিশ্বনৃত্যে'; তার প্রবলতর প্রকাশ পক্ষাধিক কাল পরে 'ঝুলন' কবিতায়।

সুতরাং, 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা' শেষ করে কাব্যে দেখা দিল বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করার, 'বড়ো-আমিকে চাওয়া'র আবেগ। কাব্যে অপ্রতিহত বেগে দেখা দিল 'দ্বন্দ্ব', 'মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত'। এই সংঘাতের বিক্ষোভ ফুটে উঠেছে 'বিশ্বনৃত্য' কবিতার শেষভাগে—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহারাজপথে।
চলিতে দিবস-নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

এ বিরোধ ও সংঘাত কাব্যে সন্তত থাকবে বহুকাল; এ-বিরোধই শেষপর্যন্ত কবিকে নিয়ে যাবে কর্মজগতে—শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের প্রতিষ্ঠায়। জীবনের ও কাব্যের দীর্ঘবিলম্বিত আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বজীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা, এমন করেই সার্থকতার পথ খুঁজে নেবে, মানবকল্যাণরত সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে পরিতৃপ্ত হবে। এ-মানসিক ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস বারবার পাই কবির বিশ্বভারতী-সম্পর্কীয় রচনা ও বক্তৃতা -সংকলনে। 'জীবনস্মৃতি'র পর বাল্য ও যৌবনের এত সুস্পষ্ট বিবরণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে তাঁর জীবনের এই পর্বে আত্মবিরোধ ও কর্মআহ্বান কী ভাবে এসেছিল তার এত সুসম্বদ্ধ ইতিবৃত্ত অন্য কোথাও দুর্লভ। আমাদের আলোচনা সম্পর্কীয় কয়েকটি মূল্যবান অংশ উদ্ধৃত করা যাক। রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনায় তারা স্বল্প-পরিচিত—

"আমি চল্লিশবৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলুম?" (বিশ্বভারতী—পৃ ২৫)

এ-প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর পাই ১৯২২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে বক্তৃতায়—

"এই ('বিশ্বভারতী'র) সংকল্পের বীজ আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে।······

মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি।······

সে সময়ে আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোট ছোট কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল।

······বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বারবার করে আহ্বান করে বলেছে, "তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে······" তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মা-নদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর শর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধ্যে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জনচরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যাতারায় জলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।······আমি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করেছি। আমার কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে-সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান, একটি প্রেরণা এল, যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল।" (বিশ্বভারতী, পৃ ৪২-৪৮)

বস্তুত, এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে কবির মনে এ-বোধ জেগেছে যে ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে ভূমার আবির্ভাব নেই; দুঃখের পথে, সাধনার মধ্যেই সত্যের জ্যোতিঃস্পর্শ রয়েছে। জীবনের নানাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই কথারই পুনরুক্তি করেছেন যে বিধাতা স্বয়ং সৃষ্টির অন্তরালে তপস্যারত, মানুষ সেই তপশ্চর্যার উত্তরসাধক। মানুষও স্রষ্টা, তাই মানুষ তপস্বী। সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ উন্মেষের সঙ্গে কবির অন্তরে তাই কি তপস্বী জেগেছিল? তাই কি এই যুগে কবির কাছে তপঃসাধনা রূপ নিয়েছিল বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষায়, মহৎকর্মের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করার ব্যাকুলতায়? কবির শেষবয়সে এই কথারই বিনম্র উল্লেখ দেখি বিশ্বভারতীর ১৮-সংখ্যক রচনায়—

"পদ্মারে বোটে ছিল আমার নিভৃত আবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল আমার নিজেরই জন্যে। ……এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সঙ্গমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই (কাব্যজীবনে এ কথাটির অর্থ সুদূরপ্রসারী হবে) বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।………

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে, সকল দিক থেকে বলতে হবে, ওঁ—আমি জেগে আছি।" (বিশ্বভারতী, পৃ ১৪৯-১৫০)

এই 'নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ'কে তীব্র বিদ্রোহে আঘাত করে বারবার জেগে উঠেছে 'কবি'র মধ্যে পূর্ণতরজীবনকামী 'মানুষ'। বারবার সাড়া দিয়ে বলেছে 'আমি জেগে আছি'। সোনার তরী কাব্যে এই সাড়াই প্রথম ধ্বনিত হল 'বিশ্বনৃত্যে'; প্রবলকণ্ঠে ঘোষিত হল 'ঝুলন' কবিতায়।

সে ইতিহাসে আসার আগে মধ্যে ভারি বেদনাভরা একটি কবিতা পাই—'দুর্বোধ' (১১ চৈত্র, ১২৯৯)। 'বিশ্বনৃত্যে'র 'চাওয়ার আবেগে'র পটভূমিতে

দুর্বোধ কবিতা ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। কবির অন্তর্জীবনে এই একান্তবিরুদ্ধ দুই আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে এই 'দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব'—বিশ্বমানবের ডাক এবং সৌন্দর্যের আকুতি—তাঁর 'মানস-সুন্দরী'র কাছে একান্ত দুর্বোধ্য। তাই সুন্দরীর প্রশ্ন-ভরা দুটি আঁখি এর অর্থ খুঁজছে—

তুমি মোরে পারো না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদ ভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন করে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কবির উত্তর সরল, অকপট—

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।

হৃদয়ের অতল রহস্য কবি নিজেই জানেন না, তাঁর মানসী-প্রিয়াকে জানাবেন কি ভাবে—

এ যে সখী সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল কোথা কূল,
দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ-রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী।

তার পর অন্তিমপূর্ব স্তবকের শেষের দু'টি চরণ অর্থপূর্ণ হল—

নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

এই 'নব নব ব্যাকুলতা'ই সৃষ্টি করল সোনার তরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব।

সে-দ্বন্দ্বের পূর্ণ প্রকাশ চারদিন পরে রচিত 'ঝুলন' কবিতায় (১৫ চৈত্র, ১২৯৯)। 'দেউল'-এ পাষাণরাশি বিদীর্ণ করে ছুটে এল 'সংসারের অশেষ সুর'; 'বিশ্বনৃত্যে' শোনা গেল 'চাওয়ার আবেগে'র মধ্য দিয়ে 'মানব-হৃদয়ে'

মিশবার জন্য হৃদয়-ক্রন্দন; 'ঝুলন'-এ অন্তর্বিক্ষোভ নিয়ে এল ঝঞ্জার উন্মত্ততা। সুখশয়ন-শ্রান্ত অন্তরে এসে লাগল নিখিলের আহ্বান-তরঙ্গ। কটকের সান্ধ্য-অভিজ্ঞতা কাব্যে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল।

('ঝুলন'-এ জেগে উঠল 'মরণ-খেলা'য় ব্যাপৃত, কবির অন্তরে দুটি সত্তা—বলা যাক, একদিকে দীর্ঘরাত্রি 'অতল স্বপ্ন-সাগরে' আবিষ্ট, অধুনা জাগ্রত কবিসত্তা,—কবিতার 'প্রাণ' বা 'পরান-বধূ'; অন্যদিকে পূর্ণজীবনকামী মানবসত্তা, কবিতার 'আমি'। কবিজীবনে আজ বিরোধ হল একান্ত—

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্

… … …

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধন-সুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

কবির চেতনায় জেগেছে বিশ্বমানবের আকুতি, জেগেছে মত্তঝটিকার উন্মত্ত কলরোল; তাইতো 'পরান-বধূ' জেগে উঠেছে, 'ত্রাসে উল্লাসে' ব্যাকুল হয়েছে। তার পর পেলাম 'এতকালে'র ইতিহাস—সৌন্দর্যস্বপ্নাবিষ্ট কবিসত্তা (কবির 'পরান-বধূ') এতকাল ছিল কুসুমশয্যায় সুখের শয়নে—

ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে

গোপন ঘরে
যতন ভরে।

ক্রমে আলসে রভসে, সুখের শয়নে, পরান-বধূ শ্রান্ত হল, আবেশে আচ্ছন্ন হল। কবির মনে আশঙ্কা জাগল—

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি।

কিন্তু আজ তুফান এসেছে মহাসাগরে ; অন্তরে পৌঁছেছে বিশ্বজীবনের কলরোল ; সে-ঝঞ্ঝার অভিঘাতে পরান-বধূ কেঁপে উঠল, তার অবগুণ্ঠন খুলে গেল, প্রলয়রোল তাকে জাগ্রত করল।

মহাসাগরের তুফানেব মধ্যে, 'ঝুলন'-খেলার উদ্দামতায়, 'বধূ'কে ফিরে পেলেন কবি—

বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়-রোল।

'ঝুলন'-এ আত্মসংগ্রাম মর্মান্তিক হল। কবির জীবনকামী অন্তরসত্তা সৌন্দর্যপিপাসু কবিসত্তাকে ঝঞ্ঝার কলবোলে জাগিয়ে তুলল। কবির সংক্ষিপ্ত ভাষায়, "আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"*

'ঝুলনে' আলোকে দেখা দিল যে সমুন্নত শীর্ষ, ভূমিগর্ভে তার অঙ্কুর দেখেছি বহুকাল পূর্বে। পিছনে তাকালে সে অঙ্কুবের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হবে। 'মানসী'তে 'দুরন্ত আশা'য় অন্তর্বিক্ষোভ প্রথম এনেছিল নির্ভীক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ; 'কবিব প্রতি নিবেদন'-এ সে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হল কর্মমুখর জীবনের চিত্রণে। তাব পব বৃহত্তর জাবনেব কামনা বহুকাল ভূমি-গর্ভে সুপ্ত ছিল। সোনার তরীতে প্রকৃতি-অনুরাগ ও জীবনচেতনা সমন্বিত হল, নতুন পরিবেশ ও প্রবর্তনা আনল জীবননিষ্ঠ বোধ ও দৃষ্টি। কিন্তু

* সাহিত্যের পথে : 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধ

অচিরেই বিরোধের অঙ্কুর অবচেতনে সক্রিয় হল : 'বৈষ্ণব কবিতা' ও 'দুই পাখি'তে প্রতিফলিত হল ভাবলোক ও বাস্তবলোকের সংঘাত। তার পর কবি-জীবনের এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ঘটল কটকে ; কাব্যে তার প্রভাব সুতীব্র হল—কল্পন-নিমগ্ন জীবনবিচ্ছিন্ন জীবনধারার বিরুদ্ধে এল বিদ্রোহ ; তা প্রক্ষিপ্ত হল 'দেউলে', সঙ্কীর্ণ জীবন চূর্ণ করে 'সংসারের অশেষ সুরে'র আকাঙ্ক্ষায় ; 'বিশ্বনৃত্যে' 'নিখিলের সাথে মহারাজপথে' ছুটে যাবার বাসনায় ; 'ঝুলনে' ঝঞ্ঝার উন্মত্ত কলরোলে, ভীষণ মরণ-খেলার সঙ্কল্পে। কাব্যে আত্মবিরোধ মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল।

সোনার তরীতে এ-বিরোধ কখনও-বা স্তিমিত হবে, নিমজ্জিত হবে চিরাভ্যস্ত প্রেমকল্পনায় ; কখনো-বা বিপুল আবেগের ঘূর্ণি নিয়ে দেখা দেবে 'বসুন্ধরা'য় ; কখনও-বা সংহত রূপ নেবে সনেটের সুদৃঢ় বন্ধনে, জীবন ও মানুষের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায়। এমনি করেই অন্তর ও বাহিরের দুইকূল ছাপিয়ে দেখা দেবে নানা ভাবতরঙ্গ। তারই মাঝে পথ করে এগিয়ে যাবে সোনার তরী। কিন্তু কাব্যতরী রইবে অকূলেই ; পরিণামের চরম অনুভূতি সোনার তরীতে পাব না।

পরের কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি' রচিত হল 'ঝুলন'-এর দুদিন পরে (১৭ চৈত্র, ১২৯৯)। 'ঝুলন'-এর আত্মবিক্ষোভ দৃষ্টিকে প্রক্ষিপ্ত করল প্রকৃতির মাঝে—পেলাম তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল সমুদ্রের কল্পনা। কবি ফিরে এলেন সোনার তরীর মূলতম প্রকৃতিকল্পনায়—ছিন্নপত্রে যার সূচনা, 'যেতে নাহি দিব'-তে যার স্ফুরণ। নিঃসহায়, অশ্রুবাষ্পাকুল ধরিত্রীর কল্পনা বারবার দেখেছি ছিন্নপত্রে ; সে-কল্পনা মূর্ত হতে দেখেছি 'যেতে নাহি দিব'-তে। 'সমুদ্রের প্রতি'-তে সে-কল্পনাই ফিরে পেলাম 'আদিজননী সিন্ধু'র শঙ্কাতুর চিত্রে। বসুন্ধরা তার সন্তান, একমাত্র কন্যা তার কোলে। ব্যাকুলিত ধরিত্রীর মাতৃরূপ আরোপিত হল সমুদ্রের প্রতি। অতলস্পর্শ স্নেহে নিরন্তর সে ধরণীকে নিষ্পেষিত করছে প্রচণ্ড পীড়নে। এ-যুগের প্রকৃতিকল্পনার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ এ-কবিতায় আবার পরিস্ফুট হল—প্রকৃতির অসীম স্নেহ, 'অপার ব্যাকুলতা' সুগভীর মৌন, 'অগাধ শান্তি' অথচ 'অনন্ত আশঙ্কা'।

কিন্তু 'সমুদ্রের প্রতি'র একান্ত বৈশিষ্ট্য হল, ছিন্নপত্রের অন্যতম প্রকৃতি-কল্পনা—শিরায় শিরায় প্রবাহিত যুগযুগান্তরের একাত্মতার কল্পনা—কাব্যে এই প্রথম রূপ নিল। আদিম সমুদ্রের এই কলরোলের সঙ্গে কবির

সংযোগ অনন্তকাল ধরে ; জন্মজন্মান্তরে চেতনায় অনুরণিত তার অবিশ্রাম কলতান—

মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।………

পূর্বে দেখেছি এ-কল্পনার প্রথম ক্ষীণ আভাস ছিল 'মানসী'র 'অনন্ত প্রেম'-এ, অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে উৎসারিত যুগল-প্রেমের অনুভূতিতে। সে-অনুভূতি ছিল অস্পষ্ট, মুখ্যত নান্দনিক, ঐতিহাসিক ভিত্তি-বর্জিত। 'সমুদ্রের প্রতি'-তে সে-কল্পনা সুস্পষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে আশ্রয় করে কবির কল্পনাসৌধ এ-ভাবে পূর্বে কোথাও গড়ে ওঠে নি। তথাপি ভাবগত পার্থক্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'অনন্ত প্রেম' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কল্পনার ক্রমোচ্ছিন্নতায় সংযুক্ত থাকবে।

'ঝুলন' এবং 'সমুদ্রের প্রতি' তিনদিনের মধ্যে রচিত। এ-অব্যবহিত রচনার একটা গূঢ় অর্থ মনে আসে। 'ঝুলন' অন্তর-সমুদ্র-বিক্ষোভের চিত্র ; 'সমুদ্রের প্রতি' আদিজননী সিন্ধুর অন্তর্বিক্ষোভের বর্ণনা। অন্তরে ও বাহিরে সমান্তরালে সৃষ্ট হল প্রচণ্ড আলোড়নের দু'টি আবেগময় আলেখ্য। দু'টি কবিতাতেই ('বিশ্বনৃত্য'কে অন্তর্ভুক্ত করলে তিনটি কবিতাতেই) সাগরের উন্মত্ততা ফুটে উঠেছে। স্পষ্টতই পুরীর সমুদ্র কাব্যে ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু কৌতূহল জাগে, অন্তরে কোথায় এদের যোগসূত্র ?

এর উত্তর কিছুটা পেয়েছি 'বিশ্বনৃত্য' কবিতার আলোচনায়। কটকের অবিস্মরণীয় ঘটনা কবিচিত্তে যে বিক্ষোভ এনেছিল পুরীতে সমুদ্রের সান্নিধ্যের

পর সে-বিক্ষোভের স্তম্ভিত আবেগ দেখা দিল ছিন্নপত্রের চিঠিতে*, 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়। আশ্চর্য এই, 'পুরীতে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র' কবির 'সমস্ত মন হরণ করেছে'† কিন্তু মনোহারিণী সিন্ধু কাব্যে প্রথমে দেখা গেল না। কাব্যে দেখা গেল প্রথমে অন্তরসিন্ধুরই বিক্ষোভ—গম্ভীর ছন্দে 'বিশ্বনৃত্য' (২৬ ফাল্গুন), উত্তাল ছন্দে 'ঝুলন' (১৫ চৈত্র)। তার পর চিত্তক্ষোভ যখন শান্ত হল তখন পেলাম 'সমুদ্রের প্রতি'—পুরীতে আসার প্রায় দেড়মাস পরে। সমস্ত মন হরণ করে সিন্ধুকল্লোল প্রথমে প্রত্যাহৃত হল অন্তর্লোকে; তার তরঙ্গবিক্ষেপ উদ্দাম হল 'ঝুলন'-এ। অবশেষে শ্রান্ত কবির দৃষ্টি গেল বহির্লোকে—রচিত হল 'সমুদ্রের প্রতি'। আত্মবিলাসী রোম্যান্টিক কবির কাব্যধর্মই অপ্রতিহত রইল।।

এই দুই কবিতার যোগসূত্র বিচিত্ররেখায় ধরা পড়েছে ছিন্নপত্রেরই একটি চিঠিতে—'সমুদ্রের প্রতি' রচনার প্রায় আঠারো দিন পরে লেখা—

"এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়।…………আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেই রকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কি একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক,……কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য—প্রেমের অতল অতৃপ্তি……" (ছিন্নপত্র, পৃ ১৯১, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০)

'অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে'—এ-উক্তির ইঙ্গিত কতদূর তা শুধু অনুমানসাপেক্ষ। এ-অনুমান অসঙ্গত হবে না, এই 'অন্তরসমুদ্রে'র তরঙ্গিতরূপ, তার 'ভিতরে ভিতরে' অনির্দেশ্য 'সৃজন' ও অনির্দিষ্ট আশাই ধ্বনিত 'ঝুলন'-এ। তার পর বাহিরের সমুদ্রের সঙ্গে বহুকালের গভীর আত্মীয়তার কথা পেলাম দুদিন পরে 'সমুদ্রের প্রতি'-তে।

* 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' থেকে পূর্বে উদ্ধৃত দ্বিতীয় চিঠিটি; মার্চের প্রথমে কটক থেকে লেখা।

† ছিন্নপত্র, পৃ ১৭৯; পুরী, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার পর কাব্যে আবার ছেদ পড়ল। দীর্ঘ তিনমাস কবিতা নেই। জীবনীতে দেখি মাঘের শেষ থেকেই (১২৯৯) কবি ভ্রাম্যমাণ—পুরী, কটক, পাণ্ডুয়া, কলিকাতা, রাজসাহী, শিলাইদহ—জল-ও-স্থল-পথে কাটল ফাল্গুন ও চৈত্রের কিছুটা। এই ভ্রমণের মধ্যেই রচিত হয়েছিল 'অনাদৃত' থেকে 'সমুদ্রের প্রতি' পর্যন্ত কবিতা। ইতিমধ্যে 'সাধনা'য় 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' শুরু হয়েছে। জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখছেন—"'পঞ্চভূতের ডায়েরী' মাঘ (১২৯৯) মাস থেকে আরম্ভ হইল, কিন্তু ছোটগল্প, অন্যান্য প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গ-কথা যথানিয়মে চলিতেছে।"

বৈশাখ (১৩০০) মাসে ফিরে এসেছেন শিলাইদহে। অনেকদিন পরে আবার রয়েছেন বোটে পদ্মার বুকে। 'প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে' মন নিমগ্ন। ছিন্নপত্রে লিখছেন, "এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি,.........এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো—এর মধ্যে প্রবেশ করলে খুব একটা ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।" (ছিন্নপত্র, পৃ ১৯৫ ; মে, ১৮৯৩)

সোনার তরী কাব্যের একটি নতুন অধ্যায়ের পূর্বে তার মানসিক পরিপ্রেক্ষিতের আভাস পাওয়া গেল। সে-অধ্যায় সূচিত হল ভ্রমণ ও কর্মকোলাহলের পর শান্তি ও অবসরের মাঝে। এই 'আকাশপূর্ণ, আলোক-পূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনে' আবার মনে পড়ছে 'বহুকালের প্রেয়সী'র কথা। ক'দিনের মধ্যেই লিখছেন নিজের কবিতা-প্রেয়সী সম্বন্ধে পূর্বে উদ্ধৃত মূল্যবান চিঠিটি (ছিন্নপত্র, পৃ ১৯৭-৯৮, ৮ মে, ১৮৯৩)। 'মানস-সুন্দরী' (৪ পৌষ, ১২৯৯) এবং 'হৃদয়-যমুনা'র (১২আষাঢ়, ১৩০০) মধ্যে ব্যবধান ছ'মাসের উপর। তাদের মাঝে সেতুর মতো রয়েছে সে-চিঠিটি—'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগ্‌দত্তা ছিল'। 'মানস-সুন্দরী'র আলোচনায় চিঠিটি পূর্বে দেখেছি। পুনরুদ্ধৃতি বাহুল্য হবে।

দুই দিন পরের চিঠিতে দেখি (১০ই মে, ১৮৯৩) বর্ষার মেঘচ্ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ; তবু কবিতার দেখা মেলে না। অন্তরে আন্দোলিত হচ্ছে 'আকাশের

দিকে হাঁ-করে-তাকিয়ে-থাকা দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোর কথা' যারা 'বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়।' (ছিন্নপত্র, পৃ ১৯৯)

তথাপি পরের ১১ই ও ১৩ই মে'র চিঠি-দুটিতে দেখি প্রকৃতির রূপলোক স্পষ্টতই কবিকে আচ্ছন্ন করছে ; পুনর্মিলনের পর 'পুরাতন সখ্য' শুধু 'সহজ' নয়, নিবিড় হয়ে আসছে।* ১ ১১ই মে'র চিঠিতে লিখছেন—

"আজ সকালবেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে—আকাশ পরিষ্কার, নীল নদীর জলে রেখামাত্র নেই। ……এই সমস্ত মিলে সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারি একটি শুভ্রবসনা মহিমময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে।" * ২

ক'দিন পরে ১৬ই মের চিঠিতে বলছেন—

"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব। আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব। …………এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি ; কিন্তু সে-সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। ……..." * ৩

সুস্পষ্টত, প্রকৃতির প্রশান্তি নেমেছে কবির অন্তরে। শুধু তাই নয় ; শেষের চিঠির শেষ ক'টি লাইনে কোথায় যেন মানস-সুন্দরীর প্রেম-কল্পনার আভা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই প্রশান্তি, এই স্তব্ধনিবিড় অনুভূতি অদূরে 'হৃদয়-যমুনা' প্রভৃতি কবিতার প্রেমকল্পনার পটভূমি রচনা করল, অভ্রান্ত সূচনা আনল। বস্তুত, সোনার তরীর দ্বিতীয় পর্বের এই প্রেমকল্পনার মানসিক প্রস্তুতির পূর্ণ ইতিহাস সুপ্ত রয়েছে ছিন্নপত্রের ১৮৯৩ সালের মে মাসের পক্ষাধিককালের ক'টি চিঠিতে। এমন কি ১৬ই মে'র চিঠির শেষে পরজন্মে য়ুরোপে জন্মগ্রহণ

* ১ ছিন্নপত্র, পৃ ১১৫

* ২ ছিন্নপত্র, পৃ ২০১

* ৩ ছিন্নপত্র, পৃ ২০৬। 'মানস-সুন্দরী' রচনার পক্ষকাল পূর্বে নাটোর থেকে ২রা ডিসেম্বরের চিঠিতে দেখেছি, এ-চিঠিতেও আবার দেখলাম—'প্রশান্ত সন্ধ্যা'র পরিবেশ, তার বক্ষলগ্না, মুক্তকেশা রূপটির কল্পনা। একান্ত চিন্তনীয় এ-কথাটি যে কাব্যে মানস-সুন্দরীর আবির্ভাবের পূর্বে সন্ধ্যার চিত্রকল্পটি অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে।

করার গভীর আপত্তির কারণটা বলার প্রসঙ্গে হঠাৎ দেখি স্বীকৃতি পেয়েছে সেই আত্মনিবদ্ধ কল্পলোকপ্রয়াসী জীবন, যা পূর্বে বারবার কবিচিত্তকে গ্লানিতে ভরে তুলেছে, বিরোধের সৃষ্টি করেছে। কবি বলছেন, "কী জানি তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশপূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।" *[৪]

'ঝুলন'-এর বিরোধক্ষুব্ধ মানসিক পটভূমি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত 'এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে'; প্রকৃতির 'সুবিস্তীর্ণ শান্তি'র মধ্যে অবগাহন করে। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে আজ 'কল্পনাপ্রিয়' 'আত্মনিমগ্ন' কাব্যলোকও সমর্থিত হল *[৫]; উন্মুক্ত হল প্রেমের অপ্রতিহত কল্পনা।

নির্জনে অনবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস কাটল। তার পর আষাঢ়ের দিগন্তঘেরা মেঘ ঘনিয়ে এল; নামল 'নিবিড় কুন্তলসম'। 'গোপন-নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো কাব্যে আবার দেখা দিলেন আজন্ম-প্রেয়সী। পক্ষকালের মধ্যে পেলাম 'হৃদয়-যমুনা' থেকে 'লজ্জা' পর্যন্ত পাঁচটি প্রেমের কবিতা। তারা উৎসৃষ্ট মানস-সুন্দরীর উদ্দেশে।

কিন্তু 'মানস-সুন্দরী' কবিতার মত্ত আবেগ আজ অন্তর্হিত; 'দুর্বোধ'-এর অশান্ত প্রশ্ন আজ স্তব্ধ। 'হৃদয়-যমুনা'য় শুধু টলমল করে উঠেছে যমুনার নীল জলের স্নিগ্ধ, অতল স্তব্ধতা। 'মানসী' কাব্যের শেষে 'সন্ধ্যায়' কবিতাটিতে এ প্রশান্তির অস্তিম আভাস পেয়েছিলাম। সোনার তরীতে মানস-সুন্দরীর কল্পনায়, সে-প্রশান্তি এই প্রথম দেখা গেল। আত্মবিরোধের তরঙ্গবিক্ষোভ আজ, যে কোন কারণেই হোক, 'দুটি সুকোমল-চরণ-ঘেরা' 'তলতল ছলছল' 'হৃদয়-নীরে' রূপান্তরিত। তাই শান্ত গাম্ভীর্য কবিতাটির প্রতিছত্রে নিবিড় হয়ে উঠেছে। তা প্রচ্ছন্ন ছন্দের মন্থরতায়, প্রচ্ছন্ন প্রতিটি চরণের আটমাত্রার শেষে মন্দগামী যতিতে, অন্তমিল ও অন্তর্মিলের সুনিপুণ পুনরাবৃত্তিতে; এবং পর পর তিনটি আটমাত্রিক শব্দগুচ্ছের অলস ধ্বনিতরঙ্গের পর লঘু পাঁচমাত্রিক (তিন ও দুই) শব্দগুচ্ছের অকস্মাৎ-থেমে-যাওয়া ধ্বনির অপূর্ব ব্যঞ্জনায়। যমুনার

---

*[৪] ছিন্নপত্র, পৃ ২০৭

*[৫] এ সমর্থনেরই পূর্বাভাস দেখেছি 'দুই পাখি' কবিতায়; পরে 'অনাদৃত' কবিতায়।

অতল জলের মৃদু স্রোত-হিল্লোল, তটের বুকে তার লঘু আঘাত, কী অসামান্য শিল্পকর্মে ধরা পড়েছে।

তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম ; নিবিড় কুন্তলসম।
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

'হৃদয় যমুনা'য় পেলাম 'মানস-সুন্দরী' কবিতারই ক্রমিক পরিণতি। 'মানস-সুন্দরী'তে দেখেছিলাম প্রথম পরিচয় ও মিলনের আবেগনিবিড়তা : সে-প্রেম কবিকে নিয়ে গেল প্রকৃতির গহনলোকে, জন্ম-জন্মান্তরের প্রদোষালোকে। 'মানস-সুন্দরী'তে প্রথম আবিষ্কারের বিস্ময় কবিকে আবিষ্ট করেছিল। 'হৃদয়-যমুনা'র সুর পৃথক, অনুভূতি ভিন্নমুখী। সে উচ্ছল আবেগ আজ নেই ; সে দুঃসহ কামনা আজ অন্তর্হিত। আজ আছে সুনিবিড় পরিচয়ের অতল প্রশান্তি ; তা প্রসারিত গভীর জলের 'তলতল ছলছল' শব্দে, আর গাঢ়তম বর্ষার 'নিবিড় কুন্তলসম' মেঘপুঞ্জে।

'হৃদয়-যমুনা'র প্রতিটি স্তবকে প্রেমের ক্রমোন্নত স্তর বিকশিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের প্রেম-যমুনায় কুম্ভ ভরে নিতে একাকিনীর আগমন : জলে কলস ভাসিয়ে 'আপনা ভুলে' কূলে বসে থাকা ; অবগাহন-মানসে গহন-তলে নেমে আসা এবং মরণ-আকাঙ্ক্ষায় অতলজলে ঝাঁপ দেওয়া—এরা প্রেমের নিবিড়তার ক্রমোত্তিন্ন প্রকাশ। কিন্তু পূর্ণমিলনের মধ্যেও কবিতাটির শেষে একটি বেদনার সুর বেজে উঠেছে। কবিতাটি শেষ হয়েছে মরণ-কল্পনায়—

যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

প্রশ্ন ওঠে, নিবিড় মিলনের মাঝে এ-মরণকল্পনার কারণ কি? প্রেমের চরম ও পরম সার্থকতা মৃত্যুতে এটা রোম্যান্টিক কাব্যের অতি প্রিয় ও সুপরিচিত কল্পনা। 'মানসী' কাব্যের আলোচনায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, পুনরুক্তি বাহুল্য হবে। সম্ভবত সেই চিরাভ্যস্ত রোম্যান্টিক কল্পনারই অনুস্মৃতি এখানে দেখি। তবু আরও একটা গভীরতর কারণ মনে আসে :

তার উৎসমূল রয়েছে 'বিশ্বনৃত্য', 'দুর্বোধ' এবং 'ঝুলন' কবিতায়। পূর্বে দেখেছি, 'বিশ্বনৃত্যে'র অশান্ত আকাঙ্ক্ষা, কবিচিত্তের 'নব নব ব্যাকুলতা' মানস-সুন্দরীর কাছে 'দুর্বোধ্য'; দেখেছি তার 'প্রশান্ত, বিষাদভরা দুটি আঁখি'র অর্থসন্ধানী প্রশ্নের উত্তরে কবির সুস্পষ্ট উক্তি—

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে।
গভীর হৃদয় মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে।

হৃদয়ের এই 'নীরব সংগীত'ই নিয়ে এল 'ঝুলন'-এর উন্মত্ত বিদ্রোহ।

'বিশ্বনৃত্য', 'দুর্বোধ' ও 'ঝুলন'-এর বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে 'হৃদয়-যমুনা'র অন্তর্ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হবে। সেই অতীতেরই ছায়াপাত ঘটল শেষ স্তবকে। মানসী-প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের পরিসমাপ্তি আজ শুধু মৃত্যুর মাঝেই হতে পারে, কারণ যে-অতল হৃদয়সলিলে প্রেয়সীর অবগাহন, সে-হৃদয় নানা তরঙ্গবিক্ষোভের পর—

মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

অতল হৃদয় নানা-বিরোধ-কণ্টকিত, নানা-আকাঙ্ক্ষা-আলোড়িত। ক্ষণিক মিলন সেখানে মরণবেষ্টিত; তার চরম পরিণতি মরণেই।

পাঠকের চোখে পড়ে 'দুর্বোধ'-এর কয়েকটি চরণের সঙ্গে 'হৃদয়-যমুনা'র শেষস্তবকের গভীর সাদৃশ্য। 'বিশ্বনৃত্যে'র আকাঙ্ক্ষাপীড়িত কবি 'দুর্বোধ'-এর পঞ্চম স্তবকে বলছেন—

এ যে সখী সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।

'হৃদয়-যমুনা'র শেষস্তবকে দেখি এই অতল ও অকূল জলের পুনরুল্লেখ—

স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।

হৃদয়ের 'অতলতা', 'অকূলতা', 'অন্তহীনতা' পুনরুক্ত হল 'হৃদয়-যমুনা'র। এ-পুনরুক্তি অর্থপূর্ণ। যে-হৃদয়ের অন্তহীন রহস্য 'মানস-সুন্দরী'র কাছে দুর্বোধ্য সে-হৃদয়ের অতল গভীরে অবগাহন মরণেরই নামান্তর।

প্রশান্তির মধ্যে বিক্ষুব্ধ অতীতের ছায়া 'হৃদয়-যমুনা'য় শুধু মরণ-কল্পনাই আনল না, পরের চারটি কবিতায় বেদনা ও ব্যর্থতার রেখাও ফুটে উঠল। 'ব্যর্থ যৌবন', 'ভরা ভাদরে', 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জা' (১৬, ২৭, ২৭ এবং ২৮ আষাঢ়, ১৩০০)—এরা মানসী-উদ্দিষ্ট প্রেমের কবিতা ; সে-প্রেম 'বিফল-নয়নজল'-ধৌত, বিরহশয়ন-রজনীর ব্যর্থতা-কণ্টকিত, 'শোণিতরাঙা বেদনা'-বেষ্টিত। একটি নিষ্পিষ্ট দীর্ঘশ্বাস যেন কবিতাগুলির মধ্যে নিঃশ্বসিত। 'হৃদয়-যমুনা'র প্রশান্ত অনুভূতির অন্তিমে এল মরণ-কল্পনা ; তার পর সংশয় ও বেদনা আবার কাব্যে জাগল ; প্রেমের নিবিড়তার মধ্যে প্রেমের বেদনা ও ব্যর্থতা ফুটে উঠল।

'ব্যর্থ যৌবন' মানসী-কাব্যের কিছু প্রেমের কবিতার সমধর্মী। নৈরাশ্য ও বেদনার সঙ্গে মিলেছে কোমল, কিছুবা দুর্বল ভাবালুতা। 'হৃদয়-যমুনা'র শান্ত গাম্ভীর্য তরল উচ্ছ্বাসে মিলিয়ে গেল। শুধু লিরিকের ছোঁয়া লেগেছে এখানে সেখানে।

পূর্ণ-আষাঢ়ে রচিত হল পরের কবিতা 'ভরা ভাদরে' (২৭ আষাঢ়)। ছিন্নপত্রের সমকালীন মানসিক পরিবেশ প্রথম পূর্ণভাবে কাব্যে প্রতিফলিত হল। পদ্মার বুকে জীবনধারার শান্তি ও সৌন্দর্য—'প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে' 'আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ' দিনযাপন—কাব্যে প্রথম দেখা দিল —

নদী ভরা কূলে কূলে, খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।

সোনার তরীর আর কোন কবিতায় আকাশ এবং আলোক এমন স্তব্ধ প্রশান্তিতে টলমল করে ওঠে নি, মন এমন 'কানায় কানায় পূর্ণ' হয়ে ওঠে নি,

ঠিক এই সময়ে কবির মানসী কেন এত একান্ত হয়ে উঠেছিল, 'ভরা অনুরাগ' বহন করে এনেছিল, সে- কথা সুস্পষ্ট হবে 'ভরা ভাদরে' কবিতাটির অন্তরে প্রবেশ করলে। প্রকৃতির এই দিগন্তমেলা রূপসৌন্দর্যে মন যখন ভরে উঠেছে তখন অন্তরাকাশ সমাচ্ছন্ন করল মানসীরই কালো কেশ আর দুটি কালো আঁখি—

ঝিলি মিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্বগাছের সার
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।

তবু কবিতাটি শেষ হল অকারণ ভরে-আসা চোখের জলে—

পাখির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।

এ-চোখের জলের কারণটা রয়েছে পূর্ববর্ণিত আত্মবিরোধের মধ্যে। কবিমানস আজ সাময়িক প্রশান্তি সত্ত্বেও, দ্বিধা-বিভক্ত। মানস-সুন্দরীর 'সুকোমল চরণ' দুটির নূপুরঝঙ্কার, তার চিরযুগব্যাপী স্মরণ ও আহ্বান, তার কালো দুটি আঁখির মায়া যেমন অনুপেক্ষণীয়, তেমনি অলঙ্ঘনীয় তরঙ্গিত মহাজীবনের আকুতি।

এ-বিরোধ ও বেদনা আবার একান্ত হয়ে উঠেছে 'প্রত্যাখ্যান'-এ। 'ভরা ভাদরে' ও 'প্রত্যাখ্যান' একই দিনে রচিত (২৭ আষাঢ়, ১৩০০); এদের মাঝে দেখি 'দুর্বোধ' কবিতার ক্রমপরিণতি। 'দুর্বোধ'-এ দেখেছি কবির অনন্তব্যাকুলতা-ভরা মন মানস-সুন্দরীর কাছে 'অন্তহীন রহস্যনিলয়'; তথাপি তার সম্রাজ্ঞী সেই 'রানী'—

এ-রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ-তবু তোমার রাজধানী।

কিন্তু 'প্রত্যাখ্যান'-এর সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'অন্তঃপুরমহিষী' মানস-সুন্দরী এ-কবিতায় দীননয়না, বহির্দ্বার-উপগতা; সেখানে তাঁর করুণ করাঘাত।

তাঁর 'গলায় মালা', 'নবীন বেশ, শোভন ভূষা'; তথাপি তাঁর বাসরশয্যা রচিত হল না। কোথায় তার নানা উপকরণ?

হেথায় কোথা কনক-থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসর-সেবা করিবে কেবা
রচনা।
এমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না।'

ব্যর্থমনে ফিরে গেলেন শোভনভূষণা, নবীনবেশধারিণী। 'প্রত্যাখ্যাত' হলেন মানস-সুন্দরী।

তার পর পক্ষকাল পরে এই 'প্রত্যাখ্যানে'রই সুদীর্ঘ আবেগময় প্রতিবাদ এল—'পুরস্কার' কবিতায় (১৩ শ্রাবণ, ১৩০০)।

'পুরস্কারে'র প্রথমেই দেখি কাব্যে আবার ফিরে এসেছে বাস্তবনিষ্ঠ পরিহাসোচ্ছল দৃষ্টি। 'হিং টিং ছট্', এবং কিছুটা 'যেতে নাহি দিব'র প্রথম স্তবকের পর, সোনার তরীতে এ-দৃষ্টি মিলিয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে কাব্যে আবার দেখা দিল সে দৃষ্টি—যেন সুদীর্ঘকাল আত্মরত, সংগ্রামরত কবি নিজেকে মেলে দিচ্ছেন জীবনের আপাততুচ্ছ চাপল্যের মাঝে—

সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়ো বড়ো,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।..."

এই হাস্যরসদীপ্ত জীবনবোধ 'পুরস্কার' কবিতার পটভূমি। তার পর তার পুরোভূমিতে পেলাম কবির বাণী-বন্দনা—

প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখ-ছবি!

বিমল মানসসরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগুঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।

সুদীর্ঘ চল্লিশ স্তবকব্যাপী এ-বাণীবন্দনায় কবিমানস নতুন আলোকে প্রতিভাত হল। প্রবল আত্মসংগ্রামের পর, মানস-সুন্দরী প্রত্যাখ্যাত হবার পর, আবার সব ছাপিয়ে উঠল 'বিশ্বপ্লাবিনী অমৃত-উৎসধারা', ঝঙ্কৃত হল 'কমলকুঞ্জাসনা'র কাব্যবীণা। 'প্রত্যাখ্যান' কবিতার ভাবক্ষণ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হল 'পুরস্কার' কবিতায়। এ-দীর্ঘ বাণীবন্দনায় দেখি এক অবমুক্ত নিবৃত্তির সুর—যেন সংগ্রাম-শ্রান্ত কবি সমস্ত বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে মুছে ফেলে অন্তরে তুলে নিচ্ছেন সর্বভোলা মহারাগিণীর বাণীঝংকার—

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িবে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।

'পুরস্কারে'র এই সব-ভোলানো সংগীতের কাছে আত্মনিবেদন প্রথম পেয়েছিলাম মানস-সুন্দরী'তে। সে কবিতার মধ্যভাগে আত্মসমর্পণের এই তীব্র বাসনাই ফুটে উঠেছে—

তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহৃত,
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি,
সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি।

'পুরস্কার' ও 'মানস-সুন্দরী'র উদ্দিষ্ট সত্তা একই—কবির কাব্যলক্ষ্মী; 'মানস-সুন্দরী'তে তিনি প্রিয়া, 'পুরস্কার'-এ তিনি দেবী—স্বয়ং বীণাপাণি। কবির অন্তরতম জীবনেরই রেখা পড়েছে এ-দুটি কবিতায়; এ-রাগিণীর সঙ্গে পরিচয় কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এ-রাগিণীর মোহনজাল ছিন্ন করে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপ দেবার আকুলতা সোনার তরীর একদিকের ইতিহাস; এ-রাগিণীকে সর্বদেহমনে স্বীকার করে অনাদি সংগীতের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার আকুতি সোনার তরীর অপরদিকের ইতিহাস। বিরোধ-ক্লান্ত কবির তাই কী সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি!—

যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসার-কোলাহল।

এ-আত্মহারা বাণীচরণাশ্রিত কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই কবিরই অন্তরজীবনের বাসনা, বেদনা ও সাধনার কথাই ধ্বনিত 'পুরস্কার' কবিতায়।

কিন্তু এ একদিকের ইতিহাস; অন্যদিকে দেখব ঝঞ্চার বেগে হৃদয়তরণী ছুটবে ভিন্নমুখে; বিপুল আবেগে জাগবে এই 'ধরণী' ও 'সংসারে'র কোলাহল। উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে সোনার তরীর—বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা—'বসুন্ধরা'।

'হৃদয়-যমুনা' থেকে 'পুরস্কার' পর্যন্ত সোনার তরী কাব্যের একটি বিশিষ্ট পর্যায়। কাব্যে প্রথম প্রতিফলিত হল পদ্মার দিগন্তঘেরা জল-স্থল-আকাশের ঘন নিবিড় প্রশান্তি। সে-প্রশান্ত স্তব্ধতায় কবির 'আত্মনিমগ্ন, আকাশপূর্ণ' অন্তরে 'গোপননিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো' ফিরে এসেছিলেন কবির মানস-সুন্দরী।* কিন্তু শীঘ্রই সে 'নিশ্চিন্ত মুগ্ধ' জীবনে বেদনা ও ব্যর্থতার রেখা ফুটে উঠল; ইঙ্গিতে দেখা দিল অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস। অবশেষে 'পুরস্কারে' বীণাপাণির সব-ভোলানো রাগিণীই ঝঙ্কৃত হল।

* 'হৃদয়-যমুনা' থেকে 'লজ্জা' পর্যন্ত কবিতা-ক'টি রচিত হল ১২ আষাঢ় থেকে ২৮ আষাঢ়, ১৩০০। শেষ কবিতার দুইদিন পরে 'ছিন্নপত্রে' লিখছেন, "অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল 'সাধনা' রিক্ত হস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি।" (পৃ ২২৪) (৩০ আষাঢ়, ১৩০০)

'পুরস্কারে'র পর কাব্যে ছেদ পড়ল আবার কিছুকাল। সাধনার 'রিক্তহস্ত' ভরে তোলার দায়িত্ব রয়েছে; নানা কর্মব্যস্ততা রয়েছে। তাছাড়া এই সময়ে লিখলেন 'বিদায় অভিশাপ' (২৬ শ্রাবণ, ১৩০০)। তার পর বোটের প্রকৃতিনিমগ্ন জীবন থেকে ফিরে এলেন ভাদ্রের প্রথমে কলকাতায়; এলেন সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির মধ্যে—রাজনীতিক আলোচনার প্রবল আবর্তের মাঝে। চৈতন্য লাইব্রেরীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পাঠ করলেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'—সাধনাযুগের প্রথম রাজনীতিক প্রবন্ধ। তার পর আবার কিছুকাল ভ্রমণের পর আশ্বিনের প্রথমে ফিরলেন কলকাতায়। সোনার তরীর শেষপর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ রচিত হল ২৬ কার্তিক থেকে ২৭ অগ্রহায়ণের মধ্যে।

মানস-সুন্দরীর সান্নিধ্যে 'গোপননিবিদ্ধ সুখসম্ভোগ' কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না; হবার কথাও নয়। বৃহৎ মানবের ডাক, বিশ্বজীবনের আহ্বান আজ কবির রক্তকণায় এসে মিশেছে। নিখিলের জীবনতরঙ্গ বারবার সংক্ষুব্ধ করে তুলেছে কবির বিদ্রোহী মনকে। বারবার তা প্রতিহত হয়েছে কল্পলোকের কুহকরাগিণীতে, যে-রাগিণীর ঝংকার—

আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম।

সে-দীর্ঘবন্দী বিমুগ্ধ কবি অবেশেষে সমস্ত-কিছু ছিন্ন করে, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবার দেখা দিল 'বসুন্ধরা'য়। প্রথম তিনটি স্তবকে উচ্ছিত হল কবির বহুকালসঞ্চিত বাসনা। একমাত্র 'ঝুলন' ব্যতীত পূর্বে আর কোথাও আবেগের এ-উন্মাদনা দেখি নি—

…ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,

শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ;.........

বসুন্ধরার অঞ্চলতলে ব্যাপ্ত হবার এ-উদ্দাম বাসনা উন্মুক্ত হল দীর্ঘ দুটি স্তবকে। বিশ্বের সমগ্রতাকে সর্বদেহমনে উপলব্ধি করার, জীবন ও ধরণীকে বেষ্টন করার, সমস্তকে স্পর্শ করে সমস্তের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার, উন্মত্ত জীবন-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লাসে ছুটে চলার প্রচণ্ড কামনা এ-কবিতার স্তবকে স্তবকে বিকীর্ণ—

...চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ; সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
... ...
......, ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা কিছু আছে ;......
... ...
......ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব লোক সনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন ;......
......সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
... ...
উন্মুক্ত জীবনস্রোতে বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত

অকাতরে ; পরিতাপ-জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লসি,—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালোবাসি—
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণ পালভরে
লঘুতরী সম।

ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।
হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ ;

মানসী ও সোনার তরীতে আবেগের বন্ধমুক্ত উদ্দামতা দেখেছি একাধিক বার, কিন্তু 'বসুন্ধরা'র সংরক্ত আবেগ যেন ঝঞ্ঝাহত সমুদ্রের মত গর্জে উঠেছে। সে-ঝঞ্ঝার উন্মত্ততা দেখি স্তবকে স্তবকে উচ্ছ্রিত আকাঙ্ক্ষায় ; সে-সমুদ্রের বিশালতা দেখি বাসনার বিপুলতায় ও বৈচিত্র্যে।

'বসুন্ধরা'র অগ্নিগর্ভ সংরাগের পিছনে আছে দীর্ঘবিলম্বিত ইতিহাস। যে গর্ভাগ্নির প্রমথিত আন্দোলন দেখেছি কড়ি ও কোমল-এর 'আহ্বান-সংগীত'এ, মানসীর 'দুরন্ত আশা'য়, সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্য' ও 'ঝুলন'এ—সে গর্ভাগ্নি বিকীর্ণ হল 'বসুন্ধরা'র বহ্নিপ্রবাহে। তার লেলিহান শিখা স্পর্শ করল আকাশ ও ধরণী, প্রকৃতিলোক ও প্রাণলোক। এ বিস্ময়কর অগ্ন্যুদ্গার সোনার তরী কাব্যেই সম্ভব হয়েছিল যেখানে একাধারে দুর্লভ মিলন ঘটেছিল এবং মহার্ঘ সংঘাত ঘটেছিল—'বিশ্বপ্রকৃতির ও মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনায়'।

কিন্তু পূর্ব-ইতিহাসের সঙ্গে এক জায়গায় 'বসুন্ধরা'র পার্থক্য গভীর; বস্তুত, সেইখানেই দেখি 'বসুন্ধরা'র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 'দুরন্তআশা'র 'বিশ্বনৃত্যে' এবং 'ঝুলন'-এ অন্তর্বিরোধেরই ক্রমোন্নত প্রকাশ দেখি—কবি স্বয়ং যাকে বলেছিলেন "দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব"। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ পূর্বের তিনটি কবিতায় এনেছে বিদ্রোহ, এনেছে তীব্র বাসনার সঙ্গে দুঃসহ আত্মধিক্কার। 'ঝুলন'-এ এই বিরোধ, বিদ্রোহ ও গ্লানি উত্তীর্ণ হয়েছে চরম শীর্ষে; সেখানে তারা এনেছে ঝটিকার প্রলয়রোল।

কিন্তু, 'বসুন্ধরা'য় সে-বিরোধ ও আত্মগ্লানি দেখি না। যে-'ইচ্ছা'র তরঙ্গ স্তবকে স্তবকে উদ্দাম হয়ে উঠেছে এ-কবিতায়, তা আবেগে উল্লাসে উদ্বেল; শুধুমাত্র, ...

………টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,………

ছাড়া আর কোথাও বিরোধ ও গ্লানির রেখামাত্র নেই। সমস্ত কবিতাটিতে অধীর আনন্দবেগ সত্যই 'হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া' 'আলোকে পুলকে' প্রবাহিত।

এর গূঢ় কারণের ইঙ্গিত রয়েছে ঠিক আগের কবিতাগুলির ইতিহাসে। প্রথমত, পদ্মার বুকে প্রকৃতির সাহচর্য কবির অন্তরে বিরোধ সুপ্ত থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে এনেছিল প্রসন্ন শান্তি, আনন্দময় জীবনচেতনা। ছিন্নপত্রের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত চিঠিগুলিতে (বৈশাখ থেকে আষাঢ়, ১৩০০) এবং 'হৃদয়-যমুনা' থেকে 'পুরস্কার' পর্যন্ত কবিতায় তার স্বাক্ষর দেখেছি। মনে রাখা প্রয়োজন, সংশয়, বেদনা এবং অন্তর্বিরোধ এ-কবিতাগুলিতেও তাদের ছায়া ফেলেছে কিন্তু তা নিবিড় নয়, স্নিগ্ধ ও ক্ষীণ। মনে রাখা প্রয়োজন, 'ঝুলন'-এর বিক্ষোভে আর 'হৃদয়-যমুনা'র, 'ভরা ভাদরে'র বা 'প্রত্যাখ্যান'-এর বেদনায় গভীর পার্থক্য।

দ্বিতীয়ত, এ পর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি কাব্যে ও ছিন্নপত্রে কি ভাবে অনুভূতিময় কাব্যজীবন সমর্থিত হচ্ছে। যে আত্মগ্লানি কাব্যে দেখা দিয়েছিল তা একেবারে বিলুপ্ত না হলেও, ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সুতরাং 'বসুন্ধরা' যখন রচিত হল তখন তার প্রারম্ভেই 'নিরানন্দ অন্ধ কারাগার' আত্মগ্লানির স্পর্শ আনল, কিন্তু তা কোথাও তীব্র হয়ে উঠল না। বরং

বিপুল জীবনোচ্ছ্বাসে তা ধুয়ে মুছে গেল। বাসনার বৈচিত্র্য ও নিবিড়তাই কবিতায় স্ফুরিত হল। 'বসুন্ধরা'ই প্রথম অন্তরের 'অন্ধ কারাগার'-মুক্ত, আত্মধিক্কারবর্জিত জীবনকামনার উচ্ছলিত প্রকাশ।

'বসুন্ধরা'র মধ্যভাগে ফিরে এল ছিন্নপত্র ও সোনার তরীর বৈশিষ্ট্যময় অনুভূতি ও কল্পনা—এ পুরাতন পৃথিবীর সঙ্গে লক্ষকোটিবর্ষের আদিমতম একাত্মতা। প্রায় দশমাস পূর্বে (২০শে অগাস্ট ১৮৯২; ভাদ্র, ১২৯৯) ছিন্নপত্রে প্রথম দীর্ঘবর্ণনায় আবির্ভাব ঘটেছিল এই একাত্মকতা-অনুভূতির। 'মানস-সুন্দরী' কবিতার অন্তরালে সক্রিয় দেখেছিলাম এই অনুভূতি ও কল্পনা; মানস-সুন্দরী আবির্ভূত হয়েছিলেন এই কল্পনারই নিগূঢ় প্রেরণায়। তার পর কাব্যে তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটল 'সমুদ্রের প্রতি'-তে। 'বসুন্ধরা'য় সে কল্পনা ফিরে পেলাম আরও নিবিড় ও ব্যাপক অনুভূতির মধ্যে—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

'সমুদ্রের প্রতি'-তে আদিজননীর উন্মত্ত স্নেহক্ষুধা কবিকে স্মরণ করিয়েছিল যুগযুগান্তরের আত্মীয়তা; নাড়ীতে প্রবহমাণ রক্তের কণায় কণায় জাগিয়েছিল মাতৃহৃদয়ের 'গূঢ় স্নেহব্যাকুলতা'। 'বসুন্ধরা'য় সে একাত্মতা এবার স্থাপিত হল ধরণীর মাটির সঙ্গে, পত্রপুষ্প তরুরাজির সঙ্গে।

এ-চেতনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকল্পনায় যুগান্তর আনল। প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হল কবির দৃষ্টি ও অনুভূতি; ব্যাপক, গভীর এবং তীব্র হল কবির প্রকৃতি-অনুভব, উপলব্ধি ও কল্পনা। প্রকৃতিকল্পনায় যে পরাদৃষ্টির (vision) প্রথম উন্মেষ দেখেছিলাম 'যেতে নাহি দিব'-তে, সেই পরাদৃষ্টিরই প্রগাঢ়তর প্রকাশ আবার দেখলাম 'বসুন্ধরা'য়। প্রথম 'সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে' অনুভূত হল প্রকৃতিলোকে বিরাট প্রাণের স্পন্দ

সঞ্চার, তার শিহরিত সঞ্চরণ, তার আনন্দ-আকুল 'মূঢ় প্রমোদ-রস'। শ্রেষ্ঠতম প্রকৃতি-কাব্যে অনুভূতি প্রজ্ঞাগত বোধের সীমানা ছাড়িয়ে পরাদৃষ্টির ভাস্বরতায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে ; কবি তখন শুধু কল্পনা করেন না, শুধু অনুভবই করেন না ; কবি তখন তাঁর তৃতীয় নেত্র মেলে তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ে যান প্রকৃতির অন্তর্মূলে। সে উদ্ভাসিত, উন্মীলিত তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি রয়েছে পূর্বোদ্ধৃত স্তবকের পরেই, যেখানে উন্মুক্ত হল প্রকৃতির গহন অন্তরে গূঢ় পুলকে উৎসারিত, সঞ্চারিত, প্রবাহিত 'জীবনরসধারা'র অনন্ত প্রস্রবণ—

… … তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর ; তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ ; কুসুম-মুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে ; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।

গভীর অর্থময় প্রথমেই এই 'তাই' শব্দটি। সুস্পষ্ট হল এই কথাটি—জন্ম-জন্মান্তরের আদিম সংযোগ রক্তে বহন করে এনেছে যে-চেতনা 'তাই' ক্রমে কবিকে নিয়ে গেল প্রকৃতির অন্তর্মূলে, নিসর্গলোকের প্রাণ-রহস্যে। লক্ষকোটিবর্ষের মূঢ় স্মৃতি মিশে আছে শিরায় শিরায় ; তাইতো সর্ব অঙ্গে মনে কবি আজ অনুভব করছেন ভূমিনিম্নে তৃণাঙ্কুরের শিহরণ, জীবনরসধারার সঞ্চরণ। তাই, বায়ুভরে যখন নারিকেল গাছগুলো কেঁপে উঠল, কবির অন্তরে জাগল ব্যাকুলতা, মনে পড়ল সেই যুগান্তরের স্মৃতি—

……..জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন ; ……

ইংরেজী সাহিত্যালোচনায় কাব্যনাট্যে মহাসংরাগের (grand passion) বহু স্তুতিবাদ আছে ; দৃষ্টান্তও অসংখ্য। নাটকের মানবীয় সংঘাতে নাট্য-চরিত্রের অন্তর্বিক্ষোভে এই মহাসংরাগ দেখা দিয়েছে ; মার্লো থেকে এলিয়ট পর্যন্ত কাব্যনাট্যে তার প্রভূত দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু নিছক কাব্যে—এবং আত্মমুখী গীতিকাব্যে—বসুন্ধরার এ-মহাসংরাগের কোথাও তুলনা আছে বলে মনে পড়ে না।

'বসুন্ধরা'র ঐতিহাসিক মূল্যও গভীর। এ-কবিতাতেই প্রথম সার্থক সমন্বয় ঘটল 'বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকে'র প্রবর্তনার। পুনরুক্তি করা যাক, 'বসুন্ধরা'ই প্রথম কবিতা যেখানে জীবনকামনা উন্মত্ত আবেগে উৎসারিত, কিন্তু 'আলস্যপূর্ণ' অনুভূতিময় জীবনের গ্লানি, অন্তর্বিরোধের বেদনা, অবলুপ্ত। সমগ্র কবিতাটি পড়লে মনে হয় অন্তরের গভীরে কোথায় যেন সমন্বিত দীর্ঘ-দিনের অনন্ত সৌন্দর্যকামনা, এবং বৃহত্তরজীবনকামী, সমগ্রতাপ্রয়াসী বিপুল 'ইচ্ছা'—

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎস সম উঠিয়াছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধরে……

এ-সমন্বয়ের পথ 'বসুন্ধরা'য় বিচিত্র রূপ নিল। সৌন্দর্যেরই আকৃতি স্তরে স্তরে, পর্বে পর্বে এনেছে এই ধরণীর সঙ্গে বহুজন্মের একতার চেতনা। সেই চেতনাই 'মানসী' ও পরে 'মানস-সুন্দরী'র কল্পনাকে ব্যাপক ও গভীর করল। জন্মপূর্ব স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে 'মানসসুন্দরী' পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভুবনে। যে-চেতনা নিয়ে সৌন্দর্যমূর্তিকে দেখলেন বিশ্বচরাচরে, সেই চেতনাই, সেই 'যুগ-যুগান্তরের মহামৃত্তিকা-বন্ধন' এবার আবার নতুন করে জাগাল বসুন্ধরার প্রতি উন্মত্ত প্রেম। যে-চেতনা রয়েছে সৌন্দর্যসত্তার মূলে, সেই চেতনাই

দেখা দিল বসুন্ধরার প্রতি প্রেমে। বিরোধের তীব্রতা তাই আর রইল না।

'মানসী'র আলোচণায় সৌন্দর্যকল্পনার ক্রমাভিব্যক্তির যে স্তরনির্দেশ পূর্বে করা গেছে, তা অনুসরণ করলে বোধ হয় কথাটি আরও সুস্পষ্ট হবে। মানসীকাব্যে 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'-এর বহুজন্মপ্রবাহিত চেতনায় সৌন্দর্যকল্পনার তৃতীয় স্তর দেখেছিলাম। 'অহল্যার প্রতি'র নৈর্ব্যক্তিক ভাবকল্পনায় পেয়েছিলাম তার চতুর্থ স্তর। তার পর ছিন্নপত্রে 'অনন্ত প্রেম'-এর চেতনা প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিবিড় হয়ে দেখা দিল: বিশ্বপ্রকৃতির পেলাম বিশ্বের সঙ্গে গণনাতীত যুগ ধরে 'মহামৃত্তিকা-বন্ধনে'র কল্পনা। ছিন্নপত্রের এ-কল্পনা প্রচ্ছন্ন হল 'মানসসুন্দরী' কবিতায়, পূর্বজন্মের ও পরজন্মের প্রেমকল্পনায়। 'মানস-সুন্দরী'তে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসত্তা পঞ্চম স্তরে পৌঁছল। তার পর বসুন্ধরায় এই আদিম একাত্মতার অনুভূতি কবিকে নিয়ে গেল প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশে: কবি সর্বদেহেমনে উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির অন্তরে নিয়ত, নিঃশব্দ প্রাণপ্রবাহ। অননুভূতপূর্ব অবেগে দেখা দিল ধরণার জল-স্থল-আকাশকে দুটি বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করার, প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় প্রাণস্পন্দন নাড়ীতে নাড়ীতে উপলব্ধি করার বাসনা। বাল্যের 'অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গ' এমনি বহুবিচিত্র অনুভূতি ও কল্পনার পথে, নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, নিয়ে এল 'মানস-সুন্দরী', নিয়ে এল 'বসুন্ধরা'। নিগূঢ় যোগসূত্র কাব্যে আনল ভাবসমন্বয়। অন্তর্বিরোধ কিছুকালের জন্য স্তিমিত হল।

সোনার তরীর মধ্যভাগে দেখেছিলাম অন্তর্লোক ও মানবলোকের মধ্যে ক্রমপ্রবল সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'বিশ্বনৃত্যে' ও 'ঝুলনে' দেখেছি তার ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ। তার পর 'বসুন্ধরা'য় আবার স্ফুরিত হল বিশ্বজীবনতৃষ্ণা। কিন্তু সে তৃষ্ণার মূলে আজ অন্তর্লোকেরই প্রবর্তনা—বসুন্ধরার সঙ্গে বহুজন্মের একাত্মকতা। অন্তরের ও বাহিরের সংঘাতে সোনার তরীতে যে-বিরোধ একান্ত হয়ে উঠেছিল 'বসুন্ধরা' আনল তাদের দুর্লভ সংগতি। এ-সংগতি ক্ষণকালের; 'চিত্রা'য় আবার সংঘাত তীব্র হবে। কিন্তু উপস্থিত এ-কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের নিত্যসচল প্রবর্তনা একত্র মিলিত হয়ে বিরাট ঐকতান সৃষ্টি করল। 'বসুন্ধরা'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে।

পরিশেষে 'বসুন্ধরা'র অন্তিমভাগে পাই একটি অভিনব ভাবকল্পনা, যার প্রথম প্রকাশ দেখেছি 'মানস-সুন্দরী'তে। সে-কবিতায় প্রথম পেয়েছিলাম

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের একান্ত স্বকীয় একটি ভাবকল্পনা, যাকে বলা যেতে পারে কবির আহম্মিক কল্পনা। 'মানস-সুন্দরী'তেই প্রথম উচ্চারিত এ-অনুভূতি : 'মানসী'র মূর্তি রচিত কবিরই গোপন প্রেম দিয়ে, কবিরই নয়ন হতে আলোক নিয়ে, অন্তর হতে বাসনা নিয়ে। 'মানস-সুন্দরী'তে ফিরে যাওয়া যাক—

আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি।......

'মানস-সুন্দরী'র আবির্ভাব যখন কবিকে আবিষ্ট করল, তখন এই বোধই জাগল যে সে-দিব্যমূর্তির স্রষ্টা কবি স্বয়ং—তাঁরই কল্পনা, বাসনা ও প্রেম গড়ে তুলেছে সে-মূর্তি ; সঙ্গে সঙ্গে এল এ-চেতনা : 'মানসসুন্দরী'র বিশেষ লীলা কবিরই 'আমি'র সঙ্গে—যে-আমি জন্মে জন্মে পত্রপুষ্পতরুর সঙ্গে মিলে ছিল। অনন্তকালপ্রবাহিত এই 'আমি'র অনুভূতিই সৃষ্টি করেছিল 'মানস-সুন্দরী'। সুতরাং এ-বোধ স্বাভাবিক, জন্মজন্মান্তরের আমি-সত্তাই আজ সৃষ্টি করেছে 'মানস-সুন্দরী'র অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। এই 'আমি'-সত্তার উপলব্ধিই 'বসুন্ধরা'য় আবার নিয়ে এল কৌতুকাবহ, নৈর্ব্যক্তিক, আহম্মিক কল্পনা—

......আমার আনন্দ লয়ে
হবে না কি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত-আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প। মোর মুগ্ধ ভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে—
উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্তবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ?......

কবির এই আহম্মিক কল্পনা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি অভিনব। শাশ্বত 'আমি'র নৈর্ব্যক্তিকতায় এ-কল্পনা সঙ্কীর্ণ আমিত্ব থেকে সার্বভৌম আমিত্বে উত্তীর্ণ। দার্শনিকের দৃষ্টিতে এ-কল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ প্রশ্ন উঠবে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা কতখানি আত্মমুখ (subjective), কতখানি বিষয়মুখ (objective)। এ-প্রশ্নের উত্তর সহজ হবে যদি এই কথাটি

আগে বুঝে নিই যে পাশ্চাত্য দার্শনিক পরিভাষায় 'subjective' শব্দটির যে সংজ্ঞার্থ, রবান্দ্রনাথের 'আমিত্ব'-কল্পনাকে তার মধ্যে ধরা যাবে না। মূলত, রবীন্দ্রনাথের 'আমি' তার সার্বভৌমিকতায়, 'objective'। পশ্চিমের দর্শনে কাণ্ট্‌ ও হেগেল থেকে 'subjective' ও 'objective'-এর যে তীক্ষ্ণ বিরোধ চলে এসেছে, রবীন্দ্রকাব্যে ও দর্শনে সে বিরোধ মুছে গেছে; দেখা দিয়েছে এক অকল্পিতপূর্ব বিষয়মুখকল্পনা। উত্তরকাব্যে একাধিকবার কবি বলবেন, 'তুমি আমারই সৃষ্টি, আমারই ভিতরে তোমার লীলা'; কিন্তু সে 'আমি' তার বিরাট নৈর্ব্যক্তিকতায় 'subjective'-এর সঙ্কীর্ণ সীমানা অতিক্রান্ত। তাই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যকল্পনা নানা তথাকথিত 'subjective' রেখা সত্ত্বেও মূলত objective।

ধরিত্রীর প্রাণতপ্ত বুকে 'জীবনের শতলক্ষ ক্ষুধা' নিয়ে 'বসুন্ধরা' শেষ হল। কবির মানসচক্ষে প্রথম উন্মুক্ত হল জীবনের সমগ্রতা, অজস্রতা। প্রথম উৎসারিত হল এ-উপলব্ধি—প্রাণ বিরাট, বসুন্ধরা বিপুলা। সহস্রধারায় উৎসারিত এই বসুন্ধরার প্রতি বিস্ময়বিমূঢ় কবির শেষ নিবেদন উচ্চারিত হল—

এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ।
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়;
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে।

য়ুরোপীয় নাট্যশাস্ত্রে 'catharsis' শব্দটি সুপরিচিত। (পারিভাষিক 'বিরেচন' শব্দটি তেমনি স্বল্পপরিচিত।) 'বসুন্ধরা'য় এই 'cathartic effect', বিরেচনপ্রভাব, সুস্পষ্ট। আবেগের প্রবল বিস্ফোরণের পরে কাব্যে এল এই বিরেচনজাত স্থৈর্য। তার স্বাক্ষর পড়ল 'মায়াবাদ' থেকে 'আত্মসমর্পণ' পর্যন্ত আটটি চতুর্দশপদী কবিতায়। এদের কাব্যরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ। 'বসুন্ধরা'র খরকাব্যস্রোতের অন্তরালে ছিল উপলব্ধির আবেগবন্যা; সে বন্যার ক্ষিপ্র গতিতে ছুটেছিল 'বসুন্ধরা'র চতুর্দশপদী চরণ। পরের আটটি সনেটের দৃঢ়বন্ধনে সে-প্রবাহ প্রশান্ত হল: সংরক্ত আবেগের বদলে পেলাম নিঃশঙ্ক প্রত্যয়, নির্বিরোধ উপলব্ধি।

সনেটগুচ্ছের শেষে তারিখের নির্দেশ আছে—৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০০। সম্ভবত 'বসুন্ধরা'র পরে অগ্রহায়ণের প্রথমে তারা রচিত। কিন্তু 'বসুন্ধরা'

ও সনেটগুলির মধ্যে রয়েছে আর একটি রচনা—'কণ্টকের কথা' (২৯ কার্তিক)। কাব্যের প্রারম্ভে 'তোমরা ও আমরা'র মত, কোনও লঘু ভাবক্ষণের সৃষ্টি বলে কবিতাটিকে উপেক্ষা করা যেতে পারত। কিন্তু সতর্কচিত্তা কবিতাটির লঘু রূপকের মধ্যে একটি গভীর অর্থ খুঁজে পাবে। স্বল্পায়ু, 'কোমল বিলাসী' 'কমল'কে ধিক্কার দিয়ে নগ্ন, তীক্ষ্ণ, উন্নতশির কণ্টকের আত্মশ্লাঘা কবিতাটির বিষয়: কুসুমের 'ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস'কে ব্যঙ্গ করে কণ্টক বলছে সে রিক্ত কিন্তু স্পষ্ট, কঠিন, নির্ভীক। তার মূল্য সবাই জানে।

কণ্টকের গর্বে কবির বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন এবং সে-বিদ্রূপের মধ্যে কবির সমকালীন মনোভাব ধরা পড়ল। 'হৃদয়-যমুনা' থেকে 'পুরস্কার' পর্যন্ত কবিতাগুচ্ছের আলোচনায় দেখেছি, দীর্ঘভ্রমণের পর বৈশাখ মাসে (১৩০০) শিলাইদহে ফিরে এসে 'প্রসারিত আকাশ ও সুবিস্তীর্ণ শান্তি' কবির মনে একটা ভাবান্তর এনেছিল—'কল্পনাপ্রিয়, অকর্মণ্য, আত্মনিমগ্ন' জীবন, 'কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয়' বলে মনে হল না। ছিন্নপত্রের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের চিঠিগুলি, বিশেষ করে ১৬ই মে'র চিঠিটি, (ছিন্নপত্র, পৃ ২০৬-৭) এ ভাবান্তরের সাক্ষ্য দিয়েছে।

এই ১৬ই মে'র চিঠিটি 'কণ্টকের কথা'র অন্তরের কথাটিকে আলোকিত করে। কবি বলছেন,

"আমার সব থেকে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাটা সকলে ভারি দোষের বিবেচনা করে। ···(সেখানে) মনটা স্বভাবটা বিজনেস্ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ, একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।"

কবির এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি 'হৃদয়যমুনা' থেকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন, সন্তত। সৌন্দর্যকল্পনা, কাব্যের শেষে ফিরে আসার অন্যতম কারণ এ দৃষ্টি, এ-কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'কণ্টকের কথা'য় এই মানসিক বৃত্তিই দেখা দিল রূপকের মধ্যে। কণ্টক হল 'গড়াপেটা আইনে বাঁধা

মজবুত রকমের' স্বভাব ও জীবনধারার প্রতীক ; তাই কণ্টকের বক্তব্যে কবির প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ; 'কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন' জীবনকে কুসুমের সঙ্গে তুলনা করে কবির পরোক্ষ স্বীকৃতি।

কবিমানস এমনি করেই আপাততুচ্ছ রচনাতেও এক গূঢ় ভাবসূত্র রেখে গেছে—এ-কথা একাধিকবার আমরা লক্ষ্য করেছি।

সনেটের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। 'মায়াবাদ' থেকে 'আত্মসমর্পণ' পর্যন্ত আটটি সনেটে পরিস্ফুট সোনার তরীর অন্তিম জীবনদর্শন ; সরল ও সংহত ভাবে উচ্চারিত সোনার তরী কাব্যের প্রধানতম সুর—জীবনবৈচিত্র্য-বোধ, বাস্তবনিষ্ঠা, 'বর্ণগন্ধগীতিময়' নিখিলের অনন্ত ঐশ্বর্য। স্পষ্টতই মনে হয় সোনার তরীর মধ্যপর্বের অন্তর্বিক্ষোভ নানা কামনা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে অবশেষে এনেছে পরিণত জীবনবোধ। সে-জীবনবোধ আজ সমগ্রতাকে কামনা করে, কষাঘাত করে সনাতন মায়াবাদের নিষ্ক্রিয়তাকে ('মায়াবাদ'); মানববিমুখ মুক্তিকামীর বন্ধনপাশ ছেদের জীবনবিরুদ্ধ প্রয়াসকে ('মুক্তি'); হাসি-অশ্রু-দোলায়িত জীবনকে ও জগৎকে তুচ্ছ করার মূঢ়তাকে ('গতি')। অন্যদিকে দেখি অন্তিমপূর্ব দুটি কবিতায় ('অক্ষমা', 'দরিদ্রা') আবার ধরা পড়েছে 'ছিন্নপত্র'—সোনার তরীর অন্যতম বিশিষ্ট কল্পনা—সকরুণ শঙ্কাকুল নিঃসহায় বেদনাতুর ধরিত্রীর কল্পনা। শেষ সনেট 'আত্মসমর্পণ'এ দেখি এই অক্ষমা, দরিদ্রা ধরণীর দুঃখসুখের লক্ষধারায় কবির পরিপূর্ণ অবগাহনবাসনা, নিঃশঙ্ক আত্মনিমজ্জনের কামনা। 'আত্মসমর্পণ'-এ প্রেমে ও অনুরাগে কবিচিত্ত লুণ্ঠিত বসুন্ধরার 'ধূলিমাটি'তে।—

চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

সোনার তরী কাব্য পর্বে পর্বে পার হয়ে এল বহুবিচিত্র অধ্যায়—বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবলোকের প্রবর্তনায় গভীর জীবনকামী অনুভূতি ; প্রকৃতির নিবিড়তম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানস-সুন্দরীর অভিনব কল্পনা ; জীবনের কঠোর অভিঘাতে কাব্যে বিরোধ ও সংঘাতের ক্রমায়াত প্রবল প্রকাশ ; স্তব্ধ-প্রশান্ত প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে 'মানস-সুন্দরী'র প্রেমকল্পনার পুনরাবির্ভাব ; বসুন্ধরার আহ্বান এবং বিরাট প্রাণের উপলব্ধি ; জীবনের শতলক্ষ বন্ধনের পুনরুচ্চারণ। সোনার তরী অন্তিমে আবার ফিরে এল সৌন্দর্যকল্পনায়; ফিরে এল মানস-সুন্দরীর 'অচলস্মৃতি'।

সোনার তরীর অন্তিমপূর্ব রচনা 'অচলস্মৃতি'কে (১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০) ঘিরে রয়েছে বিরোধমুক্ত শুভ্রশান্ত এক অনুভূতি। পূর্বের ক্ষুব্ধ প্রেমের আবেগ নেই; 'শোণিত-রাঙা বেদনা'র কোনও রেখাই আর নেই। রয়েছে 'অচল ধবল শৈল সমান একটি অচল স্মৃতি'র স্তব্ধগম্ভীর মহিমা; রয়েছে নীরব হিমগিরির প্রশান্তি—

আমার হৃদয়ভূমি মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল সমান
একটি অচল স্মৃতি।

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর
মর্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।

এ-কবিতার বাক্যার্থের চেয়ে কাব্যধ্বনি মহার্ঘ। কবিতাটিকে মৃদু সৌরভের মত বেষ্টন করে আছে এক ধ্যানাবিষ্ট অনুভূতি—যেমন অচঞ্চল তেমনি প্রগাঢ়। সোনার তরীর বহুধাপ্রসারিত অভিজ্ঞতার পর অন্তিম ধ্যানকল্পনা হিমগিরির অটল মহিমায় জেগে রইল—

মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।

অনুভূতির এ স্তব্ধ গভীরতা, ধ্যানের এ নীরবতা অন্তর্হিত হল সোনার তরীর অন্তিম কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় (২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০)। মানস-সুন্দরীর চরণ রইল মর্মের গভীরে; তার আসন রইল অটল। কিন্তু তবু কাব্যের অন্তিম কবিতায় দেখা দিল অনিশ্চয়তার শঙ্কা, অকূল সিন্ধুযাত্রার অনির্দেশ্যতা। উদ্বিগ্ন মন প্রশ্নাকুল হল; যে-প্রশ্ন জাগল তার আভাস ছিল 'মানস-সুন্দরী'তেই। সে কবিতায় প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল এ প্রশ্ন—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চিরদিবানিশি

কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?

এ-প্রশ্নের উত্তরে মানস-সুন্দরীর 'অভয় আশ্বাসভরা নয়ন' এই বিশ্বাসই জাগিয়েছিল কবির মনে —

........আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে,............

কিন্তু সোনার তরীর অন্তিম কবিতায় সে-তরণীর কর্ণধার যখন আবার আবির্ভূত, তখন সে-বিশ্বাস স্তিমিত। সংশয় এনেছে কবির আকুল প্রশ্ন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

এ-সংশয় প্রবলতর হল স্তবকে স্তবকে—

কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?

তৃতীয় প্রশ্নটি সব থেকে গভীর ও সংকেতময়—

আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?

জীবনের যে-অন্তিম সার্থকতা কবির আজ আশা ও স্বপ্ন—মানুষের মুক্ত-জীবনপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়ে 'নবীন-জীবন'-সাধনা—তা কি ফলবান হবে সৌন্দর্যের অকূল সিন্ধুতে তরী ভাসালে ? প্রশ্নের উত্তরে কবি শুধু ফিরে পেলেন মধুরহাসিনীর নির্বাক হাসি।

কবিতাটির অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সতর্ক পাঠকের চিন্তাকে উদ্বোধিত করে প্রথমেই প্রথম চরণের শব্দ ক'টি—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে……

তারা ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল, তরণী ছুটে চলেছে অকূলে, কর্ণধারেরই নির্দেশে ; জানিয়ে গেল এই কথাটি—সে-কর্ণধারের ইচ্ছা ও নির্দেশ কবি-জীবনে আজ অপ্রতিরোধ্য।

মানস-সুন্দরী এ-কবিতায় শুধু 'অন্তর-মহিষা'ই নন ; মানস-সুন্দরী আজ কবির অন্তর্জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দের নিয়ন্ত্রী, যাঁর কাছে কবি আজ নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এই ভাগ্য-বিধায়িনীর ইঙ্গিত মাত্র ছিল 'মানস-সুন্দরী'তে, তৃতীয় স্তবকের সম্ভাষণে—

মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শশী ;

তার স্ফুটতর আভাস পাওয়া গেল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। অলঙ্ঘ্য নিয়তির বেশেই দেখা দিলেন মানস-সুন্দরী। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় পেলাম অনাগত জীবনদেবতা-কল্পনার তৃতীয় এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবচিন্তা—জীবনের পথে গভীর অন্তরে এক সত্তার অমোঘ নির্দেশ।

সংশয়াকুল প্রশ্নরাজির পরে তৃতীয় স্তবকে প্রক্ষিপ্ত হল সোনার তরীর দীর্ঘসন্তত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্রতিচ্ছায়া ; তা দেখা দিল ঝঞ্ঝাহত জলোচ্ছ্বাসের কল্পনায়—

হু হু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;

একদিকে দেখেছি 'অচলস্মৃতি'র মর্মগভীরে চরণস্থাপনা ; অন্যদিকে দেখি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'সংশয়ময় ঘননীল নীর'। আজ কবির কাছে এ দুই বোধই একান্ত সত্য। তাই এ সংশয়ের মধ্যেই রইল মানস-সুন্দরীর অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলি-সংকেত, রইল তাঁর 'নীরব হাসি'।

অন্তিম স্তবকে 'সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক' মিলিয়ে গেল। তরণীর কর্ণধারের রূপাবয়ব আজও রইল অস্পষ্ট। বাতাসে শুধু তাঁর 'দেহসৌরভ' ভেসে আসছে; বায়ুভরে তাঁর 'কেশের রাশি' উড়েছে। কবিতা এবং কাব্য শেষ হল কবির শেষ-মিনতি নিয়ে—

ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

মূর্তিদর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা বারবার জেগে উঠেছিল 'মানস-সুন্দরী' কবিতায়, তা আবার ফিরে এল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। 'চিত্রা' কাব্য শুরু হবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই; অনন্ত তৃষ্ণায় কবি খুঁজবেন 'ত্রিলোক-নন্দনমূর্তি'কে।

সোনার তরী কাব্যে 'সোনার তরণী' ভেসে এল তিনটি বিশিষ্ট কবিতায়: প্রারম্ভে, 'সোনার তরী'-তে, মধ্যে 'মানস-সুন্দরী'তে ও অন্তিমে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়। একদিক থেকে সোনার তরী কাব্যের ভাব ও কল্পনাকে বেষ্টন করে রয়েছে এই তিনটি কবিতা। 'সোনার তরী'তে দেখেছিলাম উদাসীন তরীচালককে, যে কোনদিকে না চেয়ে চলে গেল শুধু 'সোনার ধান'টুকু নিয়ে; কবিকে রেখে গেল 'শূন্য নদীর তীরে'। নিরাসক্ত কর্ণধার ছিল কবির মানসী।

মধ্যকবিতা 'মানস-সুন্দরী'তে পটভূমিকা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। অনাসক্ত কর্ণধার ফিরে এলেন 'অন্তরলক্ষ্মী'রূপে; উৎসৃষ্ট হল নিবিড় প্রেমকল্পনা; আবদ্ধ হলেন মানস-সুন্দরী। কবিকে তিনি তুলে নিলেন তরীতে; 'সৌন্দর্য-পাথারে' ভাসালেন সে 'সুন্দর তরণী'; স্বয়ং কর্ণধার হলেন। 'সোনার তরী'র নিরাসক্ত তরীচালক চলেছিল কোনদিকে না চেয়ে; কিন্তু 'মানস-সুন্দরী'তে জেগে উঠল কর্ণধারের—

অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল।

কাব্যে এ-রূপান্তর এসেছিল যখন মানসীর নিরুদ্দিষ্ট কল্পনা 'অন্তরলক্ষ্মী' ও কাব্যলক্ষ্মী হয়ে প্রতিভাত হল। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দেখি সে-আশ্বাসভরা

নয়ন রহস্যদীপ্ত, কৌতুকোজ্জ্বল। 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় 'বিশ্বাস বিপুল' আজ স্তিমিত, কিন্তু সে-কবিতায় ভাগ্যগগন-শশীর পূর্ণতর উদয় 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়—মধুরহাসিনীর নীরব অঙ্গুলিসংকেত আজ অলঙ্ঘনীয়।

সোনার তরীর আলোচনাশেষে সৌন্দর্যকল্পনা সম্পর্কে চিত্রকল্পের ক্রমপরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

'মানসী'তে দেখেছি, চারটি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে মানসীকল্পনার ক্রমাভিব্যক্তি : 'সন্ধ্যা', 'আকাশ', 'তারা' ও 'একাকিনী'। সোনার তরীর প্রথম কবিতাতেই দেখি কবিকল্পনা আশ্রয় করেছে নতুন একটি চিত্রকল্প : প্রবহমাণ 'তরী'। তরণী হল কবির সৌন্দর্যসত্তার বাহন। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণটা অনুমান করা যেতে পারে : এর পিছনে রয়েছে পদ্মাবক্ষে চলমান জীবনেরই প্রতিচ্ছায়া। বস্তুত, 'তরী', 'নদী' এবং 'সাগর' সোনার তরীর পরিচিত চিত্রকল্প হয়ে শীঘ্রই দেখা দিল : 'পরশ-পাথর'-এ দেখি সিন্ধুতীরে ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে ফিরছে; 'আকাশের চাঁদ'-এ পাল-তোলা 'ছোট ছোট তরী'র উল্লেখ রয়েছে।

তার পর 'মানস-সুন্দরী'-তে দেখি নবোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা চিত্রকল্প। প্রথমেই ফিরে পেলাম 'সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা'; কবির নিভৃত প্রেমালাপ আরম্ভ হল 'সায়াহ্ন-আলোকে'। তার পর তৃতীয় স্তবকে ফিরে পেলাম 'গগন', যদিও পরোক্ষে : গগনেই কল্পিত হল কবির বাল্য-সহচরী; আভাষণে দেখা দিল 'মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী'। তার পর 'খেলার সঙ্গিনী' যখন 'মর্মের গেহিনী' হয়ে অন্তরে প্রবেশ করলেন তখন চিত্রকল্পে না পেলেও প্রত্যক্ষভাবে পেলাম 'স্থির', 'স্নিগ্ধ', 'সুগম্ভীর' শব্দক'টি। মানসীকাব্যের মূল চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাই ফুটে উঠল মানস-সুন্দরীর রূপবর্ণনায়।

এ-স্তবকের শেষভাগে দেখি 'মানস-সুন্দরী' আবার তরীর কর্ণধার—

সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী,… ……

কাব্যের প্রধানতম চিত্রকল্প সুস্পষ্টরেখায় এবার দেখা গেল : 'সমুদ্র', 'কর্ণধার', 'তরণী'। একটি প্রশ্ন কৌতূহল জাগায় : প্রথম কবিতায় তরণীর কর্ণধারকে দেখি 'ভরা নদী'র বুকে ; 'মানস-সুন্দরী'-তে তাঁকে পেলাম অকূল সমুদ্রবক্ষে। নদী থেকে সমুদ্রের চিত্রকল্পে আসার কারণ কি? সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 'সোনার তরী' কাব্য মানসীকে বিদায় দিয়েই শুরু হয়েছিল। পূর্বে দেখেছি তরীচালক অস্পষ্ট, নিস্পৃহ। সৌন্দর্য-আকুতির তীব্রতা যখন কমে এসেছে তখন বোধ হয় নদীর কল্পনাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, পদ্মার পূর্ণ পরিবেশ ধরা পড়েছে সে কবিতায়—ক্ষুরধার নদী, ভাসমান তরী, ভারা ভারা ধান, 'তরুছায়ামসীমাখা' গ্রাম। দুই কারণেই সেখানে 'নদী'ই সুসংগত চিত্রকল্প।

কিন্তু, 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় মানসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত : নবীন অনুভূতির আলোকে মানস-সুন্দরী পুনরাবিষ্কৃত ; দুর্বার আবেগে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর নিরাসক্ত রূপ মিলিয়ে গেল। মানস-সুন্দরী হলেন উচ্ছলিত প্রেমে আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রেমের নিবিড়তা, অন্তরে তার পরিব্যাপ্তি, কবির পূর্ণ আত্মসমর্পণ—সব মিলিয়ে সমুদ্রের বিশালতাই যোগ্যতম চিত্রকল্প হল। 'তরী' দেখা দিল 'মন-তরী' হয়ে ; 'বায়ু' হল 'বেদনা' ; 'সমুদ্র' হল 'সৌন্দর্য-পাথার' ; তরীর 'কর্ণধার' হলেন মানস-সুন্দরী স্বয়ং ; কূলহীনতা হল কবির অনির্দিষ্ট যাত্রা।

ষষ্ঠ স্তবকে মানস-সুন্দরীর মূর্তি উদ্‌ভাসিত হল প্রকৃতির পটভূমিকায় ; প্রকৃতির রূপৈশ্বর্যে সে সত্তা পরিকীর্ণ। প্রথমেই দেখি—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ;.........

মূল চিত্রকল্প দুটি আজও অপরিবর্তিত : 'অনন্তে'র কল্পনা এল, এল 'সন্ধ্যার কনকবর্ণ'। তার পরে অবশ্য নিসর্গের নানা রূপেই সে সত্তা অভিব্যাপ্ত হল। কিন্তু প্রধানতম চিত্রকল্প দু'টির উল্লেখ প্রথমেই। তার পর কয়েকটি চরণ পরেই ফুটে উঠল 'একাকিনী'র কল্পনা, যা 'চিত্রা'র সৌন্দর্য-কল্পনার মূলতম বৈশিষ্ট্য হবে—

নিযুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন ;

সোনার তরীতে 'একাকিনী'র কল্পনা প্রথম দেখা দিল 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় ; 'চিত্রা'য় এ-শব্দটির বারবার উল্লেখ ঘটবে, কবিকে নিয়ে যাবে কাব্যের নামভূমিকায় 'চিত্রা' কবিতার দ্বৈত উপলব্ধিতে : জগতে যাঁর প্রকাশ তিনি 'বিচিত্ররূপিণী', অন্তরে যাঁর প্রকাশ তিনি 'একাকিনী'।

'মানস-সুন্দরী'র পর কবির অন্তর্বিক্ষোভ নিয়ে এল জীবনবোধের সংঘাত ; সৌন্দর্যকল্পনা দীর্ঘকাল স্তিমিত ছিল। কাব্যের শেষের দিকে পেলাম 'অচল স্মৃতি' কবিতাটি। মর্মের গভীরে আবার দেখা দিলেন মানস-সুন্দরী—

অচল ধবল শৈল সমান
একটি অচল স্মৃতি।

সে শৈলশিখর 'গগন-লীন' 'একা'—

মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন
নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার
নিত্য নীহার-রেখা।

পুরাতন ও নূতনের কৌতুকাবহ সমাবেশ ঘটল এ-কবিতায়। 'গগন'-এর চিত্রকল্প এখানেও সন্তত রইল ; স্থির, প্রশান্ত মূর্তির কল্পনা নিয়ে এল হিমগিরির শিখরের চিত্রটি ; এখানেও সে-শিখর 'একা'। শুধু লক্ষণীয় হল, গগনের রূপ-বদল ঘটল—বহির্গগন থেকে ধ্যানমূর্তি 'চিত্তগগনে' আঁকা রইল। 'একাকিনী'র কল্পনা 'মানসী'তে ছিল বহির্মুখী ; 'সোনার তরী'তে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হল, 'চিত্তগগনে' অঙ্কিত হল।

শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় পূর্বের চিত্রকল্প ক'টি অনবচ্ছিন্ন রইল। এখানেও 'সুন্দরী' 'সোনার তরী'র কর্ণধার ; 'অকূল সিন্ধু'তে তাঁর তরী ছুটে চলেছে। শুধু রহস্যনিবিড় তাঁর মূর্তি ; প্রেমের অন্তরঙ্গতা অবলুপ্ত—কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নিয়তির আভাস এল এ-কবিতায় ; মানস-সুন্দরীর

আবার রূপ বদলাল। সংশয়-অভিহত কবির কাছে 'সিন্ধু' হল 'ঊর্মিমুখর', ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ—

সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,

শুধু, 'সোনার তরী' ভেসে চলেছে—

তারি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ…।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় রহস্যময়ী নীরবহাসিনীর কল্পনা সমাপ্ত হল 'সন্ধ্যা-আকাশে'র বর্ণনায়; সে-দিব্যমূর্তি রইল অস্পষ্ট, শুধু তাঁর 'দেহসৌরভ', তাঁর বায়ুবিক্ষিপ্ত কেশরাশি কবিকে আকুল করল। বিমূর্তকল্পনা রইল নিবিড় রহস্যে ঢাকা। 'চিত্রা'য় দেখব মূর্তি-ব্যাকুল দৃষ্টির রহস্য-অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়াস। সে-কাব্যেও চিত্রকল্প আনবে পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়।

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রা